মহাপ্রস্থান

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক, সেণ্ট কলম্বাস কলেজ, হাজারিবাগ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৩১ সাল

মূল্য ১।৷৹ এক টাকা বার আনা

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
সিদ্ধেশ্বর প্রেস্
২৯ নং নন্দকুমার চৌধুরী সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

মহাপ্রস্থান ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাস নয়

চুঁচুড়া,
১৩৩১ সাল।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গপত্র

পিতৃচরণোদ্দেশে

বৈশাখী শুক্লা একাদশী,	}	সেবক—
১৩৩১ সাল।	}	হেম

উপহার

Presented ~~to~~

Babu Ramananda Chatterji

Editor, Prabasi — with

my best regards, for

favour of Review.

Hemchandra Mukherji.

The 16th Nov 1925.

মহাপ্রস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

অমাবস্যা রজনী—চারিদিক ঘোর অন্ধকারময়। কোথাও কিছুই নয়নগোচর হয় না। রাত্রের অন্ধকার যত বেশীই হউক না কেন, আকাশ যদি নির্ম্মল থাকে তাহা হইলে প্রান্তর মধ্যে নক্ষত্রালোকে দূরস্থিত ছোট বড় সকল জিনিষই অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজ আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রদোষকাল হইতেই গাঢ় তিমির আকাশতল ব্যাপিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীতপ্রায়, অথচ তাহার মধ্যেই প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী বৃক্ষসমূহ মসীবর্ণ শৈলশ্রেণীর মত দেখাইতেছিল। নগরের উত্তর প্রান্তস্থিত পর্ব্বতমালা অন্ধকারের মধ্যেও আজ অতি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সাধারণতঃ এই দূরস্থিত শৈলশ্রেণী রাত্রিকালে নগর হইতে একেবারেই দেখা যাইত না। কিন্তু আজ তথায় যে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহারই প্রভায় পর্ব্বতের মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত অস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে অগ্নি জ্বালিত করিলে তাহার প্রভায় যেরূপ দূরস্থিত পতঙ্গাদি আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ আজ এই পর্ব্বতগাত্রস্থিত বৃহৎ অগ্নি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নগর, উপনগর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে অধিবাসীবৃন্দ পর্ব্বতাভিমুখে আসিতেছিল।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রায় কেহই রাত্রে একলা গ্রামের বাহিরে গমনাগমন করে না, কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া

থাকে। অধুনা উপনগর হইতে নগরে গমনাগমন সুবিধাজনক হওয়ায় এবং নগর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছে বলিয়া উপনগরবাসীকে প্রত্যহই নগরে গমন করিতে হয়। পূর্ব্বে গমনাগমনের সুবিধা ছিল না বলিয়াই গ্রামবাসী পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বা অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রত্যহ নগরে যাইত না। নগরে যে যে দিন হাট বসিত, সেই সেই দিন পণ্যবিক্রেতা নিজ নিজ সম্ভার লইয়া গিয়া পণ্যবীথিকা সজ্জিত করিত এবং সন্ধ্যা হইলে বিক্রয়াবশিষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, পণ্যশালা আবার জনশূন্য হইয়া যাইত। যদিও হাটবারে নগরাভিমুখে মনুষ্য সমাগম হইত, তথাপি সন্ধ্যাকালে এ প্রদেশে একসঙ্গে এরূপ জন-স্রোত পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। এ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল; সকলেই সন্দেহযুক্ত. অথচ আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে নগরাভিমুখে যাইতেছিল। পূর্ব্বদিবস প্রতি পল্লীতে এইরূপ রাজ-আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল—"আগামী কল্য ভবানীমন্দিরে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে মহা-সমারোহে পূজা হইবে। সমগ্র প্রজা রাজ-আজ্ঞায় আহূত হইতেছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রজাবর্গের অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন।" সেইজন্যই আজ অপরাহ্নকাল হইতে জন-প্রবাহ নগর অতিক্রম করিয়া প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী রাজপথ দিয়া অবিরতভাবে পর্ব্বতাভিমুখে যাইতেছিল।

নগরের উত্তর-প্রান্ত বিস্তীর্ণ পর্ব্বতপরিবেষ্টিত। তাহারই সম্মুখে নিবিড় বনভূমি পর্ব্বতের সহিত সমান্তরালভাবে অবস্থিত ছিল। বৃক্ষলতাদিপূর্ণ এই বনমধ্যে কাপালিক প্রতিষ্ঠিত কালীর এক বিশাল মন্দির বিদ্যমান ছিল। কতদিন পূর্ব্বে, কাহার দ্বারা এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা কেহই জানিত না এবং জানিবার চেষ্টাও করিত না। এমন কি, এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে যে কোন দেবীমন্দির আছে, তাহাও নগরবাসীরা

অনেকে জ্ঞাত ছিল না; কিন্তু যাহারা সাধারণতঃ ভক্তিমান, যাহারা দেবদেবীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সকল কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত, তাহারাই সেই মন্দিরস্থিত প্রতিমার জাগ্রত অবস্থার কথা ভাবিয়া মুগ্ধ হইত। তাহাদের মধ্যে ছোট বড় সকলেই দেবীকে সম্মান করিত এবং মধ্যে মধ্যে পূজা দিত। রায়পুররাজ অমরনাথ তাঁহার পারিবারিক সকল কর্ম্মোপলক্ষে সপরিবারে ভবানী-মন্দিরে আসিতেন এবং ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে প্রতিমার পূজা দিয়া নিজেকে বিপন্মুক্ত ও ধন্য মনে করিতেন। দেবীর পূজক, রাজা নিযুক্ত করিতেন না। কাপালিকের শিষ্য প্রশিষ্য এই মন্দিরের সেবাইত হইয়া থাকিতেন। ইহাই চিরপ্রচলিত রীতি।

পূর্ব্বে বিচ্ছেদশূন্য বনমধ্যে এক অতি নিভৃত স্থানে একটি ক্ষুদ্র কুটীরাভ্যন্তরে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল; রাজা অমরনাথের সময়ে সেই পুরাতন মন্দিরের স্থানে এক নূতন মন্দির প্রস্তুত হয়। সন্তান না হওয়ায় অমরনাথ ভবানী-সমক্ষে পূজা মানিয়াছিলেন এবং অচিরেই পুত্র-সন্তান লাভ করায় স্বীকৃত পূজা সমাপন করিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গল-কামনায় এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে প্রতিমার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানীর অনুগ্রহ-লব্ধ বলিয়া পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন ভবানীপ্রসাদ।

অবাধজাত বনসমূহ বহু আয়াসে পরিষ্কৃত ও ভূপৃষ্ঠ সমতল করিয়া পুরাতন মন্দিরের একটি ভিত্তির উপরে এই নূতন মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মন্দির-চূড়া পর্ব্বতের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়াছিল। মন্দিরের দুই পার্শ্বে দুই প্রকোষ্ঠ—একটিতে মন্দির-সংক্রান্ত ধন-রত্নাদি রক্ষিত হইত এবং অন্যটি প্রায় সকল সময়েই পূজোপকরণে পরিপূর্ণ থাকিত। সম্মুখে একটি নাট-মন্দির, তাহার দেওয়াল ও ছাদে বিবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত ছিল। দালানের পরে এবং তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে একটি প্রশস্ত দরদালান—এখানে স্থানে স্থানে বৃহৎ এবং সুন্দর চিত্রাবলী লম্বমান

থাকিত। এ সকল চিত্রপটে রায়পুর রাজ-পরিবারের প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল। রাজা অমরনাথ পূজা সমাপন করিয়া ভবানী-মন্দির হইতে বাহির হইয়া মন্দিরদ্বারে প্রণাম করিতেন এবং পরে পিতৃ-পিতামহের আশীর্ব্বাদ কামনায় এই সকল প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রণত হইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে অবতরণ করিতেন। দরদালানের সম্মুখে অতি বিস্তৃত এক প্রাঙ্গণ।

এই বৃহৎ প্রাঙ্গণ, আজ সন্ধ্যা হইতেই অসংখ্য লোক-পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্দির-প্রাঙ্গণে আজ যেরূপ লোকসমাগম হইয়াছিল, পূর্ব্বে পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে এরূপ আর কখনও হয় নাই। সন্ধ্যা হইতেই মন্দিরাভ্যন্তর উজ্জ্বল দীপালোকে আলোকিত ছিল। নাট-মন্দির এবং দরদালান দীপমালা শোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। অন্ধকারময় বিরাট্ পর্ব্বতগাত্র ও বিশাল পাদপপূর্ণ বনভূমি পরিবেষ্টিত হওয়ায় দীপমালা-ভূষিত মন্দির দূর হইতে অতি মনোহর দেখাইতেছিল। প্রাঙ্গণের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি মশাল জ্বলিতেছিল।

রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত হইল, চারিদিকে মশাল প্রজ্জ্বলিত হইল। স্থানে স্থানে উচ্চ আলোক-স্তম্ভ হইতে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল। সেই উজ্জ্বল আলোকে মন্দির প্রাঙ্গণের এক অদ্ভুত শোভা হইল। সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ অসংখ্য জনসমাকীর্ণ, কোথাও ভূপৃষ্ঠ লক্ষ্য হয় না। মধ্যে মধ্যে উচ্চাসনে রাজ-কর্ম্মচারী ও শান্তি-রক্ষক দণ্ডায়মান। সকলেই সভয়ে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থল

কাষ্ঠ-প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত; তন্মধ্যে যূপকাষ্ঠ উপযুক্ত স্থানে প্রোথিত ছিল। তাহারই পার্শ্বে রাজা অমরনাথ পুত্রসহ উচ্চাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি বহুমূল্য বসন ভূষণে পরিশোভিত হওয়ায় সুন্দরতর হইয়া প্রজাবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। যাহারা পূর্ব্বে কখনও ভবানী-মন্দিরে আসিয়াছিল এবং যাহারা কুমারের সহিত পরিচিত ছিল বা তাঁহার প্রকৃতির কথা বিশেষভাবে জানিত, তাহারা সকলেই আজ একটু সন্দিগ্ধচিত্তে অবস্থান কবিতেছিল। সকলেরই মন উৎকণ্ঠাপূর্ণ—যেন তাহারা এই ঘটনায় তাহাদের কোন ইষ্ট বিরহের আশঙ্কা করিতেছিল। রাজ-কর্ম্মচারীগণ সসব্যস্তে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাদের বিস্মৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন কোন অমঙ্গলের সূচনা হইতেছে ভাবিয়া প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতেছিল। বৃদ্ধ বিদূষক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দরদালানের বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই গৌর-কান্তি আজ কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছিল—যেন তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে সুখশশী চিরদিনের মত অস্তমিত হইতেছিল। তাঁহারা সকলেই উৎকণ্ঠাপূর্ণ অথচ স্থির ছিলেন।

দালান এবং দরদালান বিবিধ আহার্য্য সামগ্রী-পরিপূর্ণ ছিল। পূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ, নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণ যথাস্থানে সজ্জিত। কাপালিক প্রতিমার সম্মুখে আসনোপরি দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র, শরীর রক্তবর্ণ গাত্র-বস্ত্রে অর্দ্ধাবৃত। বদনমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত, ললাটে রক্তচন্দনাঙ্কিত দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্র। সেই বিশাল লোচনের স্থিরদৃষ্টি প্রতিমার উপরে নিহিত ছিল—যেন কোন উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য তিনি ভবানীর আশীর্ব্বাদ কামনা করিতেছিলেন। তন্ত্রধারক পূজাগ্রন্থ সম্মুখে লইয়া বসিয়াছিলেন। সকলই প্রস্তুত, অথচ সকলেই যেন কিছুর অপেক্ষা করিতেছিলেন।

হঠাৎ সেই বিপুল জনতা মধ্য হইতে আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। বিদ্যালয়ের বালকগণ এক প্রহর কাল শিক্ষকের তাড়নায় পাঠ অভ্যাস করিয়া মধ্যাহ্নকালীন অবসরের ঘণ্টা শুনিলে পাঠগৃহ হইতে বাহির হইবার সময় যেরূপ নানা প্রকার আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠে, সেইরূপ আনন্দ-ধ্বনি প্রাঙ্গণ হইতে উত্থিত হইল। বিবিধ শব্দ-বিন্যাসে নহবৎ বাজিয়া উঠিল এবং পূজারম্ভের জন্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল।

মন্দির হইতে মন্ত্রোচ্চারিত হইল। সমস্বরে উচ্চারিত বেদমন্ত্র হিন্দুর হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও শান্তি আনয়ন করে। সংসারের দুঃখ, শোক, অভাব-অভিযোগের দ্বারা উৎপীড়িত মানব-হৃদয় কখনও কখনও এমন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে যে, শত চেষ্টাতেও চিত্তে একটু শান্তি আনিতে পারা যায় না। কিন্তু একছত্র বেদমন্ত্র হৃদয়ে পবিত্রতা আনিয়া দিয়া সমস্তই সংশোধিত করিয়া দেয়। তখন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় ভক্তি ও প্রীতির আধার হইয়া প্রশান্ত হইয়া উঠে। মন্ত্রের এই শক্তি এখনও হিন্দু অনুভব করিতে পারে। সেইজন্য প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া কাপালিক মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিলে প্রাঙ্গণের সমবেত জনমণ্ডলী স্থির হইল। বলির প্রাক্কালিক পূজা সমাপন করিয়া কাপালিক ভীমকণ্ঠে বলি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে নরবলি প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয়েরা কখনও কখনও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিমা-সমক্ষে নরবলি দিত, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাহারা অন্যত্র হত্যা করিয়া প্রতিমার সম্মুখে কেবল মাত্র ছিন্ন শির আনিয়া উৎসর্গ করিত। আজ এই ভবানী-মন্দির সমক্ষে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জন্যই প্রকাশ্যে এই নরবলির আয়োজন হইয়াছিল।

পূর্ব্ব হইতেই একটি কৃষ্ণকায় মনুষ্য স্নাত ও পট্টবস্ত্র পরিহিত ছিল।

কাপালিক আদেশ করিলে প্রহরী সেই লোকটিকে আনিয়া প্রাঙ্গণ-মধ্যবর্ত্তী কাষ্ঠ-প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করাইল। তখন কাপালিক একখণ্ড তাম্রপাত্র হস্তে করিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং দেবোদ্দেশ্যে আনীত বলির কপালে সিন্দুর বিলেপন করিয়া খড়্গ আনিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। এই অবসরে সেই হতভাগ্য ভূপৃষ্ঠে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া স্বীয় জন্মভূমি চিন্তা করিল; পরক্ষণেই প্রতিমার পাদোপরি চিত্ত নিবিষ্ট করিল; তারপর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে রাজকুমার ভবানীপ্রসাদের প্রতি অনিমেষ-লোচনে চাহিয়া রহিল। সে করুণ-দৃষ্টি কুমার আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সহসা "এ পৈশাচিক দৃশ্য আর সহ্য করা যায় না"—বলিয়া কুমার মঞ্চ হইতে সেই জনতার ভিতর লাফাইয়া পড়িলেন এবং কোথায় যে অদৃশ্য হইলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। শান্তি-রক্ষকেরা এ ঘটনা দেখিয়াও দেখিল না এবং কুমারের অন্বেষণের জন্য কোন চেষ্টাও করিল না।

রাজা অমরনাথ ক্রোধোদ্দীপ্ত-নয়নে স্থির হইয়া মঞ্চোপরি বসিয়া রহিলেন। আজ তাঁহার সব আয়োজন ব্যর্থ হইল। ভবানী-মন্দিরে এই নরবলি-প্রথা অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে ভবানীপ্রসাদের সহৃদয় অন্তঃকরণ হইতে মনুষ্যপ্রেম দূরীভূত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াই আজ অমরনাথ এই বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, একবার নরবলি দেখিলে পুত্রের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা নষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। পিতৃবৎসল, পিতৃভক্ত ভবানীপ্রসাদ যে এইভাবে প্রজামণ্ডলী সমক্ষে পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া সহসা মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে অন্তর্হিত হইবেন, তাহা রাজা একবারও মনে করেন নাই। এরূপ মনে করিবার তাঁহার কোন কারণও ছিল না। ভবানীপ্রসাদ ভক্তিমান। পূজাদি সকল কর্ম্মেই তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। ভবানী-মন্দিরে পূজাদি

ক্রিয়া সমারোহে সম্পন্ন হয়, ইহাও তিনি ভালবাসিতেন; কিন্তু মন্দির-প্রাঙ্গণ যে নরশোণিত-সিক্ত হয় তাহা তাঁহার একেবারেই অভিমত ছিল না। কোমল-প্রকৃতি সহৃদয় ভবানীপ্রসাদ তাহা একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। রাজা অমরনাথ পুত্রের অন্তঃকরণ চিনিতে পারেন নাই; নতুবা আজ হয়ত তিনি কুমারকে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রহরী-বেষ্টিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন।

কুমার ভবানীপ্রসাদ মন্দির ত্যাগ করিয়া অতি দ্রুতপদে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কল্যাণীর বক্ষমধ্যে মুখ লুক্কায়িত করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর চক্ষের জলে স্বামীর মস্তক অভিষিক্ত হইতে লাগিল এবং স্বামীর অশ্রুবারিতে স্ত্রীর বক্ষবস্ত্র আর্দ্র হইল। কতক্ষণ যে এই ভাবে অতিবাহিত হইল তাহা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

যথাবিধি বলি ও পূজা সমাপন করিয়া আহার্য্যসামগ্রী সমবেত প্রজা মধ্যে বিতরণ করিবার আদেশ দিয়া রাজা অমরনাথ ত্বরিতগতিতে মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহিরে অশ্ব প্রস্তুত ছিল। অশ্বারোহণ করিয়া অতি শীঘ্র তিনি নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে কুমারের এইরূপ অবজ্ঞাজনক ব্যবহারের প্রতিকার করিবার একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিলেন। বলপ্রকাশ দ্বারা কুমারের চিত্ত পরিবর্ত্তিত করিবেন ইহাই প্রথমে স্থির করিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়াই বুঝিলেন, এরূপ উপায়ের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি বুঝিলেন উৎপীড়ন, শাসন বা নির্য্যাতনের দ্বারা স্থূল শরীরের উপরে আধিপত্য প্রদর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন এ উপায়ে কখনও সাধিত হইতে পারে না। যত বলপ্রকাশ করা যাইবে, মানুষের প্রকৃতি ততই বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। সেইজন্য তিনি পুত্রের

এরূপ অশিষ্টাচারের কারণ নির্ণয় করিতে মনস্থ করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কারণ নির্ণয় করিতে পারিলে তাহা তিনি সমূলেই উৎপাটিত করিবেন।

প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পর সহসা একটি ঘটনার কথা তাঁহার মনে হইল। ভবানীর সমক্ষে যে মনুষ্যকে বলি দেওয়া হইল সে অনেক দিন পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে পুত্র এবং পুত্রবধূ উভয়ে তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিল কেন? দৃপ্ত অমরনাথ গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"শুধু পুত্র এ কার্য্যের জন্য দোষী নহে; বোধ হয় স্ত্রীর প্ররোচনায় পুত্র এইরূপ রাজ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছে।" "রাজা অমরনাথ এ লোকনিন্দা সহ্য করিবার পাত্র নহেন—এই কথা বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং কি ভাবিয়া হঠাৎ প্রতিহারীকে ডাকিলেন।

প্রতিহারী রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিল এবং রাজার রোষকষায়িত রক্তিম নয়ন দেখিয়া বিহ্বল হইয়া রহিল। রাজা তখন আদেশ করিলেন, "বধ্য ব্যক্তি যে কারাগারে রক্ষিত ছিল সেই কারাগারের দ্বাররক্ষককে শীঘ্র এইখানে উপস্থিত কর।"

প্রতিহারী চলিয়া গেলে রাজা প্রকোষ্ঠে পদচারণা করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার সেই চিন্তা-বিবর্ণ মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার সেই সঙ্কুচিত রেখা-বিশিষ্ট ললাট সহসা প্রশস্ত হইল; লোচন-বিনির্গত অগ্নিশিখা যেন নিষ্প্রভ হইল। তিনি যে উপায় উদ্ভাবনের জন্য এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিলেন তাহা স্থির হইল বলিয়া যেন তিনি একটু শান্তি অনুভব করিলেন। মানসিক চিন্তা অতি প্রবল ও দুঃসহ হইলে চিত্তবৃত্তি সকল উগ্র হইয়া উঠে, কিন্তু সহসা সেই চিন্তার অবসান হইলে সমগ্র শরীরে, কেমন একটা অবসাদ আসিয়া পড়ে। রাত্রি

অধিক হইয়াছিল, অবসন্ন শরীরে রাজা একটি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন।

প্রতিহারী আসিয়া অভিবাদন করিল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপালদ্বয় উপস্থিত, রাজা প্রতিহারীকে বিদায় দিয়া দ্বারপালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি দিবার জন্ত সেই লোকটিকে আনিয়া যখন কারাগারে রাখা হইয়াছিল, তখন হইতে তোমরা দুইজন ভিন্ন অন্য কেহ দ্বার রক্ষা করিত কি?"

তখন প্রহরীগণ সভয়ে বলিল, "প্রভুর আদেশ মতই আমরা সর্ব্বদা একজন না একজন সেখানে উপস্থিত থাকিতাম। সে ব্যক্তিকেও কখনও কারাগারের বাহির হইতে দিই নাই।"

রাজা। "কারাগারে তোমরা ভিন্ন অন্য কেহ যাইত কি?"

প্রহরী। "অন্য কেহ কখনও যায় নাই। তবে যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী মধ্যে কয়েক দিন সেখানে গিয়াছিলেন। প্রভুর নিকট এ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমরা ভরসা করি নাই। বিশেষ তাঁদের দয়া ও ভালবাসা দেখিয়া আমরাও অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম।"

রাজা। "কোন্ সময় হইতে যুবরাজ এ ভাবে কারাগারে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন?"

প্রহরী। "বধ্যব্যক্তিকে আনয়ন করিবার কয়েক দিন পরেই সে অসুস্থ হয়। সেই সময় হইতেই যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী তার কাছে গিয়া বহুক্ষণ যাপন করিতেন।"

রাজা। "বধ্যব্যক্তির অসুখের সংবাদ যুবরাজ কিরূপে পাইলেন?"

প্রহরী।" যেদিন সে লোকটিকে আনা হয়, সেদিন তার জন্য সাধারণ খাদ্য আসিয়াছিল। কিন্তু তার পরদিন হইতে উত্তম খাদ্য আসিতে লাগিল। আমরাও—"

প্রহরীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তোমাদের কখনও কোন সন্দেহ হয় নাই ?”

প্রহরী। প্রভুর রাজ্যে যুবরাজের দয়ায় সকল লোকেরই সকল সাধ মিটিয়া থাকে। সেইজন্যই লোকটির সেরূপ যত্ন দেখিয়া আমরা অন্য কিছু ভাবিতে পারি নাই।

রাজা। তোমরা কখনও খাদ্যবাহককে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কর নাই কেন ?

প্রহরীদ্বয় বলিল—ঠাকুর বলিয়াছিল, “এই লোকটির তৃপ্তির জন্য রাজবাটী হইতে এই খাদ্যই আসিবে।”

প্রথম প্রহরী। ঠাকুর রোজ রোজ অনেক রকম খাবার আনিত। কিন্তু যখন সে লোকটির শরীর অসুস্থ হইল, তখন সে আর ভাল করিয়া খাইত না। একদিন সে কিছুই খায় নাই। ঠাকুর যেদিন এ খবর পাইল, সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে যুবরাজ কারাগৃহে আসিয়া সে লোকটিকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে সেইদিন হইতেই তার শয্যা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

রাজা অমরনাথের ক্রোধোদ্দীপ্ত নেত্র আবার রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তারপর ?”

প্রথম প্রহরী। তার পরদিন যুবরাজ এবং যুবরাজ্ঞী দুজনেই কারাগারে আসিলেন। আমি দ্বার ছাড়িলাম। তাঁহারা ভিতরে গেলেন। তাঁহারা সেইখানে অনেকক্ষণ রহিলেন বলিয়া আমার কেমন একটা সন্দেহ হইল। দ্বারপার্শ্বে গিয়া ছিদ্র হইতে ঘরের ভিতর যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি কখনও ভাবিতে পারি নাই ; দেখিলাম যুবরাজ্ঞী রোগীর মাথার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন এবং যুবরাজ বিছানার পার্শ্বে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। রোগীর তখন কি মনে হইতেছিল

জানি না ; কিন্তু সেই ভীষণ কারাগার তখন আর আমার ভীষণ বলিয়া মনে হইল না।

রাজা। তারপর?

প্রথম প্রহরী। প্রত্যহই তাঁহারা সেই ভাবে আসিতেন। যখন রোগী ভাল হইল, তখন হইতে আর তাঁহারা কারাগারে আসেন নাই। রাজপুত্রের শরীরে এত দয়া মায়া দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। এরূপ লোকের অসুখে তাঁহারা যত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, একজন আত্মীয়ের অসুখে আমরা তত করিতে পারি না। এত দয়া আমরা মানুষের ভিতর কখনও দেখি নাই।

প্রহরীগণ যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞীর ব্যবহারে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা বিমুগ্ধান্তঃকরণে সকল মনোভাব সর্ব্বদাই ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহারা এতক্ষণ সেই পবিত্র মূর্ত্তিদ্বয় চিন্তা করিতেছিল। কিন্তু যখন রাজার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল তখন তাহারা শিহরিয়া উঠিল। তাহারা দেখিল, রাজা অমরনাথের শরার কম্পিত হইতেছে। অধর দংশন করিয়া রক্তাভ-বদনে ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে বসিয়া আছেন তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রতিহিংসার একটা করাল কামনা প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে কাহার সাধ্য? দীপ্তসূর্য্যের মতই তাহা যেন প্রখর কিরণ বর্ষণ করিয়া জ্বলিতেছিল।

দৃপ্তসিংহ সহসা কোন দুর্ব্বল জীব দেখিতে পাইয়া যেরূপ গ্রীবাভঙ্গি করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়, রাজা অমরনাথ সেইভাবে প্রহরীদ্বয়ের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রহরীগণ তখনই প্রমাদ জানিল। তাহারা ভাবিল আজ রাত্রে ভবানী-মন্দিরে সে ব্যক্তির যে অবস্থা হইয়াছে, কাল প্রভাতে তাহাদেরও সেই অবস্থাপন্ন হইতে হইবে। তাহারা প্রতিক্ষণেই রাজা-দেশের অপেক্ষা করিয়া কম্পিত-কলেবরে দাঁড়াইয়া রহিল।

রজনী-শেষে চারিদিক নিস্তব্ধ ; সকলেই সুষুপ্ত। কেবল মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুর-পরিচারিকার এবং রক্ষীদের পদ-শব্দ কোথাও কোথাও শ্রুত হইতেছিল। প্রহরীগণ অন্তিমকাল উপস্থিত মনে করিয়া স্তব্ধ হইয়া আনত-বদনে দাঁড়াইয়াছিল এমন সময় সেই প্রকোষ্ঠের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা রাজা অমরনাথ গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"তোমরা দোষী সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ ক্ষমা লাভ করিলে ; আর কখনও রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করিও না। বধ্য-ব্যক্তি সম্বন্ধে যুবরাজ যে কার্য্য করিয়াছে তাহা অতীব অন্যায়, এবং আমার পক্ষে অবমাননাজনক ; সুতরাং সে দণ্ডনীয়। তোমরা এই মুহূর্ত্তে যুবরাজের শয়নকক্ষে গমন-পূর্ব্বক দ্বার খুলাইয়া যে অবস্থায় পাইবে সেই অবস্থাতেই তাহাকে ধরিয়া সেই বধ্য-ব্যক্তির পরিত্যক্ত কারাগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। যাও, কোনরূপে অন্যথা করিও না।"

প্রহরীদ্বয় প্রভুপদে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং বহু ভাগ্যে রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া ভবানীদেবীকে স্মরণ করিতে করিতে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল।

এইরূপ আজ্ঞা দিয়াই রাজা ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত প্রতিহারীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"যুবরাজের শয়ন-কক্ষের দিকে যাও। প্রহরীদ্বয় যুবরাজকে ধরিয়া লইয়া গেলে তুমি সেই শয়নাগারের দ্বার রক্ষা করিবে। কোন অন্তঃপুরবাসীকে তথায় প্রবেশ করিতে দিবে না এবং যিনি ভিতরে আছেন তাঁহাকেও বাহিরে যাইতে দিবে না। কোন পরিচারিকা কার্য্যব্যপদেশে সেই গৃহে যাইতে পারে, কিন্তু কার্য্য সমাধা করিয়াই ফিরিয়া আসিতে বলিবে এবং যুবরাজ্ঞীর সহিত কোন কথাবার্ত্তা কহিতে নিষেধ করিবে। যাও, দেখিও, যেন রাজাজ্ঞার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না হয়।"

প্রতিহারী বিদায় হইল। প্রকোষ্ঠ মধ্য হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে

আসিয়া দেখিল, পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ প্রভামণ্ডিত হইয়াছে। সে ক্ষীণ জ্যোতি এখনও উপরিস্থ আকাশ গাত্রের ঘনসন্নিবিষ্ট অন্ধকার রাশি দূর করিতে সক্ষম হয় নাই। সেইজন্যই যেন ক্ষীণ জ্যোতি-রেখাগুলি সমবেত হইবার নিমিত্ত আকাশপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিল। প্রতিহারী সেই রক্তিমাভ আকাশপ্রান্ত দেখিয়া যেমন পশ্চাদ্ভাগে রাজ-প্রকোষ্ঠের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, অমনি দেখিল—গাঢ়তর অন্ধকার যেন তথায় বিরাজ করিতেছে। সে অন্ধকার স্থানে স্থানে পুঞ্জে পুঞ্জে এমত ভাবে বসতি করিতেছিল যে, তাহা দূর করা অল্পায়াসসাধ্য হইবে না। তখন সে ভাবিতে লাগিল—অচিরেই সূর্য্য উদিত হইয়া আকাশ ও পৃথিবী হইতে অন্ধকার-রাশি দূর করিবে কিন্তু এই রাজ-অন্তঃপুরের অন্ধকার নাশ করিয়া আর কি কখনও সুখসূর্য্য উদিত হইবেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভবানী-মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কুমার ভবানীপ্রসাদ শয়নকক্ষে গিয়া স্ত্রীর নিকট অনেকক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিবার পর হৃদয়ের ভার কিছু লঘু বোধ করিলেন। মনুষ্য সামাজিক জীব, সুতরাং নিজের সুখদুঃখের সহিত আত্মীয়-স্বজনকে লিপ্ত রাখিতে মনুষ্যমাত্রেরই ইচ্ছা হয়। যদি কেহ সুখের সময় প্রীতি-সম্বর্দ্ধনার্থ আত্মীয়গণের সাহচর্য্য লাভে বঞ্চিত হয়, বা দুঃখের সময় কাহারও সহানুভূতি না পায়, তাহা হইলে তাহার নিকট জগৎ অন্ধকারময়, জনশূন্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এরূপ জনশূন্যতার মধ্যেও, এরূপ নিরানন্দ হৃদয়েও প্রেমপাত্রীর একটি কথায় আনন্দের উৎস বহিয়া

যায়, শূন্য মরুভূমি-সদৃশ-সংসার অমৃতময়-স্বর্গ বলিয়া মনে হয়। মানব-জীবনে এমন এক একটি সময় আসে যখন পতিব্রতা স্ত্রীর একটি প্রণয়-সম্ভাষণ, একটি প্রেম-ভক্তিপূর্ণ ব্যবহার বা একবিন্দু অশ্রু সংসারের সকল মলিনতা দূর করিতে সক্ষম হয়; একটি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার, সকল অবমাননা বিস্মৃত করাইতে পারে; কিংবা চোখের শুধু একটু সরল কটাক্ষ, হৃদয়মধ্যে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারে। যদি স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে অগাধ স্নেহ ও মমতা থাকে, যদি উভয়ের চিত্তে উভয়ের জন্য উৎকণ্ঠা জন্মে এবং উভয়ে স্বীয় সুখান্বেষণে বিরত থাকিয়া অন্যের সুখোৎপাদনে তৎপর হয়, তাহা হইলে মর্ত্যের সংসারও স্বর্গে পরিণত হইতে পারে। তখন উভয়ে অনাবিল এবং নিষ্পাপ থাকিয়া অগাধ প্রেমের মধ্যে চিরশান্তি উপভোগ করে। সংসারে যে পুরুষ এরূপ সহধর্ম্মিণী লাভ করে, সেই সুখী, প্রকৃত সুখী হইতে পারে।

ভাবানীপ্রসাদ কতকগুলি বিভিন্নমত হৃদয়ে পোষণ করিতেন বলিয়া রাজপরিবারস্থ কোনও ব্যক্তির নিকট কোনরূপ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেন না। অনেক সময় তাঁহার মনে হইত যেন তিনি বিস্তৃত মরুভূমিতে একাকী বসতি করিতেছেন কিংবা জনশূন্য শ্মশানভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে না পারিলে, অভীষ্ট কর্ম্মে কাহারও সহানুভূতি না পাইলে, অভিলাষানুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান মধ্যে মধ্যে না দেখিলে তাঁহার সকল স্ফূর্ত্তি চলিয়া যাইত, কর্ম্মে কোন উৎসাহই থাকিত না। কিন্তু এরূপ অবসাদ তাঁহার হৃদয়মধ্যে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারিত না। যখনই তিনি অন্তরালে বসিয়া কল্যাণীর প্রেমপূর্ণ মুখখানি চিন্তা করিতেন বা সুযোগ পাইলে আপন শয়নকক্ষে আসিয়া সেই প্রেম-প্রতিমার পার্শ্ববর্ত্তী হইতেন, তখনই সকল মানসিক কষ্ট অন্তর্হিত হইত। ভবানীপ্রসাদের স্নেহ-প্রবণ হৃদয়, কল্যাণীর

অবিরাম স্নেহ-প্রবাহে পরিপ্লত হইত। কল্যাণীর সেই কুঞ্চিত অলকাবলী-শোভিত, সুন্দর মুখখানি, নবোদ্ভিন্ন চম্পক-কোরক সদৃশ বর্ণ, সরল, স্নিগ্ধ, জ্যোতির্ম্ময় নেত্র দুটি এবং সর্ব্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর সেই সলজ্জ প্রণয়শীল ব্যবহার দেখিয়া ভবানীপ্রসাদ সব ভুলিয়া যাইতেন। আবার সংসার সুখময়, কর্ম্মময় বলিয়া মনে হইত। প্রতিপক্ষদিগের ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া সহৃদয়তার সহিত আবার তিনি তাঁহাদের কর্ম্মে যোগ দিতেন এবং যথাসাধ্য সকলের অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইতেন। যাহার হৃদয় এরূপ সরল, যাহার হৃদয়ে নির্ম্মল প্রেমের কণামাত্রও বিদ্যমান থাকে, সে সকল সময়েই এই সুখদুঃখময় সংসারের কুটিলতা ভুলিয়া গিয়া এক অভূতপূর্ব্ব শান্তি উপভোগ করিতে পারে। ভবানীপ্রসাদ একা কল্যাণীর জন্য এই আত্মপরায়ণ, পরশ্রীকাতর, প্রীতিশূন্য সংসারে আনন্দে বসতি করিতেছিলেন।

কল্যাণীর বক্ষ নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া ভবানীপ্রসাদ কিছু শান্তি অনুভব করিলেন। যে পৈশাচিক দৃশ্য দেখিবার জন্য তিনি আজ ভবানী-মন্দিরে আহূত হইয়াছিলেন এবং যে দৃশ্য দেখিবার জন্য রাজপার্শ্বে সাবধানতার সহিত রক্ষিত হইয়াছিলেন, সে ঘটনাস্থল হইতে অত্যন্ত মানসিক-বিপ্লবে জ্ঞানশূন্য হইয়া দুঃসাহসের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আর কখনও রাজসমক্ষে উপস্থিত হইবেন না। আজ তাঁহার মনে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়াই মনে এইটুকু অভিমান হইয়াছিল। কিন্তু কল্যাণীর নিকট কিছুক্ষণ থাকিবার পর তাঁহার সকল অভিমান বিদূরীত হইল। তখন সেই পিতৃভবন, সেই প্রজামণ্ডলী, সেই পরমারাধ্য পিতৃদেব—সকলই তাঁহার চক্ষে আবার সুন্দর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিরক্তি-জনকের প্রতি বিরাগের উপশম হইল। ভবানীপ্রসাদ মুগ্ধান্তঃকরণে কল্যাণীর মুখপ্রতি চাহিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য

চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অন্তরের চিন্তাটি কথায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "যদি ভগবান্ কখনও সুযোগ দান করেন, তাহা হইলে আমরা কি কখনও আমাদের পরিবারের মধ্যে এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে জীবহিংসা বন্ধ করিতে পারিব না ?" ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন, কল্যাণী তাঁহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম। তাঁহার মনে অপার আনন্দ হইল। তখন তিনি কল্যাণীকে আন্তরিক স্নেহে বক্ষে ধারণ করিলেন। মানসিক অবসাদ হেতু তাঁহারা সেই অবস্থাতেই ক্ষণকাল মধ্যে নিদ্রিত হইলেন।

নিশাশেষে দ্বারে করাঘাত শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শব্দ শুনিয়াই যুবরাজ দ্বার খুলিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন এবং পাছে কল্যাণীর নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেইজন্ত অতি সাবধানে অর্গল মোচন করিলেন। দ্বার উন্মুক্ত হইলে তিনি দেখিলেন যে, কারাগার-রক্ষকদ্বয় স্ব স্ব পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তাহাদের সেইখানে দেখিয়াই কুমার ভবানীপ্রসাদ অসময়ে এখানে আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। অভিবাদন করিয়া প্রহরীদ্বয় বলিল, "রাজাজ্ঞায় আমরা এইখানে আসিয়াছি। আপনি এই মুহূর্ত্তে আমাদের সঙ্গে আসুন।"

যে অবস্থায় কুমার ভবানীপ্রসাদ শয়নাগারের বাহিরে আসিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে প্রহরীদের সহিত যাইতে হইল। একবার শয়নকক্ষের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি সেই নিদ্রিত প্রেম-প্রতিমার মুখাবলোকন করিবারও অবসর পাইলেন না।

এদিকে প্রভাত-সমীরণ তাহার স্নিগ্ধশীতল করস্পর্শে ব্যথিত-হৃদয়া কল্যাণীকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকালীন অরুণ আভা গবাক্ষমধ্য দিয়া যখন গৃহে প্রবেশ করিল, তখন কল্যাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয্যামধ্যে স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া তিনি অস্থির হইয়া

শয্যাত্যাগ করিলেন। বাতায়ন-সমীপেও যুবরাজের কাষ্ঠাসন শূন্য দেখিয়া তাঁহার চিত্ত একান্ত ব্যথিত হইল। তখন তিনি বস্ত্রাধারের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কুমারের পরিচ্ছদ তথায় রহিয়াছে। কেবল পাদুকাটি নাই। কল্যাণী এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার আর কখনও দেখেন নাই।

যেদিন প্রথমে যুবরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইত, তিনি প্রথমে কল্যাণীকে জাগরিত করিতেন এবং দুইজনে একত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া উদ্দেশ্যে কুলদেবতাকে প্রণাম করিতেন। তারপর দেবতার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া কুমার কল্যাণীর নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিতেন। আজ এই অভিনব ব্যাপার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া যেমন কল্যাণী দ্বারদেশে আসিয়া কপাট খুলিলেন, অমনি দেখিলেন এক প্রহরী তথায় দাঁড়াইয়া আছে। কেন যে প্রহরী তথায় দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইচ্ছা হইল, এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু রাজকুলবধূ হইয়া কি করিয়া প্রহরীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহা ভাবিয়া যখন তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তখন প্রহরী নিজেই তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিল, "দেবি! অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; রাজার আদেশ এইরূপ যে, আজ হইতে আপনি এ ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না এবং অন্য কেহ এ ঘরে আসিতে পারিবেন না। মহামহিম রাজকুলশ্রীযুবরাজও—

এরূপ রাজাদেশ শুনিবামাত্র কল্যাণী দুঃখে অধীরা হইয়া, প্রহরীর কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং প্রহরীর শেষকথা—"যুবরাজও কারাগৃহে বন্দী হইয়াছেন"—এ কথা আর শুনিতে পাইলেন না। যদিও তিনি যুবরাজ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাইলেন না, তথাপি তিনিও যে আজ বিপন্ন হইয়াছেন, এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তখন কল্যাণী আর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না।

কুমারের উপবেশন-পিঠিকার সম্মুখস্থিত পাদুকা রক্ষিকার উপর মস্তক রাখিয়া গৃহতলে কল্যাণী অবলুণ্ঠিতা হইলেন। নিদাঘোত্তাপ-প্রপীড়িত বৃন্তচ্যুত কমলিনীর ন্যায় তাঁহার সেই সুন্দর মুখপদ্ম শুষ্ক ও ম্লান হইয়া পড়িল। পূর্ব্বরাত্রের গাঢ় নিদ্রার জন্য তিনি নিজেকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু যখনই তাঁহার মনে হইল যে, জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল স্বামীর শ্রীচরণ দর্শন জীবনে হয়ত আর কখনও ঘটিবে না, তখনই তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন। এই শরীর মনের দুরবস্থায় বধূ কল্যাণীকে একবার দেখিতে পারে, এমন কেহই গৃহমধ্যে রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রজনী প্রভাত হইল। অন্তঃপুর-পরিচারিকারা প্রথমে দেখিল যে, কুমারের শয়নকক্ষের সম্মুখে একটি প্রহরী দণ্ডায়মান। তাহারা এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না; এবং কেহই ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে সাহসীও হইল না। ক্রমশঃ বেলা হইল। সমস্ত ছোটবড় রাজকর্ম্মচারীই গতরাত্রে ভবানী-মন্দিরে জাগরণের জন্য বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিল; এখন সকলেই উত্থিত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মুখে যুবরাজের মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে পলায়নসম্বন্ধে সকল কথাই ঘোষিত হইল। তখন সকলেই বুঝিল, রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই; তাঁহার সকল আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া এবং দেবীর পূজার অবজ্ঞা প্রদর্শন করার জন্য যুবরাজ বন্দী হইয়াছেন। এ সংবাদ পাইয়া সকলেই যে বিশেষ দুঃখিত হইল, তাহাও নহে।

এ সংসারে কয়জন পরের সুখে হাসিতে বা পরের দুঃখে কাঁদিতে

পারে? হাসির কারণ উপস্থিত হইলে কয়জন সঙ্গতভাবে হাসিয়া থাকে? বা দুঃখের সময় প্রাণভরা সহানুভূতি দেখাইতে পারে? নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত আমরা এরূপ পরাধীন হইয়া থাকি যে, হাসিবার বা কাঁদিবার সময়ও অন্তের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। যাহার নিকট হইতে কিছু পাইবার আশা করি, সে বেশী হাসিলে আমরাও বেশী হাসি; আবার কাঁদিবার স্থলে তাহাকে কাঁদিতে না দেখিলে আমরাও গম্ভীর হইয়া যাই। আমাদের এরূপ ঘোর পরাধীনতার জন্তই আমরা কাহারও কোন অবস্থা-বিপর্য্যয় সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি না; একজনকে প্রকৃত ভাল বাসিলেও সে ভালবাসা সকল সময় দেখাইতে পারি না; আবার সময়ে সময়ে কোন ঘৃণার পাত্রের প্রতিও অন্তরের সকল ঘৃণা চাপিয়া রাখিয়া মৌখিক শ্রদ্ধা বা ভালবাসা দেখাইয়া থাকি। মানুষের এরূপ ভাব গোপন করিবার প্রবৃত্তি ও কপট ব্যবহারের জন্ত সংসারের দুঃখ যে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার হিসাব করা যায় না।

যুবরাজের ঘরের সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতে যাইতে দাসী তরলিকা অপর এক দাসীকে দেখিতে পাইয়া রসিকতা করিয়া বলিল—"এ আবার কি শাস্তি লো? এমন লোক-দেখান শাস্তি না দিলেই কি হ'তো না?

উত্তরে চিন্তা বলিল—ওমা, এতে আর অবাক্ হবার কি আছে? এ যে সব রাজা রাজড়ার কাণ্ড! একি আর তোমার আমার মত ঝি-চাকরের ব্যাপার যে, কথায় কথায় শাল শূল।

দুইজন দাসীতে এইরূপে কথা কহিতে কহিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুনন্দা আসিয়া বলিল, "এতবড় অন্তায় আর কেউ কি কর্‌তে সাহস কর্‌তো? হাজার হাজার লোকের সামনে যুবরাজ রাজার মাথাটা কি রকম করে হেঁট্ কর্‌লেন! যতই হউক, জানেন ত, বাপ কি আর নিজের ছেলেকে সাজা দিতে পার্‌বে।

তখন তরলিকা বলিল, "আরে তা আর হয় না। আমাদের রাজা দোষ দেখলে আর ছেলে মেয়ে বিচার করে না। সাজা দেবেই দেবে। তবে মা-মরা ছেলে, তাই একটু কম করে সাজাটা দেবে বোধ হয়। কিন্তু এখন তাদের যে রকম সাজা হয়েছে, এ রকম সাজা যদি আমাকে কেউ দেয়, তা'হলে ত আমি রোজ চুরি ডাকাতি করি।

চিন্তা।—কেন লো! আর বুঝি তোর খেটে খেতে ইচ্ছে হচ্চে না? তাই রাজবাড়ীর খোরাক্ খেয়ে কারাগারের অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকতে চাচ্চিস্?

তরলিকা।—তা স্বামী স্ত্রীকে এক ঘরে কয়েদী হ'য়ে থাকতে দেখলে, সে রকম সাজা ভোগ কর্‌তে আর কার না ইচ্ছা হয়?

চিন্তা।—যত বয়স হ'চ্চে ততই যে তোর সখ বাড়ছে দেখতে পাচ্চি! স্বামী পেয়েছিস্ না কি?

সুনন্দা।—ও কথা ছাড়্। আচ্ছা, চুপ্, যুবরাণীমার সঙ্গে যুবরাজও কি ওই ঘরেই আছেন না কি?

প্রাঙ্গণে তিন দাসীর মধ্যে এরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় সূপকারিণী আসিয়া সুনন্দাসুন্দরীর প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিল। সে বলিল, "তাও বুঝি শুনিস্‌নি? যুবরাজ কাল সে লোকটাকে যে কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছিলেন। পথে ধরা পড়েন, তখন তিনি সে লোকটাকে ফেলে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালান। এখন থেকে তিনি যে কোথায় তা' কেউ জানেই না।

ইহা শুনিয়া তরলিকা বলিয়া উঠিল—ও বুঝেছি। পাছে যুবরাণী রাজবাড়ী থেকে পালিয়ে যুবরাজের সঙ্গে মেশে, সেই ভয়ে রাজা তাঁকে পাহারাওয়ালা দিয়ে ঘরে আটক করেছে।

যখন রাজবাড়ীতে দাস-দাসী মহলে কুমার সম্বন্ধে এরূপ নানা

আন্দোলন চলিতেছিল, তখন পুর-স্ত্রীরা যুবরাজের ঘরে যাইবার জন্য আসিয়া দেখিলেন—দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। প্রহরী তাঁহাদের কাহাকেও সে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না। তখন বধূ কল্যাণী বন্দী হইয়াছেন বুঝিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বালক-বালিকারা প্রহরীকে যুবরাজ ও তাহাদের প্রিয় মহাদেবী সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই কোন উত্তর পাইল না।

সর্ব্বত্রই যুবরাজ সম্বন্ধে একটা আলোচনা হইতে লাগিল। অমাত্য-মহলে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মহামন্ত্রী পান্নাসিংহ অন্য এক সহকারীকে বলিলেন, "মহারাজ যে ভাবনা করিতেছিলেন তাহাই সংঘটিত হইল! তিনি পুত্রের মনের গতি অনেক দিন হইতে পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ইদানীং তাঁহার সুস্পষ্ট বোধ হইয়াছিল যে, যদি পুত্রের চিত্ত পরিবর্ত্তন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কুলগত আচার রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। রাজা ভাবিয়াছিলেন, যুবরাজের সমক্ষে একটি হত্যাকাণ্ডের আয়োজন করিলে বালস্বভাবসুলভ ভীতি তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে বিদূরিত হইবে এবং কৌলিক আচারের প্রতি তাঁহার আস্থা জন্মিবে। কিন্তু দেবকার্য্যে যুবরাজের এরূপ অনাস্থা দেখিয়া রাজা অমরনাথ ক্রোধান্ধ হইয়াছেন। যুবরাজকে এক্ষণে বন্দীভাবে কারাগৃহে রাখা হইয়াছে। যথাসময়ে তাঁহার বিচার হইবে। কিন্তু বিচারে যে কিরূপ দণ্ডাদেশ হইবে, তাহা ত' কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তিনিই এ বংশের একমাত্র বংশধর, সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী। যদি এরূপ পুত্রকে রাজা ত্যাজ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে রাজ্যের কি গতি হইবে?

সহকারী চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় এক কূট অভিসন্ধি মহামন্ত্রীর মনোমধ্যে উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন, যে চিন্তা এখনও মধ্যে মধ্যে

আমায় ব্যথিত করে এবং যে উদ্দেশ্যে একবার সকলের অজ্ঞাতসারে চেষ্টাও করিয়াছিলাম, এখন ত' তাহার উপায় হইতে পারে। কুমার ভবানীপ্রসাদ ত্যজ্য, যদি বিচারে ইহাই স্থির করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে রাজা অমরনাথের মৃত্যুর পর এ রাজ্য উত্তরাধিকারীশূন্য হইয়া থাকিবে। সে সময় এ রাজ্য বিনা চেষ্টায় আমার করতলগত হইবে। তখন এ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া আমি এতদিনের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিতে পারিব।

মহামন্ত্রী পান্নাসিংহ মানস-নেত্রে একবার সর্ব্বত্র দেখিলেন। তাহার ভাগ্যগগনে যে কাল মেঘ এতদিন পুঞ্জীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, শীঘ্র তাহা অপসারিত হইবে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তাঁহার ভয় হইল, এক রাজবয়স্য বিদূষককে। তিনি কুমার ভবানীপ্রসাদকে ভালবাসেন। রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মথুরাসিংহকেও সন্দেহ হয়। রাজাও তাঁহাকে ভালবাসেন, কিন্তু মথুরাসিংহ কখনও কোন কার্য্যে কুমার ভবানীপ্রসাদের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন এরূপ দেখি নাই। তিনিই এখন সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি নিশ্চয় কুমারকে সাহায্য করিবেন না। অধিক বেতন এবং উৎ-কোচের প্রলোভন দেখাইলেই মথুরাসিংহ আমার হস্তগত হইবে। একা বিদূষককে আমি ভয় করি। তিনিই একবার বিবাহের সময় যুবরাজকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া বাঞ্ছিত স্ত্রীলাভে সহায়তা করিয়াছিলেন। এবারেও হয়ত আমার চিরকল্পিত উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সকল চিন্তা আকাশ-কুসুমে পরিণত করিবেন।

আশাপ্রদীপ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, এমন সময় এক নূতন চিন্তা-স্রোত আসিয়া আবার তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। মহামন্ত্রীর মনে হইল—বিদূষক বৃদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জীবনাশা আর বেশী দিন নাই। কিন্তু রাজা অমরসিংহ বলিষ্ঠ পুরুষ, সবেমাত্র যৌবন

অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন। যদি এখন যুবরাজ-সম্বন্ধে একটি স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না দিয়া, এরূপ নির্জ্জনবাসের জন্য কুমারের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এই আশায় রাজাকে কিছুদিনের জন্য নিরস্ত রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে একটা সুবিধা হইতে পারে। বৃদ্ধ বিদূষকের শরীরে রোগের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি আর বেশীদিন বাঁচিতে পারেন না। তাঁহার মৃত্যু হইলে আমার সকল উদ্দেশ্য নির্ব্বিঘ্নে সাধিত হইতে পারিবে।

মন্ত্রী মহাশয় স্বার্থান্ধ হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। মানব-হৃদয় যখন স্বার্থ-চিন্তায় নিযুক্ত হয়, তখন তাহার বহু অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও দূরদৃষ্টি একেবারে লোপ পায়। চক্ষের কিছু দূরে অবস্থিত অঙ্গুলি যেমন গগনপটে অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থান আবৃত করিয়া রাখে, কিন্তু সেই অঙ্গুলি চক্ষের অতি নিকটে স্থাপিত হইলে যেমন শত যোজনব্যাপী গগনমণ্ডল দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইলেও অন্তরালে রাখিয়া দেয়, সেইরূপ স্বার্থ অতি ক্ষুদ্র হইলেও মানস-চক্ষুকে এরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, দৃষ্টিশক্তি সত্ত্বেও তাহা বাহ্যিক কোন স্থূল পদার্থ দেখিতে বা কোন বিষয়ের যথার্থ নিরূপণ করিতে পারে না। স্বার্থ-চিন্তা বিজড়িত হইয়া মন্ত্রী জগতের নিত্য এবং অতি সাধারণ ঘটনা পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধ বিদূষকও কালের করালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি হইবে এই ভরসায় তিনি অপেক্ষা করিবেন স্থির করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সহকর্ম্মীর সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ কথা কহিতে কহিতে মহামন্ত্রী ক্ষণিক চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া বলিল—মহারাজ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। সহকারীকে বিদায় দিয়া মহামন্ত্রী তৎক্ষণাৎ প্রতিহারীর সহিত গমন করিলেন এবং প্রতিহারী-প্রদর্শিত পথ দিয়া রাজার বিশ্রামাগারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রাজা রাজবয়স্য বিষ্ণুদয়ালের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

রাজা অমরনাথ এবং বিষ্ণুদয়াল অভিবাদন করিয়া মন্ত্রী বিদূষক-প্রদর্শিত আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিলেন, রাজার মূর্ত্তি স্থির, অথচ গম্ভীর। তাঁহার মুখে এমন একটি ভাব সুস্পষ্ট ছিল যে, দেখিলেই মনে হয় কোন পূর্ব্বকৃত কার্য্যের অনুশোচনায় তিনি এখন দুঃখিত। মন্ত্রী রাজাদেশের অপেক্ষায় নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক স্থির থাকিবার পর রাজা বিষ্ণুদয়ালকে বলিলেন—আমি ত বলিয়াছিলাম, এরূপ অজ্ঞাত-চরিত্রা বালিকার সহিত বিবাহে কখনই সংসারের মঙ্গল হইতে পারে না। যদিও পরে জানিতে পারা গিয়াছিল যে, বালিকা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া, তথাপি তাঁহার মনোবৃত্তি, শিক্ষা ও চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। অধিকন্তু তাঁহার পিতৃভবনে কিরূপ লোকাচার ছিল, সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান তথায় হইত কি না, তাঁহাদের ধর্ম্মমতই বা কিরূপ ছিল—এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবার কোন সুবিধা হয় নাই বলিয়া ভবানীপ্রসাদের সহিত এরূপ অপরিচিতার বিবাহ দিতে আমি সম্মত হইয়াও তোমার আগ্রহাতিশয্যেই অনুমত করিতে পারি নাই। তুমি বলিলে, "এরূপ প্রগাঢ় প্রণয়, এরূপ পবিত্রতা সহজে

কোথাও দেখা যায় না।” কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল—যুবক যুবতীর এরূপ প্রণয় অতি স্বাভাবিক, অথচ অতি ক্ষণস্থায়ী। আমি ত ইহাতে কোন অকৃত্রিম ভাব বা অমানুষিক ব্যাপার কিছু দেখি নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমার পুত্র এই অপরিচিতা রূপসীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিল, আমি তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত হই নাই; কিন্তু তোমার বিশুষ্ক মুখ ও কাতর আবেদন আমার সঙ্কল্প ভাসাইয়া দিয়াছিল। কেবল প্রিয় বয়স্তের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই বলিয়া আমি এই অশুভ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলাম। অনুচিত বিবেচনা করিয়াও যে কার্য্য করিয়াছি, তাহার ফলভোগ আমি করিলাম; এক্ষণে তোমরাও কর।

রাজা পুনরায় বলিলেন, কাল ভবানী-মন্দিরে যুবরাজের যে অশিষ্টাচার ও দেবতার প্রতি অভক্তি তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহার জন্য শুধু ভবানীপ্রসাদই দায়ী নহে। তাহার স্ত্রীই এ কার্য্যে অধিকতর দোষী। দৈবকার্য্যে বা দেবসেবায়, পূর্ব্বে ভবানীপ্রসাদের কখনও কোনরূপ বিরাগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এই বিবাহের পর হইতেই তাহার চিত্ত একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে কখনও পূজার সময় ভবানীমন্দিরে উপস্থিত থাকিত না সত্য, কিন্তু তথায় থাকিতে তাহার যে কোন আপত্তি ছিল এরূপ কোন কথা আমরা কখনও শুনি নাই। সেই জন্যই মনে হয় প্রজামণ্ডলীর মধ্য হইতে এরূপ কাপুরুষের মত পলায়ন শুধু স্ত্রীর প্ররোচনায় হইয়াছে। যে ইহা কেবল একটা অনুমান তাহা নহে। সকল ঘটনা শুনিলে এরূপ সিদ্ধান্তের সত্যতা তোমরাও উপলব্ধি করিতে পারিবে।

তার পর রাজা বধ্যব্যক্তির অসুস্থতা ও তাহার রোগমুক্তির জন্য পুত্র ও পুত্রবধূর যত্নসম্বন্ধে সবিশেষ তাঁহাদের বলিলেন। আরও বলিলেন,

পূজার দিন নির্দ্দিষ্ট হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহারা মন্ত্রণা করিয়া সেই ব্যক্তির মুক্তির জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল। যে লোকটিকে দেবোদ্দেশে বলি দিবার জন্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা কাহাকেও বলা হয় নাই। অথচ ভবানীপ্রসাদ অনুমানে যে কি করিয়া বুঝিল তাহা ধারণা করিতেও পারিলাম না। না বুঝিলে সে সেই বধ্যব্যক্তির প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন করিল? যাহা কখনও হয় নাই এবং যে সকল কার্য্য মানুষ ভাবিতেও পারে না, তাহাই তাহারা করিয়াছে। এই সকল অক্ষমনীয় অপরাধের জন্য আমি ভবানীপ্রসাদকে কারারুদ্ধ করিয়াছি এবং পুত্রবধূর শয়নাগারেই তাঁহার নির্জ্জনবাসের ব্যবস্থা করিয়াছি। আমার প্রিয় পুত্রের এবং পুত্রবধূর শাস্তি বিধান করা আমার পক্ষে একেবারেই সুখের বিষয় নহে। তথাপি রাজা-সিংহাসনে বসিয়া রাজার কর্ত্তব্য আমায় পালন করিতেই হইবে। অপরাধীর দণ্ড দিতেই হইবে। স্বীয় অবিবেচনার প্রতিফল আমি পাইলাম। এইবার তোমরা তোমাদের প্রিয় ভবানীপ্রসাদের শাস্তিবিধান করিয়া স্বকৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কর।

বিষ্ণুদয়াল প্রথমে কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "ভবানীপ্রসাদ অপরাধ করিয়াছেন বটে; কিন্তু সে অপরাধ তত গুরুতর বলিয়া আমার মনে হয় না। যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভবানীপ্রসাদের হৃদয় অতি কোমল, তাঁহার চিত্ত অতি দয়ার্দ্র। এই বালিকার প্রতি কুমারের প্রণয়-লক্ষণ আমিই সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারি। নানাবিধ উপায়ে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের চরিত্র অপাপ-বিদ্ধ, প্রণয় নিষ্কলঙ্ক, অকৃত্রিম এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিমূলক। অনুসন্ধান করিয়া যখন দেখিলাম যে, ভবানীপ্রসাদ কল্যাণীময় হইয়াছেন এবং কল্যাণী বাঞ্ছিত পতি-লোভের আশায় কায়মনোবাক্যে দেব-সেবা করিয়া অহরহঃ তাঁহারই আশীর্ব্বাদ কামনা করিতেছেন, তখন কল্যাণী কোন্

বংশসম্ভূতা এবং তাঁহার পিতা কে, এই সকল সংবাদ লইতে প্রবৃত্ত হইলাম। যখন দেখিলাম কল্যাণী সদ্বংশসম্ভূতা ক্ষত্রিয়াত্মজা, তখন ভবানীপ্রসাদের সহিত তাঁহার বিবাহে আমার কোন আপত্তি রহিল না। যখন আমি অনুসন্ধানফলে আত্মবিনোদনে সমর্থ হইয়াছিলাম, তখনই আমি আপনার নিকট কল্যাণীর সহিত ভবানীপ্রসাদের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করি। বধূর পিতৃ-পিতামহের সংবাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সঠিক কোন কিছু জানিতে পারি নাই বলিয়া আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কোন কথা জানাই নাই। ইচ্ছা ছিল, কল্যাণীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যখন আপনি আমার নিকট সেই সদ্‌গুণ-সমন্বিতা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী বালিকার বিষয় জানিতে চাহিবেন, তখন তাঁহার বংশকীর্ত্তি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সেইরূপই রাজসমক্ষে বিবৃত করিব। কিন্তু বিবাহ-রাত্রে যখন আপনি কল্যাণীর বংশ-গৌরবের কথা শুনিলেন, তখন ত আপনি সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। সুতরাং, এ বিবাহে "কন্যা অপরিচিতা" এরূপ কথা বলা সঙ্গত নহে।

"ভবানীপ্রসাদ এবং বধূর মধ্যের যে প্রেম তাহা সাধারণের মধ্যে লক্ষিত হয় না। যুবরাজ যদি কল্যাণীর বহিঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদয়াল কখনও এ বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইত না। যখন মানুষ বহিঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অন্যকে ভালবাসে, তখন সে ভালবাসা সৌন্দর্য্য হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমিতে থাকে। তাহা অতি নিম্নস্তরের ভালবাসা—সুতরাং ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ভবানীপ্রসাদের ভালবাসা এরূপ নিকৃষ্ট নহে। সে ভালবাসা কল্যাণীর বহিঃসৌন্দর্য্যের জন্য তাঁহার চিত্তে জাগে নাই। যে স্বর্গীয় প্রণয়ের জন্য জনকদুহিতা রাজভবন ত্যাগ করিয়া সানন্দে স্বামীর সহিত বনগমন করিয়াছিলেন, যে প্রগাঢ় প্রণয়ের জন্য মহাদেব কর্তৃক অবজ্ঞাতা হইয়াও

দেবাদিদেবের চরণ লক্ষ্য করিয়া পার্ব্বতী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, যে বিশুদ্ধ প্রেমের জন্য পতিব্রতা শকুন্তলা স্বামী কর্ত্তৃক কলঙ্কিনী আখ্যাত হইয়াও সেই স্বামীরই উদ্দেশ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিনপাত করিয়াছিলেন— সেই বিশুদ্ধ প্রেমের অনুরূপ ভাব যুবরাজ ও বধূর চিত্তে দেখিয়াছিলাম। যখন অন্তঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নরনারীর মধ্যে হৃদয়ের বিনিময় হয়, তখন সে দাম্পত্যপ্রেম অনন্ত, অক্ষয় হইয়া থাকে। সে মোহশূন্য পবিত্র হৃদয়ে পাপ কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ পুণ্যচরিত্রের অমল জ্যোতিতে বিশ্বজগৎ চিরদিনই মুগ্ধ থাকিবে।

"বধূ কল্যাণীর সংসর্গে ভবানীপ্রসাদের চিত্তবৃত্তির কোনই অবনতি ঘটে নাই ; বরং উন্নতিই হইয়াছে। রাজ-পরিবারস্থ সকলেই, এমন কি, কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গ পর্য্যন্ত যুবরাজের আদর ও স্নেহে আপ্যায়িত হইয়াছে। মুখে প্রকাশ করিতে না পারিলেও অন্তরে তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। অন্তঃপুরনারীমাত্রেই বধূ কল্যাণীর গুণমুগ্ধা। কেবল রাজপরিবারের অনেকেই যে তাঁহাদের আত্মীয়তায় মুগ্ধ, তাহা নহে। রায়নগরের সকল দুঃস্থ প্রজাই যুবরাজের ব্যবহারে ও সৌজন্যে পরম উপকৃত। এ সকল সদ্গুণ ভবানীপ্রসাদের হৃদয়ে নিহিত ছিল, কিন্তু প্রকাশ পায় নাই। স্ত্রীর সাহচর্য্যে ও তাঁহার কর্ম্মপ্রিয়তার আদর্শে যুবরাজের অনেক সদ্গুণ বিকশিত হইয়াছে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে। যুবরাজ কপট নহেন। তিনি যাহা সৎ বলিয়া মনে করেন, তাহাই অন্তরের সহিত সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করেন। এই ঐকান্তিকা-বশতঃই তিনি সেই বধ্য ব্যক্তির রোগ-মুক্তির জন্য সস্ত্রীক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোধ হয়, রোগীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, সে নির্দ্দোষ। নির্দ্দোষের কারারুদ্ধ থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় তিনি তাহার কারামুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এরূপ উদার-হৃদয়, এরূপ মহানুভবতা রাজপুত্রের উপযুক্ত

হইয়াছে, কল্যাণীর স্বামীর যোগ্যই হইয়াছে। এরূপ চরিত্র সংসারে দুর্ল্লভ। সুতরাং ভবানীমন্দিরে কুমারের এই ব্যবহারের জন্য পুত্র এবং পুত্রবধূর উপর কোনরূপ দোষারোপ করিবেন না। যাহাকে একদিন রোগশয্যায় সেবা করিয়াছিলেন, এবং যাহার রোগমুক্তির জন্য তিনি স্ত্রীর সহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির বধকালীন আর্ত্তনাদ ও ছিন্নশির যদি তিনি দেখিতে না পারেন, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? জনসাধারণের প্রতি যুবরাজ এরূপ স্নেহশীল, জাতি-নির্ব্বিশেষে তাঁহার ভালবাসা এরূপ প্রগাঢ়। প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে এরূপ উদ্বুদ্ধ যে, যদি তিনি স্বচক্ষে নরবলি না দেখিতে পারেন, তাহা হইলেও প্রজাদিগের মধ্যে কোন অসন্তোষের কারণ হইতে পারে না। ভবানীপ্রসাদ দেবদ্বিজে ভক্তিমান্। সুতরাং তাঁহার পরোপকারিতা, সৌজন্য ও অমায়িকতায় রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ়তর হইবে। সেইজন্য আমার ইচ্ছা আপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বলিয়া ভবানীপ্রসাদকে কারামুক্ত করিবার আদেশ করুন।”

বৃদ্ধ স্থির হইয়া রাজা অমরনাথের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা কোন কথা কহিলেন না। তখন তিনি মুগ্ধ হইয়া মহৎগুণ-শোভিত পুত্র এবং পুত্রবধূর গুণকীর্ত্তন মনোমধ্যে আলোচনা করিতে-ছিলেন। যখন রাজবয়স্য রাজার নতদৃষ্টি মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়াছিলেন, তখন মন্ত্রী মহাশয় সসম্মানে বলিয়া উঠিলেন—“যুবরাজ যে সদ্গুণসম্পন্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কৌলিক প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রবৃত্তি রাজধর্ম্মের একটা অঙ্গ। কুমারের সেই কার্য্যে ত্রুটি হইয়াছে। যদি বিবিধ গুণালঙ্কৃত যুবরাজ কৌলিক আচার পদ্ধতির প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে কি অধিকতর সুন্দর হয় না? যখন রাজাজ্ঞায় যুবরাজ এবং রাজ্ঞীর পৃথক্ বাসের আদেশ হইয়াছে, তখন আমার অভিমত এই যে, কিছুদিন তাঁহারা তদবস্থায় অবস্থিতি করুন। তাহাতে দেবকার্য্যে এরূপ

অনাস্থা প্রদর্শনের জন্য অনুশোচনা আসিবে এবং তাহার ফলে তাঁহাদের চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটিবে।"

রাজা অমরনাথ এইবার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রিয় বয়স্যের কথা শুনিয়া আমার ক্রোধের কিছু উপশম হইয়াছে। আমি আর পুত্র এবং পুত্রবধূকে এরূপভাবে যাবজ্জীবন রাখিতে চাহি না। তবে কিছুকাল তাহারা এইভাবে থাকিবে। এইভাবে থাকিলে তাহারা বুঝিবে যে, দেবকার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিলে বা ভবানীর পূজায় কোনরূপ অনাস্থা প্রদর্শন করিলে, কিংবা কৌলিক প্রথার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলে তাহারা আমার নিকট সহানুভূতি পাইবে না। এ জ্ঞান তাহাদের মনোমধ্যে জাগ্রত থাকা আবশ্যক। সুতরাং এক বৎসর কাল তাহারা এইভাবে অবস্থান করিবে—ভবানীপ্রসাদ সেই বধ্যব্যক্তির গৃহে আবদ্ধ থাকিবে এবং পুত্রবধূ তাঁহার নিজ গৃহেই একাকিনী থাকিবেন। যদি এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের চিত্ত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আবার রাজপুরী মধ্যে যুবরাজ এবং যুবরাজ্ঞীর মতই থাকিবেন।"

রাজাদেশ শুনিয়া বিষ্ণুদয়ালের মুখ বিমর্ষ হইয়া গেল। যখন সেই কঠোর রাজাজ্ঞা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি মনোমধ্যে একটা নিদারুণ আঘাত অনুভব করিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই যখন মনে হইল তাঁহার কথায় ভবানীপ্রসাদ যাবজ্জীবন কারাবাস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। আর মন্ত্রী—? তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া হৃদয়াকাশে চকিতে অনান্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববৃত্তান্ত

দিল্লীশ্বর আকবরশাহের সময় হইতেই দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে মোগলরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই। নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা ও লাভ জন্য সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। সম্রাট্ সাজাহান দাক্ষিণাত্যে অধিকার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করেন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে এক বিপুল বাহিনী দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং দৌলতাবাদে অবস্থিত হইয়া কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। সাজাহানের চেষ্টায় কার্য্য সিদ্ধি হইল। গোলকণ্ডা রাজ্য মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল, কিন্তু বিজাপুরাধিপতি মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন।

১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরপতি আদিল সাহের সহিত সাজাহানের এক সন্ধি হয়। এই সন্ধি দ্বারা আদিলসাহ অমেদনগর রাজ্যের একটা অংশ আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। গোলকণ্ডা রাজ্য মোগল-সম্রাটের মিত্ররাজ্য স্থিরীকৃত হইলে সম্রাট সাজাহান এই সন্ধিদ্বারা বিজাপুর-পতির সহিত গোলকণ্ডার সুলতানের সকল বিরোধ মিটাইয়া দেন। এই দুই রাজ্যের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইলে উভয়েই সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। গোলকণ্ডার সৈন্যদল উড়িষ্যার দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত অধিকার করিল। যখন এই সমগ্র প্রদেশ গোলকণ্ডা সৈন্যদ্বারা

বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন গণ্ড্রাম-রাজ্যান্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র রাজা স্বীয় রাজ্য ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিয়া কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে সপরিবারে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, রায়পুররাজ্যে গমন করিয়া রাজপুত্রের সহিত কন্যা কল্যাণীর বিবাহ দিবেন এবং এই সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রায়পুরাধিপতির সাহায্যে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবেন।

লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া বিশ্বপতি যে কি ভাবে তাঁহার সাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন তাহা অতি সূক্ষ্মদর্শীরও অবোধগম্য। সসীম মানব-শক্তি বহু আয়াসেও সেই বিশ্বপতির কার্য্যকলাপ স্থির করিতে পারে না। বিশ্বপিতার অশেষ কৃপায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান ও স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। মানুষ কর্ম্ম করিতে পারে, কিন্তু সেই কর্ম্মের ফলাফল তাহার আয়ত্তাধীন নহে। যে কর্ম্মের ফলাফলের উপরে নির্ভর না করিয়া কর্ত্তব্য করিতে পারে, সেই প্রকৃত কর্ম্মী; অদম্য উৎসাহে সেই কর্ম্ম করিতে পারে। কিন্তু যে সততই ফলাফলের উপর দৃষ্টিপাত করে এবং কার্য্যের অনুরূপ ফললাভের আশা রাখে, তাহার শান্তিতে কর্ম্ম করা ঘটিয়া উঠে না। রাজা বীরসিংহ কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাইতেন না বলিয়া মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া যে কর্ম্মের গতিরোধ করিয়া থাকে, এ অভিজ্ঞতা-সত্ত্বেও কার্য্যকালে সে ধারণা তাঁহার মনোমধ্যে স্থান পাইত না। সুতরাং তিনি একরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, রায়পুর রাজ্যে গিয়া কুমার ভবানী-প্রসাদের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতা ও বৈবাহিকের সাহায্যে গোলকুণ্ডার সুলতানকে একবার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিবেন।

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইলে রাজা বীরসিংহ কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য পশ্চিমাভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় তাঁহার

জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পরে তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার সহিত রায়পুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পৈতৃক রাজভবন, সমুদ্র-তীরবর্ত্তী উপবনবাটিকা, কুলদেবতা কমলাপতি, পুত্রসম প্রজামণ্ডলী—সকলই শত্রু কবলিত হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। তিনি কি উদ্দেশ্যে যাইতেছেন এবং কোথায় যাইতেছেন তাহা কাহাকেও বলিলেন না; কিংবা কোন প্রজাকে কোন আশ্বাস দিলেন না। রাজকর্ম্মচারীদিগকে স্ব স্ব ভবনে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আর তাঁহাদের সহিত কখনও দেখা হইবে কি না এরূপ কোন কথা বলিলেন না। যখন বীরসিংহ অন্তঃপুরস্থ সকলের নিকট বিদায় লইয়া রায়পুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, তখন কতিপয় প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রাজা বারংবার নিষেধ করিলে অনেকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু কোষাধ্যক্ষ ও একজন অমাত্য কোন নিষেধ মানিলেন না। রাজা বীরসিংহের এই দুইজন ভক্ত রাজ-সান্নিধ্য না ছাড়িয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

যখন রাজা সাধারণ প্রজার বেশে সজ্জিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার সহিত নগরের প্রান্তভাগ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন সুলতান-সৈন্য রাজ্যের স্থানে স্থানে অত্যাচার করিতেছিল। রাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল বলিয়া, বিজেতা সৈন্যগণ তখন অবাধে লুণ্ঠন ও প্রজার প্রতি নানাবিধ উৎপীড়ন করিতেছিল। উচ্চপদস্থ সৈনিকপুরুষেরা রাজপথে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজামধ্যে হত্যা বা অন্যবিধ মহা অত্যাচার নিবারিত করিতেছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কতিপয় রণনিপুণ বিশ্বস্ত যোদ্ধার সহিত বেগবান অশ্ব রাত্রিকালে নগরের বাহিরে প্রেরিত হইয়াছিল। যখন রাজপরিবার পদব্রজে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুভক্ত অমাত্য ও কোষাধ্যক্ষ

বাহক-বেশে দুইটি বেতস পেটিকা মস্তকে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। তাঁহাদের বস্ত্রাবরণের মধ্যে বহুমূল্য সুবর্ণরত্নাদি এবং পেটিকামধ্যে রাজপরিবারের আহারোপযোগী খাদ্যসামগ্রী ছিল। ঘোর নিশীথকালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়া রাত্রিশেষে প্রান্তরমধ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন, অশ্ব প্রস্তুত রহিয়াছে। তখন উষার সেই অস্পষ্ট আলোকে জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সকলে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে অশ্বারোহণ করিলেন। কন্যা কল্যাণী তথায় কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ভূমিষ্ঠ হইয়া কুলদেবতাকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন—"পিতার উদ্দেশ্য যেন সাধিত হয়। আমার শ্বশুরের সাহায্যে তিনি যেন আপন রাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন এবং তখন যেন পতির সহিত আগমন করিয়া এই রাজ্যে পিতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই।" রুদ্ধশ্বাস কল্যাণীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে সশব্দে বাহির হইল এবং অশ্রুকণা পত্রান্তস্খলিত শিশিরবিন্দুর মত ক্ষরিত হইয়া তাঁহার কপোলে পড়িল। তখন তথায় অধিক বিলম্ব না করিয়া কল্যাণী অশ্বারোহণে দ্রুত গমন করিলেন এবং অচিরে পিতা মাতার মধ্যবর্ত্তিনী হইলেন। অমাত্য মথুরাসিংহ ও কোষাধ্যক্ষ পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বারোহণে যাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্দ্দিষ্ট স্থানে অশ্বারোহণে গমন করিয়া রাজা বীরসিংহ দেখিলেন, সৈন্যগণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তখন তাহারা সমবেত হইয়া রায়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অশ্বারোহণে গমন করিয়া যখন কিঞ্চিৎ নিরাপদ স্থানে উপনীত হইলেন, তখন একটি ক্ষুদ্র

স্রোতস্বিনী-তীরে বিশ্রামের জন্য সকলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। মানসিক অশান্তি ও অশ্বারোহণজনিত পরিশ্রমের জন্য রাজা ক্লান্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অশ্বচালনায় অনভ্যস্তা রাণী ও কল্যাণীব কষ্ট স্মরণ হওয়ায় অধিকতর কাতর হইয়া পড়িলেন। রাণী ও কন্যা কল্যাণী অশ্বারোহণ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু একসঙ্গে এত পথবাহন তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও করেন নাই। সময়ে সময়ে সমুদ্র-তীরে উপবন-বাটিকায় গমন করিয়া অভ্যাসের জন্য তাঁহারা তথায় অশ্বারোহণ করিতেন। সেই কুসুম[illegible]-পরিব্যাপ্ত মনোহর উদ্যানপথে পুত্র, কন্যা ও স্বামীর সহিত অশ্বারোহণ বস্তুতই সুখকর। কিন্তু রাজ্য অপহৃত হওয়ায় সুখের আলয় ও সকল প্রকার প্রিয় বস্তু ত্যাগ করিয়া প্রাণের আশঙ্কা করিতে করিতে দ্রুতবেগে এত পথ অতিবাহন করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা অনুভব করা যা[illegible] প্রকাশ করা যায় না। সেই দুঃসহ ক্লেশ রাণী ও কল্যাণীর শরীর [illegible] বিধ্বস্ত করিতেছিল; কিন্তু পাছে রাজা তাহা জানিতে পারিয়া মর্ম্মপীড়িত হয়েন, সেই ভয়ে সকল ক্লেশ গোপন করিয়া তাঁহারা রাজার পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের কষ্ট হইতেছিল সত্য, কিন্তু এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকের যত কষ্ট হওয়া সম্ভব, তত কষ্ট তাঁহারা অনুভব করেন নাই। স্বামী যে শত্রুহস্তে নিপতিত না হইয়া রাজ্যোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে যাইতেছেন, এ চিন্তায় রাণী ও কল্যাণী এত সুখবোধ করিতেছিলেন যে, পথবাহন-কষ্ট তাঁহাদেব কোনরূপে অভিভূত করিতে পারে নাই। স্বামীর পার্শ্বে অশ্বারোহণ করিয়া যাইতেছেন মনে হওয়ায় রাণীর অন্তর-মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভূতি হইতেছিল। কিন্তু কন্যা কল্যাণী অন্য এক কারণের জন্য অনন্যসাধারণ তৃপ্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি মনে মনে বুঝিতেছিলেন যে, রায়পুরে উপনীত হইলেই তাঁহাকে পরহস্তে যাইতে হইবে এবং তখন পিতামাতার সাহচর্য্য দুর্লভ হইয়া

উঠিবে। সুতরাং পিতামাতার নিকট অবস্থিতি তাঁহার নিকট অতিশয় তৃপ্তিজনক বোধ হইতেছিল।

সৈন্যগণ একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতল পরিষ্কৃত করিয়া পর্ণশয্যা রচনা করিয়া দিলে রাজা, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার সহিত তথায় উপবেশন করিলেন। তখন সকলে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সাজ-সজ্জা ও বল্গা উন্মোচন করিয়া প্রান্তর-মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের জন্য অশ্বসকল বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। অশ্বের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে দুই এক জন সৈন্য দেখিল, দূরে গরু চরিতেছে। নিশ্চয় নিকটে কোন গ্রাম আছে, নতুবা গরু কোথা হইতে আসিতে পারে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আসিয়া, তাহারা সেই সংবাদ রাজসমীপে জ্ঞাপন করিল। গ্রামের সন্নিহিত স্থান নিরাপদ হইবে আশা করিয়া তখন তাঁহারা সেই স্থানেই অবশিষ্ট দিন যাপন করা উচিত স্থির করিলেন। ক্ষণিক বিশ্রামের পর অমাত্য মথুরাসিংহ আহার্য্য প্রস্তুতের সুবিধা দেখিতে লাগিলেন এবং কোষাধ্যক্ষ একজন সৈনিককে সঙ্গে লইয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজ-পরিবারের চারিদিন চলিতে পারিত এরূপ সামগ্রী পেটিকা-মধ্যে ছিল। আসিবার সময় মথুরাসিংহ তন্মধ্যে একটি রন্ধন-পাত্র আনিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এখন কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। শীঘ্রই শুষ্ক কাষ্ঠ মিলিল। সব প্রস্তুত হইলে যখন তিনি কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ করিলেন, তখন কল্যাণী আসিয়া রন্ধন করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। মথুরাসিংহ প্রথমে তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং পরে তাঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নিষেধ করিলেন। কিন্তু কল্যাণী মিষ্টবাক্যে অমাত্যকে তুষ্ট করিয়া রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। যাহা কর্ত্তব্য বুঝিতেন বা যে কর্ম্মে সংযত এবং সরলচিত্তে আনন্দ

অনুভব করিতেন, তিনি সে কর্ম্ম করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। সেইজন্যই কল্যাণী এরূপ পরিশ্রম সত্ত্বেও আজ রন্ধন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

আহারান্তে বিশ্রাম করিতে করিতে সকলেই দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতল হইতে অপসারিত হইতেছিল। যখন সান্ধ্য-রবির শেষ কিরণ-মালা বৃক্ষশিরে স্বর্ণ-কিরীট পরাইয়া দিতেছিল, যখন পূর্ব্ব-গগনে প্রদোষ-তিমির আপন রাজ্য-বিস্তার করিবার উদ্যোগ করিতেছিল দেখিয়া পক্ষিগণ আপন আপন আবাসে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উড়িয়া আসিয়া বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া কলরব করিতে লাগিল, তখন সৈন্যগণ আপন আপন অশ্ব অনুসন্ধান করিয়া সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিল। রাজ-পরিবারের অশ্ব সকল তাঁহাদের বিশ্রামস্থানের নিকটেই রক্ষিত হইল। রাত্রিশেষে আবার যাত্রা করিতে হইবে বলিয়া সকল জিনিষই প্রস্তুত রাখা হইল।

ক্রমশঃ রাত্রি হইয়া আসিল। সমগ্র বনস্থলী ঘোর অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইল, তখন কোষাধ্যক্ষ একটি মশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাজার সন্নিকটস্থ অন্ধকাররাশি দূর করিলেন, কিন্তু অদূরে অন্ধকাররাশি যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিল। কোথাও কোন বস্তুর অবয়ব লক্ষ্য হইল না, মনে হইল যেন তাঁহারা ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। রাজা বীরসিংহ পর্ণ-শয্যায় শয়ন করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন, এবং কল্যাণী শয্যাপার্শ্বে নিস্পন্দভাবে বসিয়াছিলেন। অপর সকলেই মধ্যে মধ্যে কথা কহিয়া সেই নিস্তব্ধ-বনস্থলী মুখরিত করিতে ও স্ব স্ব হৃদয় চিন্তাশূন্য করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

সহসা সকলেই স্থির হইলেন। অকস্মাৎ যেন সকলের মনে একই চিন্তা উদিত হইল। সকলেই যেন কোন এক অতীত চিন্তায় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। এমন সময় রাজা এক সুদীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ডাকিলেন—কল্যাণী।

কল্যাণী। বাবা।

রাজা।—কালও সন্ধ্যার সময় আমরা কমলাপতির আরতির শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু আজ আর সে শব্দ শুনিবার কোন উপায় নাই। ভাগ্যে আর কখনও কি সে শব্দ শুনিবার, সে আরতি দেখিবার সুযোগ ঘটিবে না?

কল্যাণী।—আপনি যখন সেই দেবতার প্রীতির জন্যই অনর্থক রক্তপাত হইতে বিরত থাকিয়া বিপুল আয়োজনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তাঁহারই প্রসাদে নিশ্চয় আপনার আশা পূর্ণ হইবে।

রাজা।—সত্য; দেবতার প্রীতির জন্যই আমি রাজ্য-রক্ষার উপস্থিত কোন চেষ্টা করিলাম না। কমলাপতির রাজ্যে আমার জীবন-সময়ে কখনও বৃথা প্রাণীহত্যা দেখি নাই এবং প্রজারাও করে নাই। পাছে সেই রাজ্যে এখন নরহত্যা হয় সেই ভয়ে উপস্থিত কোন চেষ্টা করি নাই। সুলতানের সৈন্যসংখ্যা ও তাঁহার আয়োজন দেখিয়া ভাবিলাম, আমার এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সম্মুখ-সমরে সুলতানের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত করিতে পারিব না। আমাকে পরাজিত হইতেই হইবে। সুতরাং নিরর্থক এত লোকক্ষয় না করিয়া সুলতানের সৈন্যকে অবাধে রাজ্যাধিকার প্রদান করিলাম। যাহাতে কোনরূপে লোকক্ষয় না হয় সেইজন্য প্রজামধ্যে আদেশ প্রচার করিলাম, যে, কেহ সুলতান-সৈন্যের গতিরোধ করিতে বা তাহাদের লুণ্ঠনাদি কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না। আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। রাজ্যের স্থানে স্থানে সামান্য অত্যাচার হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভগবানের কৃপায় কোথাও হত্যা ঘটে নাই।

কল্যাণী।—প্রজামধ্যে কাহারও যে প্রাণের হানি হয় নাই ইহা শুনিয়া আমারও আনন্দ হইল; কিন্তু শত্রুসৈন্য রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া ও প্রজা-

দিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া বিপুল অর্থ লইয়াছে। যখন ভবিষ্যৎ আয়োজনের সময় অর্থের প্রয়োজন হইবে, তখন অর্থ কোথা হইতে পাওয়া যাইবে?

রাজা।—সে বিষয়েও আমার কোন চিন্তা নাই। আমার এখনও যথেষ্ট অর্থ আছে। রাজকোষে আমার যে অর্থ ছিল, তাহার প্রায় শতগুণ অর্থ ও মণি-মাণিক্যাদি এক নিভৃতস্থানে আছে। শত্রুসৈন্য তাহার কোন সন্ধানই পাইবে না। প্রপিতামহের সময় হইতে এইস্থানে অর্থ-সঞ্চিত করা হইয়াছে এবং কখনও এক কপর্দ্দক তাহা হইতে ব্যয় করা হয় নাই। আমি ভিন্ন এ গুপ্তধনেব সন্ধান কেহ জানে না।

রাজ্যোদ্ধারের আশায় উৎসাহিত হইয়া রাজা বীরসিংহ শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর ঈষৎ ভগ্নস্বরে বলিলেন, আর যদি সে অর্থ লুণ্ঠিত হয় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? রাজ্যের পুনরুদ্ধার যদি অসম্ভব হয় তাহা হইলেই বা কি হইবে? ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, হিন্দুস্থানে আর হিন্দুর প্রাধান্য থাকিবে না। নিজেদের দোষেই আমরা সেই প্রাধান্য হারাইয়াছি এবং যাহা আছে তাহাও হারাইতেছি। উত্তরভারত বহুকাল হইতে মোগলের পদানত হইয়াছে; এবার দাক্ষিণাত্যও যাইবে। দক্ষিণভারত এত অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে যে, কোন রাজাই আপনার সমস্ত সম্বল লইয়া মোগলের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে এক সপ্তাহ কাল দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবেই। কমলাপতির এ রাজ্য আমি কখনও নিজের ভোগবিলাসের সামগ্রী বলিয়া মনে করি নাই। আমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া তাহারই ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি। জীবনে কতবার অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কাহারও কোন সহানুভূতি পাই নাই।

আমার আদর্শ কেহই গ্রহণ করেন নাই। যে দেশের প্রজা হইতে রাজা পর্য্যন্ত স্বদেশের কল্যাণে ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র পার্থক্য ভুলিতে পারে না, সে দেশবাসীর দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। দেশের সুখ-সমৃদ্ধির আশা বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন তোমাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পারিলেই আমার কর্ত্তব্যের শেষ হয়। রায়পুরাধিপতি আমার বন্ধু। তাঁহার পুত্র ভবানী-প্রসাদ অতি সৎ ও শিক্ষিত। দয়াময় আমার এ অভিলাষ নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন।

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি অনেক হইল। তখন সকলেই নিদ্রিত হইয়াছিলেন। রাজা বীরসিংহ পর্ণশয্যায় শয়ন করিলে, কল্যাণী মাতার পার্শ্বে গিয়া শয়ন করিলেন। সৈন্যগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রিশেষে সকলে অশ্বারোহণে আবার যাত্রা করিলেন। যে ভাবে তাঁহারা যাইতেছিলেন, তাহাতে চতুর্থ দিনে রায়পুরে পৌঁছিতে পারিবেন বলিয়া সকলের মনে হইল।

দ্বিতীয় দিনও নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। কিন্তু তৃতীয়দিনে অকস্মাৎ এক বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহানদীর তীর দিয়া রাজা বীরসিংহ সসৈন্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় বনমধ্যে এক সৈন্য-শিবির লক্ষিত হইল। এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, কিয়দ্দূর হইতেও রাজা তাহা দেখিতে পান নাই। যখন তাঁহারা একেবারে সেই সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন, তখন দেখিলেন, এ শিবির মোগল-সৈন্যের।

বিজাপুর এবং গোলকণ্ডার সহিত মোগলদিগের সন্ধি সংস্থাপিত হইলে

সম্রাট্ সাজাহান তাঁহার পুত্র ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া সসৈন্যে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, এই মোগলসৈন্যের এক বিভাগের সহিত রাজা বীরসিংহের সাক্ষাৎ হয়। সশস্ত্র হিন্দু-সৈন্য দেখিবামাত্রই মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ আপন সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সহস্রাধিক মোগলসৈন্য হিন্দুসৈন্যের উপর নিপতিত হইল এবং রাজা বীরসিংহকে একটী কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণে মুষ্টিমেয় হিন্দুসৈন্য তথায় প্রাণত্যাগ করিল। আত্মরক্ষা করিতে করিতে রাজা এবং রাণী উভয়েই রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। যখন কল্যাণী দেখিলেন যে, পিতা ও মাতা যুদ্ধে হত হইলেন, তখন তিনি সেস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। বেগবান্ অশ্বকে কষাঘাত করিয়া তিনি সেই সৈন্য-ব্যূহ-মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং তীরবেগে পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন। তাহা দেখিয়া চারিজন অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। এদিকে অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুসৈন্যকে সমূলে ধ্বংস করিয়া মোগল সেনাপতি সৈন্য সকলকে সমবেত করিবার জন্য সঙ্কেতধ্বনি করিলেন। সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকল সৈন্যই শিবিরাভিমুখে গমন করিল। যে চারিজন সৈন্য কল্যাণীকে অনুসরণ করিতেছিল, তাহারাই কেবল প্রত্যাবর্ত্তন করিল না।

শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া কল্যাণী যখন উন্মুক্ত-প্রান্তরে আসিলেন, তখন দেখিলেন, চারিজন সৈন্য তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। তিনি অশিথিলী-কৃত-বেগে অশ্বচালিত করিয়া মহানদীর তীর দিয়া ধাবিত হইতে লাগিলেন। এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন আর স্বীয় প্রাণ ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অশ্বকে কষাঘাত করিয়া অতি দ্রুত অশ্বচালনা করেন। এইভাবে অনেকক্ষণ অশ্বচালনার পরে তিনি দেখিলেন, একটীমাত্র সৈনিক তাঁহার

পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে। অশ্বের বেগ সংযত না করিয়াই কল্যাণী পূর্ব্বের ন্যায় যাইতেছিলেন; কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয় আর কত সহ্য করিতে পারে। রণক্ষেত্রে পিতামাতার মৃত্যু দেখিয়া কল্যাণী একপ্রকার জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুই দিন অর্দ্ধাশন ও অত্যধিক পরিশ্রমের পরে তৃতীয় দিবসে এইরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ—কল্যাণীর কোমল-হৃদয় আর সহ্য করিতে পারিল না। ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠেই তাঁহার চৈতন্যলোপ হইল। চৈতন্য লুপ্ত হইবামাত্রই অশ্বের বল্গা হাত হইতে পড়িয়া গেল এবং অশ্বও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী ভূপতিতা হইলেন।

কোন বিষয়ের আতিশয্য মানব-হৃদয় সহ্য করিতে পারে না। যতক্ষণ কোন বিষয় একটা সীমার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ মানুষ তাহা সহ্য করিতে পারে। কিন্তু সীমার বহির্ভূত হইলে মানব-হৃদয় আর তাহা সহ্য করিতে পারে না। তখন শান্তিদায়িনী মূর্চ্ছা আসিয়া তাহাকে আপন ক্রোড়ে স্থান-দান করে। যতক্ষণ মানবদেহ মূর্চ্ছার অঙ্কশায়ী হইয়া থাকে, ততক্ষণ তাহার আর কোন চিন্তা থাকে না—ক্লিষ্টের আর ক্লেশ থাকে না, পতি-বিরহিতা দুঃসহ বিয়োগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়, ভয়ার্ত্ত ভীতিশূন্য হয়। কল্যাণীরও তাহাই হইল। সংজ্ঞা লোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সকল ভয় দূরীভূত হইল। কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, কাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার এত চেষ্টা—এ সকল চিন্তাই এখন কল্যাণীর ব্যথিত অন্তঃকরণ হইতে অন্তর্হিত হইল। স্বর্গবিচ্যুতা দেবীর ন্যায় তিনি ভূতলে অবলুণ্ঠিতা হইয়া রহিলেন এবং তাঁহার অশ্ব স্থির ভাবে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনেক শুশ্রূষার পর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে কল্যাণী অনুভব করিলেন—কাহার কোলে মস্তক রক্ষা করিয়া তিনি শয়ন করিয়া আছেন; আর যে ব্যক্তির ক্রোড়ে তিনি শয়ন করিয়া আছেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আর্দ্র বস্ত্র তাঁহার চক্ষে ও মস্তকে এক হস্তদ্বারা রাখিতেছেন এবং অপর হস্তে অবিশ্রান্তভাবে উত্তরীয় দিয়া ব্যজন করিতেছেন। কল্যাণী তাঁহার সেবায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিতে সাহস করিলেন না। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়াই একাগ্রচিত্তে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, যেন অচিরেই তাঁহার আবার মূর্চ্ছা হয় এবং সে মূর্চ্ছার যেন আর অবসান না হয়।

যখন কল্যাণীর বিবর্ণ-মুখে রক্ত-সঞ্চার হইল, যখন তাঁহার চক্ষুপল্লব ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল, তখন শুশ্রূষাকারী তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া ডাকিলেন, "কল্যাণি!"।

সে স্বর কল্যাণীর কর্ণে পরিচিত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তথাপি তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিলেন। কল্যাণীর মনে হইতে লাগিল—একি স্বপ্ন! তিনি ত স্বচক্ষেই দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার সকল আত্মীয়স্বজনই মোগলহস্তে নিহত হইয়াছিলেন; তবে এ আত্মীয় করস্পর্শ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় আবার শব্দ শুনিলেন—"কল্যাণি"।

সে স্বর তাঁহার কর্ণে অতি স্নেহপূর্ণ বলিয়া মনে হইল। সে করস্পর্শ তাঁহার চিরানুভূত বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার মনে হইল—যে কোমল

কর শৈশবাবস্থা হইতে তাঁহার সেবা করিয়া আসিয়াছে, যে অঙ্ক জীবনের প্রথমাবস্থা হইতে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে না দিয়া অতি আদরে তাঁহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে, যে স্নেহপ্রবণ হৃদয় সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার ভ্রাতাকে অকাতরে ভালবাসিয়াছে—সেই মহাত্মাই এই দুর্দ্দিনে তাঁহার সেবা করিতেছেন। কল্যাণীর দুই নয়ন দিয়া, দরদর-ধারে অশ্রু বিগলিত হইল। ইহা দেখিয়া সেই পুরুষ তাঁহার অশ্রু মুছিয়া স্নেহভরে আবার ডাকিলেন—"কল্যাণি"।

ধীরে ধীরে কল্যাণী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রথমে ভীতা এবং পরক্ষণেই আনন্দিতা হইলেন। তিনি দেখিলেন, মোগল-সৈনিকের উষ্ণীষ ও কুর্ত্তাপরিহিত এক পুরুষের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া আছেন। প্রথমেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন এবং পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত কবিলেন। কিন্তু পরক্ষণে চোখ চাহিয়া সেই পুরুষের স্নেহপূর্ণ অতি পরিচিত মুখখানি দেখিতে পাইলেন। তখন কল্যাণী চিনিতে পারিলেন। তাঁহার সেই মূর্চ্ছা-বিবর্ণ শোকক্লিষ্ট, ভীতিপূর্ণ-মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন—অমাত্য মথুরাসিংহ তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া মাতৃস্নেহে শুশ্রূষা করিতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কল্যাণী উঠিয়া বসিলেন। মথুরাসিংহ বলিলেন, "এখনও আমরা মোগল-শিবিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে রহিয়াছি। সুতরাং এস্থান একেবারে নিরাপদ নহে। অধিকন্তু আমি যে উপায়ে তোমায় রক্ষা করিয়াছি, তজ্জন্য আর এখানে অধিককাল অবস্থান করা উচিত নহে।" তিনি আরও বলিলেন, "এ স্থান আমার পরিচিত; আমি পূর্ব্বে অনেকবার

এস্থান দিয়া রায়পুর-রাজ্যে গিয়াছি। তথায় আমার এক পরিচিত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আছেন। তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিলে আমরা উপস্থিত নিরাপদ হইব। যতদূর মনে হইতেছে, আর এক প্রহর কাল অশ্বারোহণ করিয়া যাইতে পারিলেই রাজধানী রায়পুরে পৌঁছিতে পারিব। আমরা একটি গ্রামের নিকটে আসিয়াছি; সেইস্থানে তোমাকে কিছু আহার করাইব এবং পরে উভয়ে ধীরে ধীরে রায়পুর উদ্দেশে যাত্রা করিব।"

এ স্থান নিরাপদ্ নহে শুনিয়া কল্যাণী বলিলেন, "আমি সুস্থ হইয়াছি। এখন আবার অশ্বারোহণে যাইতে পারিব। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া এখনই যাত্রা করুন।"

প্রাণনাশ ও ধর্ম্মনাশের ভয়েই কল্যাণী এরূপ কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার শরীর তখন এত দুর্ব্বল হইয়াছিল এবং মূর্চ্ছিত অবস্থায় অশ্ব হইতে পতিত হওয়ায় অঙ্গের স্থানে স্থানে এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে, শয়ন করিয়াও তিনি যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এখানে শয়ন করিয়া থাকিলে পুনর্ব্বার কোন বিপদ আসিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি উত্থিতা হইলেন এবং ধীরে ধীরে গমন করিয়া অশ্বের বল্গা ধরিলেন। মথুরাসিংহের সাহায্যে অশ্বারোহণ করিয়া কল্যাণী তাঁহারই পার্শ্বে ধীরে ধীরে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন।

অচিরেই তাঁহারা একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র—বনবেষ্টিত কতিপয় কুটির মাত্র। মথুরাসিংহ কল্যাণীকে লইয়া একটি গৃহস্থের বাটিতে গমন করিলেন। গৃহস্থের প্রাঙ্গণে দুইটী বৎস-সমেত গাভী দর্শন করিয়াই তিনি তথায় আসিয়াছিলেন। একটি মহুয়া বৃক্ষতলে কল্যাণীকে অবতরণ করাইয়া বিশ্রাম করিতে বলিয়া স্বয়ং গৃহস্বামীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গৃহস্বামী নিকটেই ছিল; প্রাঙ্গণে যোদ্ধবেশধারী অশ্বারোহী দর্শন করিয়া ক্ষিপ্রপদে সেইস্থানে উপস্থিত হইল। মথুরাসিংহ স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলে, গৃহস্থ আপন পুত্রকে হাত মুখ ধুইবার জল আনিতে বলিয়া শীঘ্র দুধ দুহিবার ব্যবস্থা করিল। জল আসিলে মথুরাসিংহ কল্যাণীর নিকট গিয়া তাঁহার অঙ্গের ক্ষতস্থান সকল উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মূর্চ্ছিত অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হওয়ায় তাঁহার হাতে এবং পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল। সেই সকল স্থান আর্দ্রবসনে বাঁধিয়া দিয়া মথুরাসিংহ তাঁহাকে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতে বলিলেন। শীতল জল পান করায় তাঁহার অনেকটা তৃপ্তি হইল। তখন তিনি সেই বৃক্ষমূলে মস্তক রাখিয়া তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতলে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে মথুরাসিংহ অশ্বকে জলপানাদি করাইয়া গৃহস্বামীর নিকট হইতে কিছু দুগ্ধ সংগ্রহান্তে কল্যাণীর নিকট আসিলেন। তখন কল্যাণী স্থির হইয়া শুইয়া নিজেদের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিলেন। মথুরাসিংহ পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, কিন্তু তাহাতেও যেন তাঁহার চেতনা হইল না। তখন মথুরাসিংহ তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "এখন আর আমাদের কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। আমরা রায়পুর-রাজ্যাধিকারের মধ্যে আসিয়াছি। এখান হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছিতে পারিব।"

কল্যাণীর চিত্ত তখন আত্মচিন্তায় এরূপ আচ্ছন্ন ছিল যে, মথুরাসিংহের কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। আজ মধ্যাহ্নে যে অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা তাঁহার সম্মুখে ঘটিল, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। মাতা-পিতা আত্মরক্ষা করিতে করিতে যেভাবে মোগল-তরবারির আঘাতে ভূতলশায়ী হইলেন, সেই দৃশ্য তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছিল। কল্যাণী মানস-নেত্রে একমনে সেই দৃশ্য দেখিতেছিলেন এবং নয়নজলে মৃত্তিকা অভিষিক্ত

করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি উত্থিত হইয়া বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন এবং পিতার অমাত্যকে জগতে একমাত্র আত্মীয় মনে করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কাকা, আপনিও একটু দুধ খাইলেন না কেন?"

মথুরাসিংহ প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া কল্যাণীকে পুনরায় দুগ্ধ পান করাইলেন এবং অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

এ স্থান কিছু নিরাপদ্ বিবেচনা করিয়া দিবাবসান পর্য্যন্ত কল্যাণীকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া মথুরাসিংহ গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য উঠিতেছিলেন এমন সময় কল্যাণী তাঁহাকে ডাকিলেন। কল্যাণীর তখন বিশ্রাম করিবার অবসর ছিল না; দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। চঞ্চলচিত্ত কোনরূপেই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছিল না এবং অবিরতধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছিল। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে সহসা তিনি বলিলেন, "কেন যে ভগবান্ আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইলেন, জানি না। যদি সে মূর্চ্ছা আমায় মহানিদ্রাভিভূত করিত, তাহা হইলে আমার সুখের সীমা থাকিত না।"

শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকা, আপনি কি করিয়া মোগল-হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন?"

মথুরাসিংহ।—স্বয়ং ভগবানের অনুগ্রহেই আজ তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। যখন মোগল-সৈন্য পৈশাচিকভাবে আমাদের আক্রমণ করিল, তখন আমি একজন সৈনিকের নিকট হইতে একটি বর্শা লইয়া তোমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। অন্য সকলেই আত্মরক্ষায় সক্ষম, তাঁহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মোগল-সৈন্য প্রথমে আমাদের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল এবং রাজা ও রাণীর দিকে ধাবিত হইল। তখন পর্য্যন্ত তোমার

প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু যখন রাজা ও রাণী আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তখন একটি সৈন্য তোমার প্রতি ধাবিত হইল। যেমন সে উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে তোমার নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, অমনি আমি একটু অগ্রসর হইয়া বর্শাদ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলাম। তাহাকে আর অগ্রসর হইতে হইল না। যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি আক্রমণ করিতে আসিতেছিল, তখন তোমার সম্মুখীন স্থানসমূহ শত্রুশূন্য দেখিয়া তোমার অশ্বের পশ্চাতে বলপূর্ব্বক কশাঘাত করিলাম। অশ্বও তীরবেগে রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ইহা দেখিয়া চারিজন সৈনিক তোমার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তুমিও তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণে অশ্ব চালাইতে আরম্ভ করিলে।

"এদিকে যে মোগল তোমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল, আমি তাহাকে বর্শাদ্বারা বিদ্ধ করিলাম। কিন্তু এত জোরে বর্শা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম যে, তাহার বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমিও সেই সঙ্গে ভূপতিত হইলাম। বর্শা মোগলের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার হস্ত হইতে তরবারি লইয়া এক লম্ফে অশ্বারোহণ করিলাম এবং অতি বেগে তোমার অনুসরণকারীদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলাম। এই সেই তরবারি, এখনও হস্তে রহিয়াছে। পথিমধ্যে দেখিলাম, একজন সৈনিক ঈষৎ পশ্চাতে পড়িয়াছে। অমনি অতি বেগে ধাবিত হইয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিলাম। সৈনিক পতিত হইলে অতি ক্ষিপ্রহস্তে তাহার অঙ্গাবরণ ও উষ্ণীষ খুলিয়া স্বয়ং পরিধান করিলাম। পুনরায় অশ্বারোহণে সেস্থান হইতে নির্গত হইয়াছি, এমন সময় সৈন্য সমবেত করিবার সঙ্কেতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। বেগে ধাবিত হইয়া যখন অবশিষ্ট তিনজন অনুসরণকারীর দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইলাম, তখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ নিরস্ত হইবার

সঙ্কেত করিলাম। বেগ সংযত করিলে তাহারাও মোগল-সেনাপতির তূর্য্যধ্বনি শুনিতে পাইল এবং আমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া তাহারাও ফিরিতে বাধ্য হইল।

তখন আমি পথ ছাড়িয়া বনান্তরাল দিয়া পুনর্ব্বার অশ্বচালনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, তখনও তুমি অতি বেগে ধাবিত হইতেছ। আমি অনেকবার হাত তুলিয়া তোমায় থামিতে বলিলাম, কিন্তু তুমি আমায় মোগল-সৈন্য মনে করিয়া এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছিলে ও বেগে ধাবিত হইতেছিলে। হঠাৎ দেখিলাম, তুমি অশ্ব হইতে পতিত হইলে। তখন অতি ক্ষিপ্রবেগে তোমার নিকট আসিয়া আমি তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। তারপর নদী হইতে জল আনিয়া তোমার ক্ষতস্থানে ছিটাইয়া দিয়া সংজ্ঞা-লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

"অনতিবিলম্বেই তোমার চৈতন্য হইল। কিন্তু তখনও তুমি আমাকে মোগল-সৈনিক মনে করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলে। যখন তোমায় 'কল্যাণী' বলিয়া বার বার ডাকিলাম, তখন তুমি অতি ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিলে।"

মথুরাসিংহ কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় বলিলেন—"কল্যাণী, অতি দরিদ্রাবস্থায় আমি তোমার পিতার নিকট আসিয়াছিলাম। তোমারই পিতা দয়া-পরবশ হইয়া আমায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে আমি প্রধান অমাত্যের পদে উন্নীত হইয়াছিলাম। তোমার পিতৃ-অন্নে আমি প্রতিপালিত হইয়াছি। অসংখ্য উপায়ে তিনি আমার উপকার করিয়াছিলেন। আজ তোমাকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আমার প্রভুর উদ্দেশে কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিয়াছি.; কিন্তু কর্ত্তব্যের সমস্তই এখনও বাকী রহিয়াছে।"

মথুরাসিংহ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপরে আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—সন্ধ্যা সমাগতা। পশ্চিমদিকে আকাশ-গাত্রে তখনও অস্তগত-সূর্য্যের ঈষৎ রক্তিম আভা দেখা যাইতেছিল। কিন্তু অচিরেই সে রশ্মি অন্তর্হিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, আর এখানে অপেক্ষা করা হইবে না। এই সময় যাত্রা করিয়া ধীরে ধীরে যাইলেও রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে রায়পুর নগরে পৌঁছিতে পারিব।

আকাশে দুই একটি নক্ষত্র উঠিল এবং আকাশ-প্রান্তে ক্ষীণ চন্দ্রমা অতি মৃদু কিরণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া মথুরাসিংহ মোগল-সৈনিকের পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ ত্যাগ করিলেন এবং কল্যাণীকে লইয়া রায়পুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। গৃহস্থের প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিবার সময় গৃহস্বামীর শিষ্টাচারের জন্য তাহার হস্তে একটি সুবর্ণমুদ্রা অর্পণ করিয়া মথুরাসিংহ সেস্থান হইতে বহির্গত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রাম ত্যাগ করিবার পর প্রান্তর-মধ্যস্থ পথে অতি অল্পক্ষণ বাহন করিয়া মথুরাসিংহ নদীতীরস্থ রাজপথ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে নদী-সৈকত ও নদী-বক্ষ এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। শুভ্র সৈকত-মধ্যে ঈষৎ স্থূল বালুকা-কণা হইতে চন্দ্ররশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায় তটভূমি ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। অভ্রচূর্ণখচিত রঞ্জিত-বসন দীপালোকে যেরূপ ঝিক্‌মিক্ করে, সৈকতগাত্র তেমনই ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। কিন্তু নদীবক্ষের শোভা আরও নয়ন-তৃপ্তিকর হইয়াছিল। স্বচ্ছ সলিলের প্রতি উর্ম্মিমালা হইতে চন্দ্ররশ্মি প্রতিঘাত হইয়া পবনান্দোলিত

সহস্র সহস্র দীপশিখার মত দেখাইতেছিল। অথবা মণিমুক্তাদি-খচিত নববধূর অঙ্গাভরণ উজ্জ্বল দীপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সূক্ষ্ম ওড়নার ভিতর দিয়া যেরূপ সুন্দর দেখায়, আজ চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত করিয়া নদীবক্ষ তেমনই সুন্দর দেখাইতেছিল। মথুরাসিংহ প্রাণ ভরিয়া সে সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন। তিনি এরূপ সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে অনেক-বার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ সন্ধ্যাকালে এ দৃশ্য তাঁহার অন্তরে যে আনন্দ-সঞ্চার করিয়াছিল, পূর্ব্বে সেরূপ কখনও করে নাই। এ আনন্দের অনুভূতি বহিঃপ্রকৃতির শোভা হইতে হয় নাই; ইহা তাঁহার অন্তঃসৌন্দর্য্যের বিকাশ মাত্র। সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে এক অপ্রকাশনীয় আনন্দ পাওয়া যায়। কার্য্যকালে যে ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা এই আনন্দের সময় অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, প্রায় ধারণার মধ্যেই আসে না। সৎকর্ম্ম করিয়া এই আনন্দের আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে, সে কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই স্বার্থপূর্ণ কঠোর পৃথিবীতে তখন কর্ম্মই প্রকৃত সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মভূমি এই পৃথিবীর সেই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আজ মথুরাসিংহ জগৎকে কর্ম্মময় মনে করিতে লাগিলেন।

কল্যাণীকে লইয়া মথুরাসিংহ ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন। রাজপথে মধ্যে মধ্যে দুই একটি লোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু উন্মুক্ত কৃপাণধারী হিন্দু সৈনিককে কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে তাঁহারা রাজধানী রায়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাত্রি অধিক হয় নাই। সুতরাং রাজপথে কোথাও শান্তি-রক্ষকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল না। মথুরানাথ কল্যাণীকে লইয়া তাঁহার আত্মীয়ের বাটির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মথুরাসিংহ দেখিলেন যে, সে ক্ষুদ্র ভবন আর সেখানে নাই। রাজা

বীরসিংহের রাজত্ব হইতেই তিনি তাঁহার আত্মীয়ের আর্থিক উন্নতির কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু এখন প্রাসাদোপম অট্টালিকা দর্শন করিয়া সে জনশ্রুতির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। রাজস্ব-সচীব কৃষ্ণবল্লভ এখন কি তাঁহার দরিদ্র আত্মীয় মথুরাসিংহকে চিনিতে পারিবেন? কল্যাণীকে লইয়া সে অট্টালিকা-সম্মুখস্থ উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিলেন। কিন্তু তথায় আশ্রয় না লইয়াই বা তিনি কি করিবেন? সংসারে আর কোন আত্মীয় স্বজন নাই, যাহার নিকট কল্যাণীকে কিছুদিনের জন্যও রাখিয়া তিনি স্বকার্য্য-সাধনোদ্দেশ্যে যাইতে পারেন।

বাল্যকালে স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এই কৃষ্ণবল্লভের পিতার নিকট মথুরাসিংহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণবল্লভের পিতা শম্ভুনাথ অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বালক মথুরাসিংহকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাহার ভরণপোষণের ভার লইয়াছিলেন। বালকটিকে বুদ্ধিমান ও চতুর দেখিয়া শম্ভুনাথ তাহার লেখাপড়ার একটু সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় অবস্থিতি করিবার সময় তিনি স্বীয় ব্যবহারের দ্বারা প্রভু এবং প্রভুপুত্র কৃষ্ণবল্লভের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন জ্ঞানোন্মেষ হয়, তখন তিনি নিজের হীনাবস্থা বুঝিতে পারেন। কখনও কখনও সংসারমধ্যে ধনী-পুত্র কৃষ্ণবল্লভের সহিত আপনার প্রভেদ বুঝিতে পারিয়া সরলপ্রাণে অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিতেন। সহসা কোন পারিবারিক ঘটনায় ক্ষুণ্ণ হইয়া একদিন মথুরাসিংহ অন্নদাতা শম্ভুনাথের পদতলে মস্তক অবনত করিলেন এবং পদধুলি গ্রহণ করিয়া স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য রায়পুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শম্ভুনাথের গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার পর বহুকাল মথুরাসিংহ রায়পুরে পদার্পণ করেন নাই। রাজা বীরসিংহের দয়ায় তাঁহার অবস্থার কিছু উন্নতি

হইলে, একদিন তিনি প্রতিপালক শম্ভুনাথকে দর্শন করিবার জন্য রায়পুরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু শম্ভুনাথের পরলোকপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন তিনি কৃষ্ণবল্লভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ইহার পরে রাজ-কার্য্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে তাঁহাকে রায়পুরে আসিতে হইত এবং কৃষ্ণবল্লবের সহিত সাক্ষাৎও হইত, কিন্তু একবার ধন-মদমত্ত অহঙ্কারী কৃষ্ণবল্লভের ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তিনি আর কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই বা তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করেন নাই। বহুকাল উভয়ে কেহ কাহারও বিশেষ কোন সংবাদ রাখেন নাই। বহুকালব্যাপী সেই বিচ্ছেদের পর সহসা আজ মথুরাসিংহ ধনী কৃষ্ণবল্লভের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণবল্লভের ভবনে প্রবেশ করিতে তাঁহার একটু দ্বিধা হইতেছিল। কিন্তু আজ তাঁহার অন্য আশ্রয় আর কোথাও ছিল না।

রাজা বীরসিংহের অনুগ্রহে সামান্য কর্ম্ম পাইয়া মথুরাসিংহ অতি দীনভাবে কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত অবস্থান করিতেন। যাহারা তাঁহার সহিত থাকিত, তাহারা সকলেই তাঁহার গুণে অত্যন্ত মুগ্ধ ও প্রীত হইয়াছিল। মথুরাসিংহের সংস্পর্শে যে কোন লোক আসিত, সেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিত। কিছুদিনের মধ্যেই এরূপ হইল যে, তাঁহার গুণ রাজধানীর কাহারও অবিদিত রহিল না। ক্রমশঃ রাজা বীরসিংহ তাঁহার গুণাবলী শ্রবণ করিলেন এবং অতি সন্তোষের সহিত তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে স্থান দিলেন। রাজার সহিত মথুরাসিংহের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি পাইল যে, অবশেষে তিনি রাজান্তঃপুরেও প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন এবং সাধারণের নিকট রাজপরিবার-ভুক্ত বলিয়াই গণ্য হইতেন। এই রাজপরিবারের জন্য মথুরাসিংহ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন এবং বিবাহ করিয়া কখনও সংসারী হইলেন না। সুতরাং আজ

মধ্যাহ্নে রাজপরিবারের সর্ব্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও সর্ব্বনাশ সাধিত হইল এবং তিনি প্রভু-কন্যা কল্যাণীকে লইয়া সংসার-সমুদ্রে অবলম্বনশূন্য হইয়া আজ প্রক্ষিপ্ত হইলেন।

তোরণ-দ্বারের সম্মুখস্থ রাজপথে দাঁড়াইয়া মথুরাসিংহ কি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বলিলেন, "কল্যাণি, আর আমাদের অন্য গতি নাই। উপস্থিত এইখানেই তোমাকে থাকিতে হইবে। যদি কখনও যুবরাজ অরুণকুমারকে পাই, তাহা হইলে আবার তোমায় লইয়া গিয়া রাজ-সংসার সাজাইতে পারিব। আর যদি তাঁহাকে না পাই—। মথুরাসিংহের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহার চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু বাহির হইল। অন্ধকারে কল্যাণী তাহা দেখিতে পাইলেন না। শোকাবেগ সংবৃত হইলে তিনি দেখিলেন, মুক্ত বাতায়ন-পথে উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি আংশিক অবরুদ্ধ করিয়া একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইল। মথুরাসিংহ আর কোন কথা না কহিয়া চক্ষু মার্জ্জিত করিলেন এবং তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিয়া কল্যাণীকে লইয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখনও রাত্রি অধিক হয় নাই। কৃষ্ণবল্লভ আহার করিয়া অন্তঃপুরে গিয়াছিলেন, কিন্তু শয়ন করেন নাই। বহির্দ্বারে দৌবারিক তখনও স্বস্থানে উপবিষ্ট ছিল। উদ্যানমধ্যে অশ্বারোহী দেখিয়া সে একটু অগ্রসর হইলে, মথুরাসিংহ গৃহ-স্বামীর সহিত দেখা করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। দৌবারিক চলিয়া গেলে স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কল্যাণীকে অবতরণ করাইলেন। তখন এক ভৃত্য আসিয়া অশ্ব দুইটি অশ্বশালাভিমুখে লইয়া গেল।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণবল্লভ ভৃত্যমুখে আগন্তুক অশ্বারোহীর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া একটু সশঙ্কিতচিত্তে অন্তঃপুর হইতে বহির্বাটিতে আসিলেন। দেখিলেন, মথুরাসিংহ দণ্ডায়মান এবং তাঁহার পশ্চাতে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী

একটি স্ত্রীলোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মথুরা এত রাত্রে আজ হঠাৎ এদিকে যে?"

মথুরাসিংহ বলিলেন, "আমি আমার এই আত্মীয়-কন্যাকে লইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছি। আপনি জানেন, আমার ত কখনই কোন আশ্রয় ছিল না। ইদানীং যে আশ্রয়টুকু লাভ করিয়াছিলাম, তাহাও সম্প্রতি বিনষ্ট হইয়াছে। আমার এই আত্মীয়া আমারই নিকট প্রতিপালিত হইতেছিল। সুতরাং উপস্থিত আমরা দুই জনেই আশ্রয়শূন্য। সেইজন্য আমার পূর্ব্ব-পালকের নিকট আমার আত্মীয়াকে কিছুকালের জন্য রাখিয়া কোনও কর্ম্মের সন্ধান করিব মনে করিতেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা আমায় প্রতিপালন করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি এই বালিকাকে প্রতিপালন করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন।"

মথুরাসিংহ কল্যাণীর পরিচয় গোপন করিলেন।

কৃষ্ণবল্লভ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পিতার জীবিতাবস্থায় বালক মথুরাসিংহ সেই সংসারের যে কত উপকার করিত তাহা চিন্তা করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, এ বালিকা যখন তাঁহারই আত্মীয়া, তখন তাঁহার দ্বারাও অনেক উপকার পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ বালিকার ভরণ-পোষণের ভার লইলে কোন ক্ষতি হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন, "মথুরা, তোমার উপকার হয় এরূপ কোন কাজ করিতে আমি অসম্মত নহি। আমি তোমার আত্মীয়ার ভার লইতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে এই পরিবারভুক্তা অন্যান্য স্ত্রীলোকের মতই থাকিতে হইবে। যে ভাবে অন্যে প্রত্যহ গৃহকর্ম্মে সাহায্য করে, এই বালিকাকেও সেইভাবেই সাহায্য করিতে হইবে। এরূপ করিলে তিনিও এই স্থানে থাকিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করিবেন না এবং তাঁহার প্রতিপালনের ভার লইতে অস্বীকার করিবার আমারও কোন কারণ থাকিবে না।"

বুদ্ধিমান মথুরাসিংহ সমস্তই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "কল্যাণী গৃহকর্ম্মে নিপুণা। সে সকল কার্য্যেই আবশুকমত সাহায্য করিতে পারিবে। যে কার্য্য সে না জানে তাহা অন্যের নিকট হইতে শিখিয়া লইতে পারিবে। আমার বিশ্বাস, সে আপন ব্যবহারের দ্বারা পরিবারস্থ সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। পরে কল্যাণীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কল্যাণি, যতদিন আমি না আসি, ততদিন এই গৃহই তুমি আপন গৃহ বলিয়া মনে করিও।"

কল্যাণী নিঃশব্দে মাথা হেলাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার হৃদয় দুঃখে শতধা বিদীর্ণ হইতেছিল। জগতে একমাত্র সুহৃদ্ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতেছে বলিয়া নয়নযুগল অশ্রুভাবাপ্লুত হইয়া আসিল, কিন্তু বুদ্ধিমতী বালিকা অতি কষ্টে তাহা সম্বরণ করিল।

কল্যাণীব আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইলে মথুরাসিংহ কৃষ্ণবল্লভের নিকট বিদায় চাহিলেন; কিন্তু কল্যাণীব মুখেব প্রতি চাহিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিলেন। কৃষ্ণবল্লভ প্রস্থানোদ্যত মথুবাসিংহকে বলিলেন, "যদি একান্তই আজ বাত্রে যাইতে হয়, তাহা হইলে আহার করিয়া যাও।" এই প্রস্তাবে কল্যাণীব কাতর-নয়নে একটু আনন্দ-রেখা প্রকাশ পাইল দেখিয়া মথুরাসিংহ সম্মত হইলেন।

আগন্তুককে গৃহান্তরে লইয়া যাইবাব জন্য দৌবারিককে আদেশ করিয়া কৃষ্ণবল্লভ কল্যাণীকে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিবার উদ্যোগ কবিতেছেন দেখিয়া মথুরাসিংহ বলিলেন, "যদি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে যতক্ষণ আমি এইস্থানে থাকি, ততক্ষণ কল্যাণীকে আমার নিকট থাকিবার অনুমতি দিউন। আমার আহারান্তে সে অন্তঃপুরে যাইবে।"

কৃষ্ণবল্লভ কোন আপত্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অন্তঃপুরমধ্যে যাইয়া মথুরাসিংহের আহার্য্যের জন্য আদেশ করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আহার্য্য আসিল। যতক্ষণ মথুরাসিংহ আহার করিলেন, ততক্ষণ কল্যাণী স্থির হইয়া তাঁহার মুখ-প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আহার সমাপনান্তে কল্যাণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বলিলেন—"যদি ভগবান্ দিন দেন, তাহা হইলে তোমার সহিত আবার আমার দেখা হইবে।"

কল্যাণী মথুরাসিংহের সহিত বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন।

অশ্ব দুইটি লইয়া উন্মুক্ত-তরবারি-হস্তে তিনি তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী সামান্য গৃহস্থের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া পিতৃরাজ্য হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজ-কন্যা কল্যাণী অতি দীনভাবে আজ ধনী কৃষ্ণবল্লভের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তরের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য ভগবানের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তিনি সেই অপরিচিত সংসারে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভৃত্য কল্যাণীকে লইয়া অন্তঃপুরমধ্যে গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে গৃহিণী স্বামীর নিকট কল্যাণী-সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাকে দেখিয়াই অতি সাদর-সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া আশ্বাস-বাক্যে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, "এস মা, আমার কাছে বস। ভগবানের ইচ্ছায় আমার সংসারে কিছুরই অভাব নাই। অনেক লোক এই সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

তুমি এখানে কিছুদিন থাকিলে আমার কোন ক্ষতিই হইবে না। তারপর তোমার কাকার কাজকর্ম্মের জোগাড় হইলে তিনি আবার তোমায় লইয়া যাইবেন। তুমি এখানে আমার পুত্রবধূ এবং কন্যাদিগের মধ্যে অনেককে সমবয়স্কা পাইবে। তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নিজের ঘরবাড়ী মনে করিয়া থাকিও। কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না।"

গৃহিণী অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিলেন—"রাত্রি অনেক হইয়াছে। তোমাকে দেখিয়া বড় ক্লান্ত মনে হইতেছে। আর বিলম্ব না করিয়া আহার করিয়া লও।"

এই বলিয়া তিনি কল্যাণীকে লইয়া কক্ষান্তরে আহার করিতে লইয়া গেলেন। কিন্তু কল্যাণী কিছুই খাইতে পারিলেন না। আজ মধ্যাহ্নে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য দুঃখে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতেছিল। তিনি কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। স্বাধীন বিহঙ্গমকে পিঞ্জর-মধ্যে পরাধীনতায় বাস করিতে হইলে তাহার যে কি কষ্ট হয়, তাহা গৃহিণী বুঝিতেন। সুতরাং আহারের জন্য তিনি কল্যাণীকে কোন অনুরোধ করিলেন না।

উভয়ের আহারাদি সমাপ্ত হইলে গৃহিণী বলিলেন, পথশ্রমে আজ তুমি বড় ক্লান্ত হইয়াছ। এখন বিশ্রাম কর। কাল তোমার সঙ্গে গল্প করিব। কল্যাণীকে একটি কক্ষ দেখাইয়া তিনি নিজে শয়ন করিতে গেলেন। অন্তঃপুরমধ্যে তখন অনেকেই নিদ্রিত ছিল। যাহারা তখনও জাগিয়াছিল, তাহারা নিজের নিজের কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। সুতরাং এই আগন্তুকের আগমন-সংবাদ প্রায় কেহই জানিতে পারিল না।

কল্যাণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন গৃহমধ্যে একটি সাধারণ শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে ও গৃহতলে দীপাধারে একটি মৃৎ-প্রদীপ জ্বলিতেছে। কক্ষমধ্যে তিনি অপর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

তখন ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কল্যাণী প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিলেন এবং যে ভূমিতলে আজ পিতা ও মাতা শয়ন করিয়াছেন, সেই ভূমিতলে নিজেও শয়ন করিলেন।

কল্যাণী শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আসিল না। আজ দিবসে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, এখন তাহা অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ সমস্তই দেখিতে লাগিলেন। দিবসের সকল ঘটনাই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কল্যাণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভূমিতল হইতে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁহার নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি উঠিয়া অধীর হইয়া পদচারণা করিতে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মস্তকে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তখন তিনি বসিয়া পড়িলেন। অল্প পরেই মাটিতে বসিয়া বসিয়া তিনি দেওয়ালের কাছে গেলেন এবং দেওয়ালে হাত দিতে দিতে তদবস্থায় একটি জানালার নিকটে পৌঁছিলেন। জানালা খুলিয়া নীল আকাশ-গাত্রে নক্ষত্র দেখিতে পাইয়া কল্যাণী তথায় বসিলেন। প্রজ্জলিত দুঃখানল অনন্ত শিখা বিস্তার করিয়া তাঁহার হৃদয় মধ্যে তখন এরূপ দাহন আরম্ভ করিয়াছিল যে, স্নিগ্ধ শরৎকালীন বায়ুদ্বারা তাহার কোন উপশম হইল না। তিনি আর হৃদয়-নিহিত শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না। নানারূপ বিপদে পতিত হওয়ায় যে অশ্রুপ্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, এখন তাহা বন্ধনশূন্য হইয়া অবিরলধারে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া বক্ষে আসিতে লাগিল। কল্যাণী বহুক্ষণ এইভাবে রোদন করিয়া কিছু শান্ত হইলেন। গবাক্ষপথে নাতিশীতোষ্ণ মৃদুমন্দ সমীরণ আসিয়া সেই অনাথার সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইল। রজনীশেষে কল্যাণীর ঈষৎ নিদ্রা আসিল। তখন তিনি সেই বাতায়নতলেই শয়ন করিলেন।

অতি প্রত্যূষে কল্যাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া জানালা হইতে দেখিলেন—ঈষৎ রক্তিমাভায় পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। শীঘ্রই সূর্য্যোদয় হইবে ভাবিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং দালানের একপার্শ্বে প্রাঙ্গণের দিকে দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিনের অত্যন্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির জন্য ও পূর্ব্ব রাত্রের অধিকাংশ সময় রোদন করায় তাঁহার চক্ষু দুইটি রক্তিম ও একটু স্ফীত হইয়াছিল। কল্যাণী তাঁহার ম্লান মুখখানি আকাশের দিকে ফিরাইয়া লক্ষ্য-শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

প্রাঙ্গণ হইতে দাসদাসী ঊষাকালীন অল্প আলোকে দেখিল, একজন অপরিচিতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা সেদিকে বিশেষ কোন মনোযোগ না দিয়া আপন আপন কর্ম্ম করিতে লাগিল। কিন্তু যখন পুরবাসিনীরা উত্থিত হইয়া দালানের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন, তখন সকলেই সেই অপরিচিতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলেন; কেহ বা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণীকে দেখিতে লাগিলেন। যাঁহারা কল্যাণীর নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, তাহাদের মনে হইল, শিশির-সিক্ত কমলদলের মধ্যে অর্দ্ধ-বিকশিত কমলিনী যেন ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্য-প্রভার অপেক্ষা করিতেছে, যেন তাহা সকল সৌন্দর্য্য হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত রাখিবার প্রয়াস করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না, সূর্য্যরশ্মিপাতে সে হৃদয় আপনি উন্মুক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। কতিপয় পুরবাসিনী দেখিলেন, অনন্ত সৌন্দর্য্য লইয়া সে বালিকা মর্ত্ত্যে আসিয়াছে। যদিও প্রখর সূর্য্যের তাপে নিপীড়িত কুন্দের ন্যায় সে মুখ ঈষৎ ম্লান হইয়া রহিয়াছে, তথাপি সোহাগ-সিক্ত হইলে সে মুখে যে অসীম সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠিবে, তাহা তাঁহারা অনুভব করিলেন। তাঁহার সেই কুঞ্চিত অলক হইতে দুই চারিটি কেশগুচ্ছ চম্পকাভ মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল এবং মৃদু-মন্দ প্রভাত-সমীরণে তাহা অল্প অল্প

দুলিতেছিল। বালিকার অঙ্গে অতি অল্প আভরণ, অতি সামান্য পরিচ্ছদ ছিল বলিয়া তাঁহার অঙ্গ সৌষ্ঠবের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হইতেছিল। মৃণালের মত কোমল অথচ সুগোল হাত দুখানি সম্পূর্ণীভূত অঙ্গের দুই পার্শ্বে শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। সেই নিরালঙ্কার দেহের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পুরবাসিনীরা মুগ্ধ হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যে সুন্দর তাহার আর অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না। তাহাকে সকল অবস্থাতেই সুন্দর দেখায়। অলঙ্কার সৌন্দর্য্যহীনারই সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের উপায় মাত্র।"

কল্যাণী দেখিলেন, চারিজন স্ত্রীলোক অনিমেষ-লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন। তাহাতে তিনি কিছু লজ্জিতা হইলেন এবং সেই ঈষৎ উন্নত দেহ অবনত করিয়া আনত-বদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথমে কেহই কোন কথা কহিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের মধ্যে একজন সেই অপরিচিতা স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ভাই আমাদের কে হও ?"

কল্যাণী।—আমি তা' ত জানি না। আমার কাকা তাঁর পূর্ব্ব-পালকের বাড়ীতে আমায় রাখিয়া গিয়াছেন। এখন আমাকে কিছুদিন এইখানেই থাকিতে হইবে।

তাহা শুনিয়া যুবতী বলিলেন, "তা ভাই বেশ হয়েছে। তোমায় দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইতেছে। আমি এখন মার কাছে যাইতেছি ; একটু পরেই আবার তোমার কাছে আসিব।"

এই স্ত্রীলোকটি কৃষ্ণবল্লভের কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুমতী।

ইন্দুমতীর সহিত সকলেই চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে ইন্দুমতী পশ্চাৎ ফিরিয়া আর একবার কল্যাণীকে দেখিয়া লইলেন।

কল্যাণী অধিকক্ষণ স্থিরভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষের জল শত চেষ্টা সত্বেও বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিল।

তিনি নিজেকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য একটু এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া গৃহ-সৌষ্ঠব দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বাহিরের দ্রব্যাদির উপর নিঃক্ষিপ্ত হইলেও চক্ষু অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া অন্তিম-শয়নে শায়িত পিতা-মাতাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাঁহার নেত্র-কোণে দুই বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল, তখন তিনি ভাবিলেন, চিত্ত সংযত করিতে না পারিলে প্রকৃত অবস্থা কাহারও অগোচর থাকিবে না। সেইজন্য তিনি তাঁহাদের কুলদেবতাকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "দয়াময়, তুমি যখন আমাকে এইরূপ অনাথা করিলে, তখন এই অবলার হৃদয়ে বল দাও; যেন অন্তরের সকল দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া আশ্রয়দাতা ও তৎপরিবারস্থ সকলের মনস্তুষ্টি করিতে পারি ও কাকাব সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হই।"

শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া কল্যাণী দেখিলেন, এ প্রাসাদ-তুল্য-ভবনে কিছুরই অভাব নাই। বিলাসিতার অনেক দ্রব্যই পুরবাসিনীদিগের কক্ষমধ্যে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সকল জিনিষই এরূপ অপরিষ্কার ও অবিন্যস্ত ছিল যে, তাহা দেখিয়া তাঁহার কোন তৃপ্তিই হইল না। তাঁহার মনে হইল, ভাল করিয়া সাজাইলে এ সকল কক্ষ আরও সুন্দর দেখায়।

কল্যাণী একটি কক্ষের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলেন, এমন সময় ইন্দুমতী আসিয়া বলিলেন, "চল ভাই আমার ঘরে। সেখানে একটু গল্প করিব।"

কল্যাণী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ইন্দুমতীর ব্যবহারে কল্যাণী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার শয়নাগারে যাইলেন। কল্যাণী দেখিলেন, গৃহটি মূল্যবান গৃহ-সজ্জায় সজ্জিত। কল্যাণী বড় ঘরের মেয়ে। মূল্যবান্ সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি দেখিয়াছেন এবং ভাল মন্দ চিনিতেন। কিন্তু এখানে

সে বিচারের প্রয়োজন নাই। সেইজন্য তিনি সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ের মত সেই সকল গৃহ-সজ্জা দেখিতে লাগিলেন।

ইন্দুমতী অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে আপন জিনিষগুলি দেখাইতেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু কল্যাণী কোন কথার উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে সব দেখিতেছিলেন। যখন ইন্দুমতী দেখিলেন যে, কল্যাণী তাঁহার সহিত গল্পে যোগ দিল না, তখন তিনি স্নেহভরে বলিলেন, "তুমি ভাই আমার সঙ্গে কথা কহিবে না?"

এত স্নেহ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কল্যাণী একখানি চিত্র হস্তে লইয়া বলিলেন, "এ চিত্রখানি এভাবে রাখিলে ভাল দেখায় না কি?" কল্যাণী মথুরাসিংহের হস্তে শিক্ষিতা। কিসে সুন্দর এবং কিসে অসুন্দর হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। রাজা বীরসিংহের প্রাসাদ সজ্জিত করিবার ভার তাঁহার এবং মথুরাসিংহের উপর অর্পিত ছিল এবং তাঁহারাই পূজা পার্ব্বণের সময় বিশ্বনাথের মন্দির সজ্জিত করিতেন। কল্যাণীর অন্তঃকরণ মধ্যে সেই দুঃখ নিমেষের জন্য জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি চিত্ত সংযত করিয়া আবার বলিলেন—"আপনার কি মনে হয়?"

প্রস্তাবটি সুসঙ্গত মনে করিয়া ইন্দুমতী বলিলেন, "বেশ, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ঘরটি সাজাইয়া দাও।"

বহু আয়াসে চিত্ত সংযত করিলেও বেশী কথা কহিবার প্রবৃত্তি তখন কল্যাণীর ছিল না। সেইজন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে অন্তরস্থ চিন্তাস্রোত অক্ষুণ্ণ থাকিবে মনে করিয়া কল্যাণী এ প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। তখন কল্যাণী ও ইন্দুমতী উভয়েই গৃহকার্য্যে মন দিলেন। গৃহভিত্তি ও গৃহতল মার্জ্জিত, ধৌত ও পরিষ্কৃত হইলে ইন্দুমতী বলিলেন, "আর বিলম্ব করা উচিত নহে। চল এইবার স্নানাহার করিতে যাই।"

অপরাহ্নে অন্যান্য পুরস্ত্রীরা ইন্দুমতীর গৃহে আসিলেন। দেখিলেন

ইন্দুমতীর কক্ষের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। সেখানের সকল গৃহসজ্জাই নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। যে গৃহতলে পূর্ব্বে পদার্পণ করিতেও প্রবৃত্তি হইত না, আজ তথায় সকলের বসিবার ইচ্ছা হইল। ইন্দুমতী তাঁহাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিলেন দেখিয়া কল্যাণী ক্ষিপ্রহস্তে গালিচাখানি পাতিয়া দিলেন। সকলে বসিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিলে কল্যাণী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন পুরবাসিনীদিগের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, "কল্যাণি, তোমার শুধু ইন্দুমতীর ঘর লইয়া থাকিলেই চলিবে না, অন্যান্য ঘরেরও কাজ করিতে হইবে।"

কল্যাণী আশৈশব মথুরাসিংহের নিকট অবস্থা-বিপর্য্যয়ে অনুদ্বিগ্ন-মনে কর্ত্তব্যপালন করা উচিত এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি আজ প্রভাত হইতেই সকল শোক সংবরণ করিয়া এই সংসারের সকলকে সন্তুষ্ট করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণবল্লভের পুত্রবধূর মুখ-নিঃসৃত এরূপ কঠোর বাক্যে বিস্মিত বা দুঃখিত হইলেন না। তিনি কেবল মস্তক হেলাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সংসারের সকলেই ইমন্দুতী নহেন। অতি অল্পসংখ্যক লোকই আশ্রিতের প্রতি ভালবাসা দেখাইতে জানে। জগৎবাসীর অধিকাংশই একটু সুযোগ পাইলেই স্ব স্ব প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং অপেক্ষাকৃত হীনবলের প্রতি স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে কখন কোন ত্রুটি-প্রদর্শন

করে না। সময়ে সময়ে তাহারা ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া আশ্রিতকে পদদলিত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

রাজনন্দিনী কল্যাণীকে কৃষ্ণবল্লভের সংসারে দাসীরূপেই থাকিতে হইল। পুত্রবধূ এবং কন্যাদিগের সেবা ও অন্যান্য গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে কল্যাণীর সমস্তদিন অতিবাহিত হইত। নিজের দুঃখ নিজের হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া তিনি সকল সময় তাঁহাদের আজ্ঞাপালন করিতেন। তাঁহার কার্য্যে কেহ কখনও কোন দোষ দেখিতে পাইতেন না। কোন কঠিন বা অত্যন্ত অধিক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেও তাঁহার মুখে কেহ বিরক্তির চিহ্ন পাইত না।

যত দিন যাইতে লাগিল ততই কৃষ্ণবল্লভের অন্তঃপুর-বাটিকার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইতেছিল। অপরিচ্ছন্নতার কোন চিহ্ন ইহার কোথাও রহিল না। কল্যাণী যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা অতি যত্নের সহিত সম্পন্ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতেন। এইজন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুরস্ত্রীরা তাঁহার দ্বারাই আপন আপন কার্য্যে সমাহিত করিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ কারতেন। কৃষ্ণবল্লভ দেখিলেন, মথুরাসিংহের কথা যথার্থ হইয়াছে। সত্যই কল্যাণী আপন ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

ক্রমে কল্যাণী সকলের বিশ্বস্ত ও প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এইরূপে কয়েকমাস অতিবাহিত হইল। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় যখন কুলদেবতার পূজা হইত, তখন কল্যাণী প্রত্যহ তথায় যাইতেন। পূজা শেষ পর্য্যন্ত তিনি মণ্ডপের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া নিজের হৃদয়ের অবস্থা ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন করিতেন। তিনি কি ছিলেন এবং এখন তাঁহার অবস্থা কি হইয়াছে ইহাই তিনি চিন্তা করিতেন। মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া পিতৃকুল-দেবতা কমলাপতিকে স্মরণ করিয়া তিনি মনে মনে বলিতেন, "হে ভগবান,

তোমায় প্রণাম করিয়া পিতামাতার সহিত কি উদ্দেশ্যে পিতৃরাজ্য হইতে বহির্গত হইলাম, আর একি অবস্থায় তুমি আমাকে নিক্ষিপ্ত করিলে! পিতামাতাকে পথে হারাইলাম; ভ্রাতার এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাইলাম না। জগতে একমাত্র সুহৃদ্ ও আত্মীয় মথুরাসিংহ—তিনিও আর ফিরিলেন না। রায়পুর-রাজ্যে রাজপরিবার-ভুক্ত হইয়া থাকার পরিবর্ত্তে আমায় সেই রাজ্যে দাসীরূপে অবস্থিতি করিতে হইল। পিতার অভিলাষ এবং আমার আশার কথা এখন মনোমধ্যে উত্থাপিত করিলে নিজেকে পাগল বলিয়া মনে হয়। আমি যাঁহাকে নিজের স্বামী মনে করিয়া পিতৃ-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, তুমি দয়া করিয়া সেই প্রাণের দেবতাকে একবার দেখাইয়া দাও প্রভু! তাহা হইলেই সেই শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া এবং হৃদয়মধ্যে সেই শ্রীচরণ পূজা করিয়া আমি আমার অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিব।"

প্রতিদিন প্রাতে পূজামণ্ডপে আসিয়া কল্যাণী এইরূপে কাতর-প্রার্থনা করিতেন এবং পূজা সমাপ্ত হইলে উদ্দেশ্যে কমলাপতিকে প্রণাম করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন ও অকাতরে সমস্তদিন সকলের সেবা করিতেন। আবার সন্ধ্যা হইলে পূজা-মণ্ডপে আসিতেন। দেবতার সন্ধ্যা-আরতির পরে যখন তিনি পূজা-মণ্ডপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন তখন তাঁহার মুখে গভীর দুঃখের একটি ঘন ছায়া পতিত হইত। কিন্তু কল্যাণীর সে ম্লানমুখ, সে কাতর-নয়নের দিকে কেহই চাহিয়া দেখিত না।

এইরূপে মাসের পরে মাস চলিয়া যাইতে লাগিল। কল্যাণী মথুরা-সিংহের কোন সংবাদই পাইলেন না। তখন এই কৃষ্ণবল্লভের গৃহে দাসীত্বই তাঁহার জীবনের শেষ উপায় মনে হইল। রাজা বীরসিংহের কন্যা কল্যাণী পিতার গৌরব, পিতার ঐশ্বর্য্য, পিতৃভবনে তাঁহার সুখ, এ সকল বিষয় নির্জ্জনে বসিয়া মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতেন এবং মনের বেদনা

মনের মধ্যেই রাখিতেন। তাঁহার অন্তরের দুঃখ বাহিরের কেহই জানিতে পারিত না এবং কল্যাণী কাহাকেও জানিতে দিতেন না। এত দুঃখের উপরে তিনি আর এক নূতন দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সরল-হৃদয়ের করুণ-ক্রন্দনে এবং এত কাতর প্রার্থনায় ভগবান্ কর্ণপাত করিলেন না বলিয়া মনে মনে তাঁহার অত্যন্ত অভিমান হইত। একদিন সন্ধ্যাকালে পূজা-মণ্ডপে বসিয়া অনন্যচিত্তে কমলাপতির ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি সেই অশ্রুসিক্ত-নয়নে মনে মনে বলিলেন, "হে দেব, তুমি যত পার আমায় কষ্ট দিতে থাক, কিন্তু আমি তোমার চিন্তা কখনই ছাড়িব না। যদি একদিনও পবিত্র-মনে তোমায় ডাকিতে পারি, তাহা হইলে তোমার আশীর্ব্বাদলাভে কখনও বঞ্চিত হইব না। তোমার অপার করুণার এক কণামাত্র পাইলেও আমি ধন্য হইয়া যাইব।"

ভক্তের কাতর-প্রার্থনায় ভগবান্ বিচলিত হইলেন। বাহ্যদৃষ্টির বহির্ভূত স্থানে বসিয়া বিশ্ব-শাসন-কর্ত্তা যে কি ভাবে মানবের সুখ দুঃখের হিসাব নিকাশ করিতেছেন তাহা কে বুঝিতে পারে? কৃষ্ণবল্লভের ভবনে দাসীরূপে অবস্থিতা কল্যাণীর ভাগ্যে যে কত সুখ ছিল তাহা কে জানিত?

নবম পরিচ্ছেদ

প্রায় এক বৎসর এইভাবে অতীত হইল। তখন এ সংসারে সাধারণ দাসী-পদ হইতে কল্যাণীর আসন অনেক উচ্চে অবস্থিত। তিনি যে কার্য্য করিতে চাহিতেন, কেহই তাহাতে কোন অমত করিতেন না। তাঁহার ব্যবহারে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি সদ্বংশোদ্ভবা।

তাঁহার বিচারশক্তি ও কার্য্যকুশলতা দেখিয়া সকলের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি শিক্ষিতা ও সদাচার-সম্পন্না। পীড়িতের সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্য্যা দেখিয়া সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, পিতৃগৃহে কল্যাণী আর্ত্ত ও অভ্যাগতের সেবা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

একদিন কল্যাণী গৃহিনীর নিকট গিয়া বলিলেন, "মা পূজার সময় প্রত্যহ দেখি পুষ্পপাত্র ভাল করিয়া সাজান হয় না। ফুল, দূর্ব্বা প্রভৃতি পূজার উপকরণ অতি অযত্নে তোলা হয় এবং পুষ্পপাত্রে একসঙ্গে মিশাইয়া রাখিয়া দেয়। দেব-সেবার আয়োজন অতি যত্নে এবং ভক্তিপূর্ণ-চিত্তে আগ্রহের সহিত না করিলে দেবতা তুষ্ট হন না। আমার ইচ্ছা হয়, আমি পূজার সকল আয়োজন করিয়া দিই।" গৃহিণী অতি হৃষ্টচিত্তে ইহাতে সম্মত হইলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে কল্যাণী শয্যাত্যাগ করিলেন এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নানাদি সমাপন করিয়া একখানি শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিধান করতঃ সাজিহস্তে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেখানে যত সুন্দর সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্প ছিল, কল্যাণী সকলগুলি চয়ন করিলেন। সাজি পূর্ণ হইলে সদ্যোজাত-নবদূর্ব্বা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যিনি প্রাণের সহিত কোন কর্ম্ম করেন, সে কর্ম্ম যত কঠিন এবং যত সময়সাপেক্ষ হউক না কেন, তাহাতে তাঁহার কখনও বিরক্তি জন্মে না। প্রত্যহ এইভাবে অতি যত্নে পুষ্প ও দূর্ব্বা সংগ্রহ করিতে কল্যাণীর কোন দিনই বিরক্তি বোধ হইত না।

আবার শারদাকাশ নূতন শোভা লইয়া জগদ্বাসীর সমক্ষে আবির্ভূত হইল। মেঘ-নির্ম্মুক্ত নীল আকাশে তুষার ধবল মেঘখণ্ডগুলি ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পৃথিবীতল নবদূর্ব্বাদল মণ্ডিত হইয়া সবুজবর্ণ মখমলাচ্ছাদিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। আবার সেই কোমলবর্ণের

কোমলতা বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য দূর্ব্বাদলরাজি শিশিরাভরণে ভূষিত হইতেছিল। উদ্যানে তরুলতাদি বিবিধ বর্ণের কুসুমে ভূষিত হইয়া এক মনোহর শ্রীধারণ করিল। নবোদিত অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া স্থলপদ্ম সে উদ্যানের শোভা আরও বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল। শেফালিকা বায়ুসংস্পৃষ্ট না হইয়াও বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িতেছিল। কল্যাণী শুভ্র বসন পরিধান করিয়া পুষ্প চয়ন করিবার জন্য উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিক্ত অলকাবলী তাঁহার পৃষ্ঠদেশ প্রচ্ছন্ন করিয়া জানু পর্য্যন্ত লম্বমান হইয়াছিল। দুই একটি কেশগুচ্ছ বিক্ষিপ্ত হইয়া বক্ষদেশে সংসর্পিত হইয়া দুলিতেছিল। কল্যাণী ধীরে ধীরে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন—যেন উষা অন্ধকারময় আকাশে আসিয়া দেখা দিল। উদ্যানমধ্যস্থ তরুলতা হাসিয়া উঠিল, যেন তাহারা কল্যাণীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়াই পূর্ণ বিকশিত কুসুমগুলি বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। এইবার সে কুসুম-সম্ভার দেবার্চ্চনে অর্পিত হইবে ভাবিয়া তরুরাজি আনন্দিত হইল—মৃদুমন্দ প্রভাত-সমীরণ সঞ্চালিত হইয়া দুলিতে লাগিল।

কল্যাণী যেখানে যে ভাল ফুলটি পাইলেন তুলিলেন। সাজি প্রায় পূর্ণ হইয়াছে এমন সময় শেফালিকার নিকট আসিলেন। যে পুষ্পগুলি বোঁটা হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িয়াছিল তাহা তিনি লইলেন না। তিনি এক একটি পল্লব আনত করিয়া সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমগুলি লইতেছিলেন। যখন তিনি এইভাবে পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন তখন বৃন্তচ্যুত অনেক কুসুম যে তাঁহার অলক-সংলগ্ন হইতেছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। একমনে ভগবানের আশীর্ব্বাদ কামনা করিতে করিতে বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিতেছিলেন।

এই সময় এক অশ্বারোহী যুবা তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, কুসুম-ভূষিতা পবিত্রাননা

বনদেবী কুসুম-মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। অশ্ব সংযত করিয়া মুগ্ধনেত্রে তিনি সেই দেবী-প্রতিমাকে দেখিতে লাগিলেন।

যখন সাজি ফুলে ভরিয়া গেল, তখন কল্যাণী উদ্যান হইতে বহির্গত হইয়া বাটীর পশ্চাদ্ভাগে চলিয়া গেলেন, তাহা দেখিয়া যুবাপুরুষ অশ্বচালনা করিয়া বাটীর বহির্দ্বারের নিকট আসিলেন এবং কৃষ্ণবল্লভের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য প্রতিহারীকে বলিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কল্যাণী উদ্যানে আসিয়া পুষ্পচয়ন করিলেন। সাজি পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া একটি বৃক্ষের শাখায় সাজিটি ঝুলাইয়া রাখিয়া দুর্ব্বা তুলিতে লাগিলেন। উদ্যানমধ্যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুর্ব্বা তুলিতেছেন এমন সময় একটি হরিণ-শিশু ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইল। কল্যাণী হস্তস্থিত দুর্ব্বাগুচ্ছ সাজিতে রাখিয়া হরিণ-শিশুর নিকট যাইলেন এবং কচি কচি তৃণ তুলিয়া তাহার মুখের নিকট ধরিলেন। হরিণশিশু তৃণগুলি খাইয়া ফেলিলে কল্যাণী আবার কোমল তৃণ তুলিয়া তাহাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু বেলা অধিক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আর তথায় থাকিতে পারিলেন না। শিশির-সিক্ত ঘাসের উপর হস্ত মার্জ্জিত করিয়া কল্যাণী ফুলের সাজি লইবার জন্য উঠিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, সেই অশ্বারোহী যুবাপুরুষ উদ্যান-পথ হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কল্যাণী লজ্জাবনতমুখী হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন এবং ধীরে ধীরে সাজি হস্তে লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

কে আসিয়াছিলেন এবং কেন তথায় আসিয়াছিলেন, তাহা কল্যাণীর জানিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কেন আমি সে মূর্ত্তি একবার ভাল করিয়া দেখিলাম না। কেন তাঁহার মন আজ এরূপ করিতেছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার মন যে আজ একটু অস্থির হইয়াছিল তাহা তিনি স্পষ্ট অনুভব করিলেন।

পূর্ব্ব দিনের মতই তিনি গৃহদেবতার পূজার আয়োজন করিলেন এবং পূজার সময় মন্দিরে আসিয়া পূজা দেখিলেন। পূজা অবসানে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্ববৎ কমলাপতির ধ্যানান্তে স্বীয় কাতর প্রার্থনা তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। যখন পূজা-মণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেন তখন তাঁহার মনে হইল, আগামী কল্য যদি সে পুরুষ উদ্যানমধ্যে আসেন তাহা হইলে বৃক্ষান্তরাল হইতে একবার তাঁহাকে দেখিবেন এবং যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে তাঁহার পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিবেন।

কল্যাণী গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সমস্ত দিন এই কথা ভাবিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বৃক্ষান্তরাল হইতে সেই অপরিচিত পুরুষকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁহার পরিচয় কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? সহসা একটি উপায় তাঁহার মনে হইল। কল্যাণী ভাবিলেন, ছোটদিদি ইন্দুমতীকে সঙ্গে লইয়া গেলে হয়ত তিনি সেই আগন্তুককে চিনিতে পারেন। কর্ত্তব্য স্থির হইলে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি ইন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আজ বাগানে অনেক ফুল ফুটিয়াছিল। বোধ হয় কালও সেইভাবে ফুল ফুটিবে। আমার ইচ্ছা হয়, অনেক ফুল তুলিয়া ভাল করিয়া কতকগুলি মালা গাঁথি এবং দেব-সেবার জন্য পুষ্প-পাত্রে সাজাইয়া দিই। একাকী এত ফুল তুলিয়া পূজার পূর্ব্বে মালা গাঁথা সম্ভব নহে। আপনি যদি কাল আমার সহিত বাগানে যাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং বাগানে যে এত ফুল ফুটিতেছে তাহারও সদ্ব্যবহার হয়।"

ইন্দুমতী সম্মত হইয়া বলিলেন, "তুমি শয্যাত্যাগ করিয়া আমাকেও উঠাইও। আমি তোমার সহিত স্নান করিয়া বাগানে যাইব।"

তখন প্রায় সন্ধ্যা সমাগতা। প্রদোষ-তিমির আসিয়া চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল। পূজামণ্ডপে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিত করিবার জন্য কল্যাণী

ইন্দুমতীর নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। সহসা তাঁহার বিষাদপূর্ণ অন্ধকারময় হৃদয়মধ্যে এক অতি ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ-বিলাস হইল। কল্যাণী সে তীব্র আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। ধীরে ধীরে দেওয়ালের নিকট গিয়া দেওয়াল ধরিয়া কিছুক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটু সুস্থ বোধ হইলে তিনি আবার পূজামণ্ডপের দিকে যাইতে লাগিলেন।

আজ সমস্ত দিন কল্যাণীর মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিল। শত চেষ্টা করিয়াও মনের সে অস্থিরতা দূর করিয়া চিত্তে শান্তি আনিতে পারিলেন না। সেইজন্য তিনি পূজা-মণ্ডপে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন, "হে প্রভু, এতদিন হৃদয়ের যে চিন্তা মনোমধ্যে লুক্কায়িত রাখিলাম, আজ যেন তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করি। এতদিন আমার মলিন মুখ কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, কিন্তু আজ যেন মনে হইতেছে সকলেই আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দয়াময়, আমার অন্তরের দুঃখ যেন অন্তরমধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারি; বাহিরে যেন তাহা কোনরূপে প্রকাশ না পায়। আমি তোমার অনুগ্রহ, তোমার আশীর্ব্বাদ চাই, জগদ্বাসীর সহানুভূতি চাহি না। তুমি একবার আমার হৃদয়ের দেবতাকে, একবার আমার সাধনা ও আরাধনাকে আমার সম্মুখে আনিয়া দাও; একবার সেই শ্রীচরণ দর্শন করিবার অবকাশ দাও—তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হইবে; তাহা হইলেই সেই শ্রীচরণ হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া দাসীত্ব করিয়াও অনন্ত সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব।"

কল্যাণী অপেক্ষাকৃত স্থির হইলেন। ধূপ-দীপাদি যথাস্থানে রাখিয়া ও দৈনন্দিন সকল কর্ম্ম সমাধান করিয়া তিনি মন্দিরদ্বারে বসিয়া পুরোহিতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পূজা-গৃহের সকল কর্ম্ম অধুন

তাঁহাকেই করিতে হইত। তাঁহার উপর ভার অর্পণ করিয়া পুরবাসিনীরা সেই একঘেয়ে কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সহজে আর কেহ সেদিকে পদার্পণ করিতেন না।

পূজা সমাপ্ত হইলে কল্যাণী আজ গৃহিণীর নিকট না গিয়া পাকশালায় যাইলেন এবং তথায় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজেকে অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করিলেন। এখন তাঁহাকে সাধারণ দাসীর মত গৃহ-কর্ম্ম প্রায় কোন দিনই করিতে হইত না। সন্ধ্যার পর কুলদেবতার পূজা সমাপ্ত হইলে প্রায় তিনি গৃহিণীর নিকট বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। আজ কল্যাণী তাঁহার নিকট না আসায় গৃহিণী তাঁহার অভাব অনুভব করিলেন, কিন্তু পাকশালায় রন্ধনের সাহায্য করিতেছে শুনিয়া তাঁহার নিকট আসিবার জন্য বলিতে পারিলেন না।

যথাসময়ে সকলের আহারাদি সমাপ্ত হইলে কল্যাণী আসিয়া স্বীয় কক্ষের দ্বাররুদ্ধ করিলেন। বাতায়নের নিকট পৌছিবার পূর্ব্বেই কল্যাণীর লোচন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। লোক-চক্ষুর সম্মুখে কল্যাণী যে দুঃখপূর্ণ হৃদয় সংযত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন লোক-চক্ষুর অন্তরালে সেই হৃদয় তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কোন চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত একেবারে বিলুপ্ত হইল। তিনি নিস্পন্দভাবে বাতায়নতলে বসিয়া রহিলেন, কেবল তাঁহার নয়ন হইতে অবিরতধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে কল্যাণী স্বীয় জীবনের প্রথমাবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল দিন মনে মনে গণিতে লাগিলেন। পিতামাতার অপার স্নেহ, মথুরাসিংহের অনন্ত ভালবাসা, তাঁহার নিকট শিক্ষা, কমলাপতির মন্দির ও তথায় শাস্ত্রালোচনা, প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণের জন্য পিতার সহৃদয়তা—এ সকল অভাব আজ তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও কায়িক ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া বিবেচনা

করিতেন না—আজও করিলেন না। তারপর পিতামাতার মৃত্যুর জন্য তাঁহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা মনে হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন। তখন রায়পুর রাজ্যের যুবরাজ্ঞী হইবার কথা মনোমধ্যে উদিত হইবা মাত্র তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

যখন তাঁহার চিত্ত ভাবরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিল, তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবং স্বীয় দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকে শত ধিক্কার দিলেন। তাঁহার মনে হইল, জগতে তাঁহার মত দুঃখিনী বোধ হয় আর একটিও নাই। আপনার বলিতে তাঁহার কেহই নাই এবং অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন এমন একটিও সুহৃদ্ তিনি দেখিতে পান না। তাঁহার হৃদয়ের ভাব যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার সেই চিরপ্রার্থিত স্বামীর রূপ তিনি কত ভাবেই কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অনন্ত রূপের কত মোহন ছবিই কল্যাণী আপনার হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত সে হৃদয় দেবতার বাস্তব-মূর্ত্তি কল্যাণীর নয়নপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু আজ সেই আগন্তুককে দর্শন করা অবধি তাঁহার মন বিচলিত হইতে লাগিল কেন? তিনি যেন সেই মূর্ত্তিমধ্যে নিজের হৃদয়-নিহিত কল্পিত মূর্ত্তির অনেক সাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন। সেই জন্যই আজ কল্যাণীর মনে আশার একটি ক্ষীণ জ্যোতিঃ উদিত হইয়া তাঁহাকে নিয়তই দগ্ধ করিতেছিল। দুঃখের বেগ অত্যন্ত অধিক হইলে কল্যাণী আর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তন্দ্রা আসিয়া তাঁহার সকল কষ্ট দূর করিল। নিদ্রাভিভূতা হইয়া তিনি তথায় শয়ন করিলেন।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া কল্যাণী ইন্দুমতীকে উঠাইয়া স্নানাদি সমাপনানন্তর পূজা-মণ্ডপে গেলেন এবং পূজার স্থান পরিষ্কৃত করিয়া সাজি-হস্তে দুইজনে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কল্যাণী ও ইন্দুমতী উভয়েই পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন। আজ কল্যাণীর দৃষ্টি কেবল পুষ্পের প্রতিই আবদ্ধ ছিল না। মধ্যে মধ্যে তিনি উৎসুক-নেত্রে রাজপথের প্রতি এবং সময়ে সময়ে তোরণদ্বারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। আজ তাঁহার হৃদয় ঔৎসুক্যপূর্ণ এবং কটাক্ষ স্থির ও গম্ভীর ছিল। তাঁহার সেই পদ্মপলাশতুল্য লোচনযুগল আজ যে কি অপার্থিব পদার্থের অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা ইন্দুমতী বুঝিতে পারিলেন না। উভয়েই পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, এমন সময় কল্যাণী পাদপান্তরাল হইতে রাজপথে এক অশ্বারোহী পুরুষকে আসিতে দেখিলেন। অতি দূর হইতেই তিনি তাঁহাকে পূর্ব্ব-পরিচিত আগন্তুক বলিয়া চিনিতে পারিলেন। পুষ্প সংগ্রহ করিতে করিতে কল্যাণী সেই মূর্ত্তি-প্রতি মধ্যে মধ্যে নয়ন ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন, ইন্দুমতী তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ক্রমশঃ অশ্ব-খুরধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। যখন অশ্ব মৃদু পাদবিক্ষেপে তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া আরোহীকে লইয়া উদ্যান-পথে প্রবেশ করিল, তখন ইন্দুমতী তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কুমার ভবানীপ্রসাদ আসিয়াছেন যে! চল, আমরা এ স্থান হইতে পলাইয়া যাই।" এই কথা বলিয়াই ইন্দুমতী অতি ক্ষিপ্রপদে উদ্যানের অপর প্রান্ত দিয়া বাটির পশ্চাদ্ভাগে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী পুষ্পপূর্ণ সাজি লইয়া আনত-বদনে ধীর পাদ-ক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

যুবরাজ আজ আর কৃষ্ণবল্লভের সহিত দেখা করিলেন না। তিনি সেই উদ্যান-পথে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া কোন গোপন আবেগ ও চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

এক বৎসর হইল মথুরাসিংহ কল্যাণীর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। কল্যাণী মথুরাসিংহের বা তাঁহার ভ্রাতার কোন সংবাদই পাইলেন না। তিনি সময়ে সময়ে ভাবিতেন—কাকা কি আমায় জনমের মত এইস্থানে রাখিয়া গেলেন। কখনও কখনও তাঁহার মনে হইত—হয়ত তিনি কোন বিপদে পড়িয়াছেন, নতুবা এতদিনে একবারও আমার কাছে আসিতেন। কখনও কখনও তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইত। তখন তিনি নিজের মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন, "মথুরাসিংহ সাহসী, কর্ম্মী, বীরপুরুষ। তিনি যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার একটা শেষ না করিয়া কখনই ফিরিতে পারেন না। দেখা যাক্, ভগবানের কৃপায় আমাদের ভাগ্যের কোন পবিবর্ত্তন হয় কিনা।"

মথুরাসিংহ কল্যাণীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া অশ্ব দুইটি সঙ্গে করিয়া রায়পুর পরিত্যাগ করিলেন এবং মহানদীর তটদেশ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। যেখানে রাজা বীরসিংহ সপরিবারে মোগল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেখানে পরদিন বেলা দ্বিতীয় প্রহরে আসিয়া পৌঁছিলেন। দূর হইতে মোগল-শিবির দেখিতে না পাইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন যে, এখনও সেখানে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইবে, তখন পথপার্শ্বে রক্তাক্তকলেবর ভূপতিত এক মোগল-সৈনিককে দেখিতে পাইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সেই মহাশ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন, কিন্তু আজ তথায় মোগল-প্রহরীর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। সেইস্থানে মথুরাসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং

দুইটি অশ্বকে একটি বৃক্ষশাখায় আবদ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ মোগলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একখণ্ড ভূমি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে স্থান দেখিয়া তিনি সহজেই বুঝিলেন যে, মোগল-সৈন্য শিবির স্থাপন করিয়া সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিল এবং পূর্ব্বরাত্রে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তিনি অনুমান করিলেন যে, হিন্দু-সৈন্যের সহিত সংঘর্ষই মোগল-সৈন্যের স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ।

মথুরাসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিয়া অতি ধীরে ধীরে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের মৃতদেহের মধ্যে মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখনও কাহার গায়ে হাত দিতেছিলেন, কখনও কাহার ক্ষতস্থান বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চাপিয়া ধরিতেছিলেন, আবার কখনও কোন শরীরে স্পন্দনের চিহ্ন অনুভব করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার মনে হইল, যেন একজন সৈনিক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া হাসিয়া উঠিল। মথুরাসিংহ ছুটিয়া গিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলেন—গায়ে হাত দিলেন, দেখিলেন, সে শরীর পাথরের মত শীতল, কাঠের মত কঠিন। তখন সেই হাসিমুখ দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, সেই বীরোত্তম প্রভুভক্ত সৈনিক রাজার শরীর রক্ষা করিতে করিতে রাজ-সমক্ষে হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিয়াছে। এত অধঃপতনের পরও হিন্দু-সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভয়ে হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ-অন্তঃকরণে ভাবিলেন—এখনও হিন্দুর শৌর্য্য, বীর্য্য নষ্ট হয় নাই, কেবল জাতীয়তা ও ধর্ম্মভাবের অভাবে আজ তাহাদের এই অবনতি হইয়াছে ; এ অবনতি কোথায় গিয়া পৌঁছিবে, তাহার কোন স্থিরতাই নাই। অতি স্নেহভরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া পুনরায় মথুরা-সিংহ অগ্রসর হইলেন।

শঙ্কিতচিত্তে ধীরপদক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে যথায় রাজা বীরসিংহ

স্ত্রীর সহিত শোণিতসিক্ত ভূমি-শয্যায় চির-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—উভয়েই বক্ষে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিলেন। মথুরাসিংহ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রাজা বীরসিংহের পদতলে বসিলেন এবং নানারূপ কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া রাজা ও রাণী অপত্যনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। আজ মথুরাসিংহ সন্তানের মতই তাঁহাদের পদতলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃখ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, সেই পবিত্র দেহ সজীব জ্ঞান করিয়া চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—"কেবল কল্যাণীর জন্যই আমায় জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে এবং অবশিষ্ট জীবন আমি কল্যাণীর রক্ষা ও সুখের জন্যই নিয়োজিত করিব।"

মথুরাসিংহ উঠিলেন। সহসা তাঁহার হৃদয়মধ্যে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। যদি অরুণসিংহের দেহও এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার সকল শক্তি এক মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইল। চিন্তায় অভিভূত হইয়া তিনি তথায় বসিয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ তদবস্থায় থাকিয়া বিপদহারী ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে মথুরাসিংহ পুনরায় প্রত্যেক মৃতদেহের নিকট অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কোথাও অরুণসিংহের দেহ দেখিতে পাইলেন না। যেখানে মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়াছিল, তথায় সেই প্রস্তর-সম কঠিন শীতল দেহগুলি একে একে অপসারিত করিয়া অনুসন্ধান করিলেন—অরুণসিংহকে পাইলেন না। তখন তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রাজা ও রাণীর মৃতদেহের সৎকারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি অশ্ব দুইটি খুলিয়া আনিয়া শবের নিকট আসিলেন এবং তদুপরি মৃতদেহদ্বয় স্থাপিত করিয়া নদীতীরাভিমুখে লইয়া চলিলেন।

মৃতদেহ দুইটি সম্মুখে রাখিয়া মথুরাসিংহ তথায় উপবেশন করিলেন।

তিনি দেখিলেন—অনন্ত নীলাকাশ তাহার উপর চাহিয়া আছে। নানাবিধ পক্ষী সেই অনন্ত নীল সমুদ্রে সন্তরণ দিতেছে। দুই একটি পক্ষী মণ্ডলাকারে উড়িতে উড়িতে অতি ঊর্দ্ধে উঠিবাব চেষ্টা করিতেছে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যোত্তাপে শ্রান্ত পক্ষীগণ নদীতটস্থ বৃক্ষসমূহে বিশ্রাম করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে কূজন করিতেছে। বর্ষাপগমে নদীসলিল স্বচ্ছ হইয়া তর-তর-বেগে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেইখানে বসিয়া প্রকৃতির এই মোহন ছবি তিনি দেখিলেন। বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি যে কিছু দেখিতেছিলেন তাহা নহে; তাঁহার চক্ষের সম্মুখে এই সকল দৃশ্য ভাসিতেছিল। তাঁহার চিন্তাশূন্য-মনে কত কথাই জাগিতেছিল, আবার কত কথাই মিলাইতেছিল। সংসারে নিত্য এ ঘটনা ঘটিতেছে মনে হওয়ায় কখনও কখনও তাহার চিত্ত একেবারে দুঃখশূন্য হইতেছিল; আবার কখনও মনে হইতেছিল—এত দুঃখ বোধ হয় অন্যের ভাগ্যে ঘটে না। যে আজন্ম দুঃখী, তার দুঃখের ভার আরও বাড়াইবার জন্যই বুঝি ভগবান্ তার ভাগ্যে এত দুঃখ দিয়াছেন। যখন তাঁহার মধ্যে আত্ম-চিন্তা আসিল, যখন দুঃখে বিমূঢ় হইয়া তিনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, তখন কোথাও দুঃখের কোন চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার দুঃখে কেহই কোন সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। তখন গভীর দুঃখে মথুরাসিংহ শব-পার্শ্বে বসিয়া প্রকৃতির এই ঔদাসিন্য লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। নদীতীরে একখানি তরী ভাসিয়া আসিল, তাহাব নাবিক দুইটীকে অর্থে ও মিষ্টবাক্যে বশীভূত করিয়া মথুরাসিংহ নিজের সাহায্যার্থে ডাকিয়া লইলেন। তাহারা মনমধ্যে কাষ্ঠ আহরণার্থ গেল ও মথুরাসিংহ এই অবকাশে জল-সন্নিকটে একটি চিতা সজ্জিত করিতে লাগিলেন। চিতা প্রস্তুত করিয়া রাজা ও রাণীর দেহ তদুপরি স্থাপিত করিলেন। তারপর স্বীয় গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া মণিমাণিক্যাদি-জড়িত অলঙ্কারগুলি খুলিয়া চিতার উপর রাজা ও

রাণীর পদতলে একে একে রাখিয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন। কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত হইল দেখিয়া মথুরাসিংহ নাবিকদিগকে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং চিতাস্থিত মূর্ত্তিদ্বয়ের সম্মুখে নতজানু হইয়া ভগবান বিশ্বনাথের ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন।

দিবা অবসান হইল। সূর্য্যদেব সারাদিবস অর্দ্ধপৃথিবীবক্ষে কিরণ-বর্ষণ করিয়া প্রভামণ্ডিত হইয়া অশ্রান্তদেহে পশ্চিম গগনপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। যখন এক গগন সূর্য্যের অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া মসীবর্ণ ধারণ করিল, তখন অন্য গগন সূর্য্যের আবির্ভাবে নানা বর্ণ-মাখা আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিল। একের বিনাশে অন্যের অভ্যুদয় হইল। এক গগনে সূর্য্য অস্তমিত হইলে অন্য গগনে সূর্য্য উদিত হইলেন। সূর্য্যদেবের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে নদীতট, নদীবক্ষ, চতুর্দ্দিকস্থ বনভূমি গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইল। কেবল সেই মহাশ্মশান চিতাগ্নিতে তখনও আলোকিত হইয়া রহিল। এই চিতাগ্নি কেবল যে শ্মশানভূমি আলোকিত করে তাহা নহে; ইহাই দুঃখশোকাভিভূত অন্ধকারময় মানব-জীবনে শান্তির আলোক প্রজ্জ্বলিত করে। এই চিতাগ্নি সংসারের সকল পার্থক্য বিদূরিত করে; ধনী দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিৎ, শিক্ষিত অশিক্ষিত—সকলকেই ইহা সমভাবে আলিঙ্গন করে। এই শ্মশানাগ্নিই হৃদয়ের মলিনতা দূর করে, জগতের নশ্বরত্ব প্রচার করিয়া নিত্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মথুরা-সিংহ সেই চিতাগ্নি অবলম্বন করিয়া মহাশ্মশানে একাকী বসিয়া রহিলেন।

সেই যুগলদেহ ভস্মীভূত করিয়া চিতাগ্নি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সহসা নির্ব্বাপিত হইল। দেবভাবাপন্ন পবিত্রকীর্ত্তি সেই মানবদ্বয়ের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের মলিনতা আসিয়া যেন সেই স্থান অধিকার

করিল; নদী-সৈকত গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। তখন মথুরাসিংহ কলসী করিয়া জল আনিয়া চিতার উপর সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন। অঙ্গাররাশি শীতল হইলে তিনি প্রথমে কাষ্ঠখণ্ড জলে ভাসাইয়া দিলেন এবং তারপর ক্রমশঃ ভস্মাবশেষ পর্য্যন্ত নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া জলদ্বারা এরূপভাবে চিতা বিধৌত করিলেন যে, এই হিংসাদ্বেষময় পৃথিবীতে তার চিহ্নমাত্রও রহিল না। তারপর স্বয়ং অবগাহন করিয়া আর্দ্রবসনে উপরে উঠিয়া যেখানে অশ্ব দুইটি দণ্ডায়মান ছিল তথায় উপস্থিত হইলেন। অশ্বের সাজসজ্জা উন্মোচন করিয়া তাহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং সাজ নদীবক্ষে ভাসাইয়া দিয়া একাকী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কোথায় যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া যথায় মোগল-শিবির স্থাপিত ছিল, তথায় গিয়া উপবেশন করিলেন।

উষালোকে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে মথুরাসিংহ দেখিলেন যে, একস্থানে রন্ধনের জন্য অনেকগুলি চুল্লী রহিয়াছে। তাহার বহুদূরে আর একটি ক্ষুদ্র চুল্লী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন তিনি অনুমান করিলেন, মোগল-শিবিরে মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন জাতির লোক আছে; নচেৎ স্বতন্ত্র রন্ধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে কেন! চুল্লী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা আর্দ্র বলিয়া বোধ হইতেছে এবং চুল্লীগাত্র সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয় নাই। তাহা হইতে তিনি স্থির করিলেন যে, এই চুল্লী নূতন প্রস্তুত হইয়াছিল এবং দুই একবারের অধিক ব্যবহৃত হয় নাই। তখন অরুণসিংহ মোগলকর্তৃক বন্দীরূপে গৃহীত হইয়াছে এই সন্দেহ মথুরাসিংহের চিত্তে উদিত হইল।

অশ্বক্ষুরচিহ্ন এবং বিমর্দ্দিত লতাগুল্মাদি লক্ষ্য করিয়া মথুরাসিংহ বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মথুরাসিংহ মোগল-সৈন্যের অনুসরণ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তিন দিন অবিশ্রান্তভাবে পথবাহন করিয়া মোগল-শিবিরে পৌঁছিলেন। অত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং অনশন ও অর্দ্ধাশনজনিত শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি অবসন্ন-দেহে মোগল-শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শারীরিক কষ্ট অত্যন্ত অধিক হইলেও রাজকুমারকে দেখিবার জন্য তখন তাঁহার এত আগ্রহ হইয়াছিল যে, ছুটিয়া সৈন্যশিবির তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু যদি কেহ তাঁহার অভিলাষ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার এবং রাজকুমারের সমূহ বিপদ ঘটিবে মনে করিয়া তিনি চিত্ত সংযত করিলেন এবং ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। একজন সৈনিকের নিকট গিয়া তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা জানাইলেন।

যখন সৈনিক তাঁহাকে অধ্যক্ষের নিকট লইয়া গেল, তখন তিনি অধ্যক্ষকে অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি অত্যন্ত দরিদ্র, সংসারে আপনার বলিতে আমার কেহ নাই অথচ আমার কাজ করিবার শক্তি আছে; আমায় কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিব। কেবল এইমাত্র প্রার্থনা যে, হিন্দুর মত থাকিবার আদেশ আমায় দিবেন।"

সৈন্যাধ্যক্ষ দেখিলেন, লোকটি বলবান্ এবং সে যেভাবে একবস্ত্রে আসিয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে অতি দুরবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হইল। সুতরাং দয়াপরবশ হইয়া তিনি আগন্তুককে লইয়া মোগল-সেনাপতির

নিকট গেলেন। মোগল-সেনাপতি সেই অনাশ্রিতকে আহার্য্য দিবার আদেশ করিয়া তাহাকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, "এই ব্যক্তি হিন্দু বন্দীর পরিচর্য্যা করিবে।"

মথুরাসিংহ হিন্দু বন্দীর নাম শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইলেন, কিন্তু সকল আগ্রহ দমন করিয়া ক্ষুধাশান্তির জন্য কিঞ্চিৎ আহার প্রার্থনা করিলেন। মোগল-শিবিরে হিন্দুর উপযোগী খাদ্য ছিল না বলিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ এই ব্যক্তিকে বন্দী-শিবিরে লইয়া গিয়া তথায় আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া খাইতে বলিলেন। প্রথমে তিনি বন্দীকে বলিলেন, "এই ব্যক্তির জাতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংবাদ লইয়া যদি ইহার হাতে খাইতে তোমার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এই লোক তোমার সেবায় নিযুক্ত হইবে। তোমাকে নিতান্ত বালক ও রন্ধনে অপটু দেখিয়া সেনাপতি এই অনুগ্রহ করিয়াছেন।" তারপর মথুরাসিংহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার জাতি-ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিচয় দাও। যদি উনি সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে ইঁহার সেবায় তুমি নিযুক্ত থাকিবে।"

মথুরাসিংহ বন্দীর নিকটবর্ত্তী হইয়া আত্মপরিচয় দিবার ছলে বলিলেন, "আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়, নাম মথুরাসিংহ। আমি মোগল-শিবিরে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছি। যদি আপনার আদেশ হয়, তাহা হইলে আপনার জন্য রন্ধন করিয়া দিতে পারি।" মথুরাসিংহ বন্দীকে দেখিয়া কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ না করিয়া অতি সরলভাবে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলেন।

বন্দী অরুণসিংহ সহসা মথুরাসিংহকে দেখিয়া এবং তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ যে জীবিত আছেন তাহা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশা করেন নাই। সুতরাং মথুরাসিংহের এই প্রস্তাবে প্রথমে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তৎপরে

কি উত্তর দিতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। পরে একটু চিন্তা করিয়া বন্দী বলিলেন, "তুমি এই শিবিরে ভৃত্যরূপেই নিযুক্ত থাকিও। আমি রন্ধন করিতে পারি না বলিয়া তোমার সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে, ইহা ব্যতীত আমার অন্য কোন কার্য্য তোমায় করিতে হইবে না।"

নবাগত ভৃত্যের সহিত বন্দীর এরূপ কথাবার্ত্তায় সৈন্যাধ্যক্ষ কোন সন্দেহ করিলেন না; এবং নবাগত হিন্দু ভৃত্যের পরিচর্য্যা গ্রহণ করিতে বন্দী সম্মত হইয়াছেন, এই সংবাদ সেনাপতির নিকট প্রেরণ করিলেন; মথুরাকে সেইখানে আপন আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লইতে আদেশ করিলেন।

মথুরাসিংহ প্রত্যহই অরুণসিংহের নিকট যাইতেন এবং তাঁহার সেবা করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। অরুণ সর্ব্বদা এরূপভাবে প্রহরী-বেষ্টিত থাকিতেন যে, মথুরা একবারও তাঁহার সহিত অন্তরের কথা বলিবার সুযোগ পাইতেন না। তিনি প্রত্যহই পাচকের মত বন্দী-শিবিরে আসিয়া রন্ধনাদি করিতেন এবং তাঁহাকে খাওয়াইয়া ও নিজে খাইয়া স্বস্থানে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার অন্তরের সকল কথা অন্তরেই থাকিয়া যাইত।

এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইল দেখিয়া মথুরা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, এইভাবে আরও কিছুদিন বন্দী থাকিলে অরুণের রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। একবার মোগল-সম্রাটের হস্তে নিপতিত হইলে মৃত্যু ভিন্ন তাহার উপায়ান্তর থাকিবে না এবং যেরূপ শুনিতেছি তাহাতে মনে হয় সম্রাট শীঘ্রই সসৈন্যে আসিয়া এই সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবেন। মথুরা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। একবার তিনি ভাবিলেন, সম্রাটের আগমনের পূর্ব্বে যদি অরুণকে রক্ষা করিতে না পারি। মথুরার চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইয়া গেল। তিনি চিত্ত স্থির করিয়া বিপদভঞ্জন নারায়ণের নিকট অরুণের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সহসা একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে চারিজন অশ্বারোহী মোগল-শিবিরে প্রবেশ করিল এবং সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অশ্বারোহীগণ শিবির ত্যাগ করিয়া যাইতে না যাইতেই সেনাপতি তূর্য্যধ্বনি-দ্বারা শিবির উত্তোলন করিবার সঙ্কেত করিলেন এবং সৈন্যমধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন যে, অদ্য রাত্রিশেষে যাত্রা করিয়া দৌলতাবাদ অভিমুখে গমন করিতে হইবে।

মথুরা এ আদেশ শুনিলেন এবং এই রাত্রেই অরুণকে লইয়া পলায়ন করিবেন স্থির করিলেন।

বর্ষা যাপনের জন্য মোগল-সৈন্য তথায় প্রায় চারিমাস কাল বসতি করিতেছিল। বহুদিন তথায় থাকিতে হইবে বলিয়া প্রত্যেক সৈন্য স্ব স্ব আরামের জন্য সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং অদ্য রাত্রেই এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, এই আদেশ প্রচারিত হওয়ায় সৈন্যেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং অতি ক্ষিপ্রহস্তে শিবির তুলিতে আরম্ভ করিল। কতিপয় সৈনিক রাত্রের আহার প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইল। অনেকে রসদাগার হইতে রসদ বাহির করিয়া বহনযোগ্য করিয়া বাঁধিতে লাগিল। কেহ কেহ অশ্ব, উষ্ট্র, বলদ সজ্জিত করিয়া স্থানে স্থানে রক্ষা করিতেছিল। সৈন্য-মধ্যে এখন আর কোন শৃঙ্খলাই রহিল না। অতি অল্পসংখ্যক মশাল প্রস্তুত ছিল; তাহা প্রজ্জ্বলিত হইলে সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যভাগ আলোকিত হইল। কিন্তু সেই বিপুল-বাহিনীর অধিকাংশই নক্ষত্রালোকে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল।

নিয়মিত সময়ে মথুরা বন্দীশিবিরে যাইয়া রন্ধন-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সেখানেও শিবির উত্তোলনের কার্য্য হইতেছিল এবং তখন বন্দীকে রক্ষণাবেক্ষণের কোন বন্দোবস্তই ছিল না। সকলেই শিবির উত্তোলন করিতে ব্যস্ত ছিল এবং বন্দী অরক্ষিত অবস্থায় বসিয়া-

ছিলেন। মথুরা ভাবিলেন, এই সুযোগে পলায়ন করিতে পারিলে দুই-জনেই রক্ষা পাইব, নচেৎ অরুণের সহিত তাঁহারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

মথুরা রন্ধন করিতে করিতে কলস স্কন্ধে করিয়া একবার জল আনিতে গেলেন এবং যে স্থানে অশ্ব থাকিত তথায় গিয়া দুইটি অশ্ব খুলিয়া বনান্তরাল দিয়া বন্দী-শিবিরের অনতিদূরে বৃক্ষতলে বাঁধিয়া রাখিলেন। কিছু পরে জল লইয়া শিবিরে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় শিবিরের নিকটে প্রোথিত এক কাষ্ঠখণ্ডে এরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন যে, জল-কলস স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। প্রহরী অন্য কার্য্য করিতে করিতে ইহা দেখিতে পাইল, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ করিল না। ইহা দেখিয়া একখণ্ড প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ হস্তে করিয়া মথুরা বন্দীর নিকট আসিলেন এবং কিরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখাইবার ছলে অরুণকে বলিলেন, "সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে অশ্ব প্রস্তুত; তুমি এই নির্ব্বাপিত কাষ্ঠখণ্ড হস্তে করিয়া চুল্লীর নিকট যাও। চুল্লীর মধ্যে কাষ্ঠখানি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া কলস-স্কন্ধে জল আনিবার ছলে বৃক্ষতলে গিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নদীতীরে পশ্চিম-মুখে পলায়ন কর। আমি তোমার স্থান অধিকার করিয়া অন্ধকারে বসিয়া থাকিব এবং সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করিব। যাও, আমার জন্য কোনরূপ চিন্তা করিও না।"

অরুণ সেইরূপই করিলেন। মথুরা দেখিলেন যে, প্রহরীরা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিল না। নক্ষত্রালোকে দূরস্থিত মনুষ্যের স্থূল অবয়ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু কাহাকেও চিনিতে পারা যায় না। প্রহরীরা দেখিল, বন্দী বসিয়া আছে এবং চুল্লীমধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে ও তাহার উপরে রন্ধন-পাত্রে রন্ধন হইতেছে; তাহারা কোন সন্দেহ করিল না। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে মথুরা ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া শিবির-সন্নিকটস্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলি সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—"বন্দীর আহার হইয়াছে?"

মথুরা উত্তর দিলেন যে, সেনাপতির আদেশে দুইজন সৈনিক আসিয়া বন্দীকে এইমাত্র লইয়া গিয়াছে ; বোধ হয়, তিনি এখন সেনাপতির শিবিরে। তাঁহার খাবার তৈয়ারী হইয়াছে।

প্রহরীর সন্দেহ হইল। তাহাদের মধ্যে একজন একখানি তরবারি লইয়া সেনাপতির শিবিরের দিকে গমন করিল। অপর প্রহরী হস্তস্থিত কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে লাগিল।

যে স্থান হইতে প্রথম প্রহরী তরবারি লইল, তথায় দ্বিতীয় প্রহরীর তরবারিখানি রহিয়াছে মথুরা দেখিলেন। তিনি প্রথম প্রহরীর সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইয়া "এইপথে বন্দীকে লইয়া গিয়াছে" বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার পথে অন্ধকার-মধ্যে ভূপতিত তরবারিখানি তুলিয়া লইয়া তিনি অতি সাবধানতার সহিত দ্বিতীয় প্রহরীর নিকট গিয়া সহসা তাহার গলদেশে আঘাত করিলেন এবং মস্তক ভূমিস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন। নিমেষমধ্যে মথুরা পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অশ্ব বন্ধনমুক্ত করিয়া তীব্রবেগে নদীতীর দিয়া ধাবিত হইলেন। মোগল-প্রহরীর তরবারি তাঁহার হস্তেই রহিয়া গেল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে যখন ক্ষীণ চন্দ্রমা আকাশ-পটে উদিত হইলেন, তখন সেই অস্পষ্টালোক মথুরা দেখিলেন, দূরে নদীতীর দিয়া এক অশ্বারোহী মৃদুগতিতে যাইতেছে। বেগ সংযত না করিয়া অশ্বচালনা করায় তিনি অচিরেই অশ্বারোহীর সহিত মিলিত হইলেন। পুনরায় প্রায় একপ্রহরকাল অশ্বচালনার পর রাত্রিশেষে মথুরা ও অরুণ-সিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং অশ্ব দুইটি একটি বৃক্ষশাখায় আবদ্ধ করিয়া বিশ্রামলাভার্থ সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মথুরা দেখিলেন যে, তাঁহারা নিবিড় বনমধ্যে

আসিয়া পড়িয়াছেন। মনুষ্যসমাগমের কোন চিহ্নই তাঁহারা কোথাও দেখিতে পাইলেন না। রাত্রিশেষে যখন তাঁহারা অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন, তখন কেন যে ব্যাঘ্র ভল্লুকে হত্যা করে নাই ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কোন বন্যজন্তুর দ্বারা আক্রান্ত না হওয়ায় ভগবানের অপার করুণা অনুভব করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে মথুরাসিংহ অরুণকে লইয়া গ্রামের অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, কল্যাণী সম্বন্ধে কোন কথাই কুমারকে বলিবেন না। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে কখন কি অবস্থা মানুষের ঘটে তাহার কোন স্থিরতাই নাই। সুতরাং কল্যাণী জীবিতই আছে এ কথা শুনিলে অরুণ তাঁহার প্রিয় ভগ্নীকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইবেন। কিন্তু যদি রায়পুর যাইবার পথে পুনরায় কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার মনোকষ্টের আর সীমা থাকিবে না ভাবিয়া মথুরা তাঁহাকে কোন কথাই বলিলেন না। রাজা ও রাণীর অন্তিমক্রিয়াও যে তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাও গোপন করিলেন।

সকল শোকবেগ সম্বরণ করিয়া মথুরা গ্রামের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শীতের প্রারম্ভে মথুরাসিংহ অরুণকে লইয়া রায়পুরে উপস্থিত হইলেন। মোগল-শিবির হইতে পলায়ন করিবার পর তাঁহাদিগকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। মথুরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিতেন এবং সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণ করিয়া রাজা বীরসিংহের পুত্র

জীবনধারণ করিতেন। তাঁহাকে খাওয়াইয়া অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকিত তাহাই মথুরা খাইতেন। হৃদয়ে অনেক আশা লইয়া তিনি অরুণকে সঙ্গে করিয়া রায়পুর উপনীত হইলেন।

মথুরা নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, চতুর্দ্দিকে উৎসবের আয়োজন হইতেছে। নগরবাসীদিগের আনন্দের সীমা নাই, উৎসাহের অন্ত নাই। আবাল-বৃদ্ধ সকলেই আনন্দে উন্মত্ত; সকলেরই মুখ উজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল। অমরনাথের একমাত্র পুত্র ভবানীপ্রসাদের বিবাহে যাহাতে নগরের সকলে যোগ দিতে পারে সেইজন্য রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ বিতরিত হইয়াছিল। দরিদ্র প্রজা সেই অর্থ-সাহায্য পাইয়া উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। রাজপথপার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহে উজ্জ্বল আলোক-দানের ব্যবস্থা হইতেছিল। রাজপথের দুইপার্শ্বে লতামণ্ডিত কুসুম-মালিকা সমান্তরালভাবে সজ্জিত হইয়া নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে পুষ্পমাল্য বিবিধভাবে লম্বিত হইয়া মৃদুমন্দ-পবনে দুলিতেছিল। কোনও স্থানে আবার সূক্ষ্ম সূতায় নির্ম্মিত জালের উপর শোলার হাঁস, শোলার পদ্ম, শোলার পাতা এমনভাবে রক্ষিত হইয়াছিল যে, দূর হইতে সেগুলি আকাশে ভাসমান বলিয়া বোধ হইতেছিল। রাজপথের মধ্যে মধ্যে তোরণদ্বার প্রস্তুত হইয়াছিল এবং সেই সকল তোরণদ্বারের পার্শ্বস্থিত নহবৎখানা হইতে বিবিধ সুরবিন্যাসে নহবৎ বাজিতেছিল। বাসভবন হইতে কোমল-কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর আনন্দ-সঙ্গীত আকাশতল মুখরিত করিতেছিল। তাহারই অনুরণন-ধ্বনি আকাশতলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দূরাগত অভ্যাগত-বৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিতেছিল। বালকবালিকাগণ নানা বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া রাজপথে ছুটাছুটি করিতেছিল। যুবকেরা ব্যস্ত হইয়া রাজপথ সুসজ্জিত করিবার জন্য নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। রাজপথপার্শ্বস্থ প্রত্যেক গৃহস্থই স্বীয়

বাসভবন মার্জ্জিত ও সুসজ্জিত করিতেছিল। রাজভবন হইতে শোভা যাত্রা বাহির হইয়া যাহাতে নগরের সকল রাজপথ দিয়া অবাধে যাইতে পারে তাহার জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছিল। রাজা অমরনাথের একটি মাত্র আদেশ তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল এবং সেইজন্যই তাহারা আপনা হইতেই আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ-হৃদয়ে নগরের শোভা-বর্দ্ধনের জন্য কার্য্য করিতেছিল। বৃদ্ধেরা স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন এবং সময়ে সময়ে যুবকদিগকে নানা উপদেশ দিতেছিলেন।

এইরূপ অবিরাম আনন্দস্রোতের মধ্য দিয়া অতি দীনবেশে মথুরা ও অরুণ যাইতেছিলেন, পথে যাইতে যাইতে মথুরা দেখিলেন, একস্থানে সমবেত কতিপয় বৃদ্ধের মধ্য হইতে একজন সঙ্কেত করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিতেছেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে বৃদ্ধেরা বলিলেন—"দেখিতেছি তোমরা বড় দীন। রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ বিতরিত হইতেছে; সেখানে যাও, প্রচুর অর্থ পাইবে। রাজা অমরনাথের একমাত্র পুত্র ভবানীপ্রসাদের বিবাহে নগরে কাহারও দুঃখ থাকিবে না। যে কর আমরা এতদিন রাজকোষে জমা দিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় তাহার অধিকাংশই এই বিবাহোপলক্ষে বিতরিত হইবে। রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ প্রজার হস্তে এইরূপেই আসিয়া থাকে এবং তাহার প্রতিদানে প্রজা আপন আপন শক্তি, সামর্থ্য এবং প্রাণ পর্য্যন্ত রাজার জন্য উৎসর্গ করিয়া থাকে। তোমরা রাজভাণ্ডারে যাও, না চাহিতেই প্রচুর অর্থ পাইবে।"

মথুরা সবই শুনিলেন, কিন্তু কোন কথা তাঁহার চিত্তে স্থান পাইল না। তিনি কেবল মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"ভবানীপ্রসাদের বিবাহ; কাহার সঙ্গে? কোথায়? যে ভবানীপ্রসাদ কল্যাণীর আরাধ্য,

কল্যাণীর হৃদয়রাজ্যাধিষ্ঠিত দেবতা, তিনি আজ কোন্ ভাগ্যবতীকে অনুগৃহীত করিতে যাইতেছেন ?" মথুরা অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিলেন। দুঃখে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছিল। রাজা অমরনাথের দ্বারে ভিক্ষার প্রস্তাব শুনিয়া অরুণ মর্ম্মে মর্ম্মে ক্ষুব্ধ হইলেন।

দুঃখে বিমূঢ় হওয়া মথুরার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি সংযতচিত্তে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় এবং কাহার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হইবে জানিতে পারি কি ?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"কে তিনি জানি না। শুনেছি অপ্সরার মত তাঁর মূর্ত্তি, দেবীর মত তাঁর পবিত্রতা। অমানুষী প্রতিভা লইয়া অকস্মাৎ রাজস্বসচিব কৃষ্ণবল্লভের ভবনে আবির্ভূতা হইয়াছেন ; কোথা হইতে আসিয়াছেন বলিতে পারি না।" পুনরায় বিস্ময়োৎপাদক-স্বরে বলিলেন, "বোধ হয়, তিনি স্বর্গরাজ্যভ্রষ্টা কোন দেবীই হইবেন।"

কাহার সহিত ভবানীপ্রসাদের বিবাহ হইতেছে মথুরা তখন বুঝিলেন এবং ভগবানের অপার করুণা স্মরণ করিয়া উদ্দেশ্যে তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সেই মঙ্গলময়ের বিধানে আত্মনির্ভর করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে সেই দেবীর সহিত যুবরাজের বিবাহ হইবে ?"

গল্প করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "আগামী কল্য রাত্রে।"

বৃদ্ধের সহিত কথোপকথনের সময় মথুরার উৎসাহপূর্ণ ও হর্ষোৎফুল্ল বদনমণ্ডল দেখিয়া অরুণ বিস্মিত হইলেন। তিনি কোন কারণ স্থির করিতে পারিলেন না ; অথচ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও তাঁহার হইল না। তিনি মথুরার চরিত্র জানিতেন। কখন তাঁহার আনন্দ হয় এবং কখন তাঁহার দুঃখ হয়, কি দেখিলে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং কি শুনিলে তাঁহার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে তাহা সাধারণের বোধাতীত। ভিক্ষালব্ধ অপ্রচুর অন্নে প্রভু-পুত্রের ক্ষুন্নিবৃত্তি

করিয়া স্বয়ং মাত্র জলপানপূর্ব্বক অনশনে দিবাভাগ যাপন করিতে করিতে যখন উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া সান্ধ্য-গগনের রক্তিম রবির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, তখন মথুরাকে আহ্লাদে দিশাহারা হইতে অরুণ অনেকবারই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মোগল-শিবিরে দাসত্ব করিবার সময় বর্ষাগমে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের মধ্যে যখন তাঁহাকে প্রভুর আদেশে কর্ম্ম করিতে হইত, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। যখন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিত ও মুহুর্মুহুঃ অশনি-পাতের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িত, তখন অরুণ দেখিতেন যে, মথুরা তাহার শিবিরদ্বারে উর্দ্ধনেত্রে প্রশান্ত-চিত্তে দাঁড়াইয়া যেন কি কামনা করিতেছেন; প্রান্তরমধ্যে এরূপ ভয়াবহ সময়েও তাঁহার হৃদয় কখনও ভয়ে বা চিন্তায় অভিভূত হইত না। কিন্তু বর্ষাপগমে যখন আকাশ নির্ম্মল হইয়া আসিত, তখন মথুরার হৃদয়াকাশ তমসাচ্ছন্ন হইত। যখন শারদ-চন্দ্রমা নীলাকাশে উদিত হইয়া স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়া তাপিতের প্রাণে শান্তি প্রদান করিত, তখন তিনি শোকাভিভূত হইয়া সকল সৌন্দর্য্য হইতে নয়ন ফিরাইয়া ভূমিলগ্ন-নেত্র হইয়া থাকিতেন। আবার যখন সেই জ্যোৎস্নারাশি অনাবিল নদীবক্ষে পতিত হইয়া সহস্র খণ্ডে প্রতিফলিত হইত, তখন মথুরা নয়নের জল সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার এরূপ মানসিক পরিবর্ত্তন অরুণ বহুবার দেখিয়াছেন। সুতরাং আজ তাঁহার এই চিত্তপ্রসাদ দেখিয়া তিনি কোন কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন না।

মথুরা নির্ব্বাক্ হইয়া রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন; অরুণ নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন।

ধীরে ধীরে গমন করিয়া তাঁহারা নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে কৃষক-পল্লীতে রাত্রি যাপন করিবেন স্থির করিয়া অরুণকে লইয়া

এক সরোবর-তীরে উপনীত হইলেন এবং তথায় তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া ভিক্ষার জন্য স্বয়ং বহির্গত হইলেন।

আজ নগরের চতুর্দ্দিকেই উৎসব, আনন্দ, ভোজ, দীনদরিদ্রের কুটীরে পর্য্যন্ত আজ ষোড়শোপচারে ভোজের আয়োজন হইয়াছে। মথুরা কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষা চাহিবামাত্র গৃহ-স্বামী বলিল, "আজ তোমায় আর কি ভিক্ষা দিব; আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। এস, তুমি আমাদের বাড়ীতে আহার করিয়া যাও।"

মথুরা সহৃদয় গৃহস্বামীর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-স্বরে বলিলেন, "আমি একা নহি; আমার এক আত্মীয়-পুত্র সঙ্গে আছেন।"

গৃহস্বামী সানন্দে দুইজনকেই আহ্বান করিলেন।

মথুরা সরোবর-তীরে ফিরিয়া আসিয়া সেই সদাশয় গৃহস্থের বাটীতে তাঁহাদের নিমন্ত্রণের কথা অরুণকে বলিলেন। তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নকালে দুইজনে গৃহস্থের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং আহারাদির পর তাঁহার বহির্বাটিতেই রাত্রি যাপন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুপ্রভাত। মথুরাসিংহ প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন—পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ আভাবিশিষ্ট হইয়াছে। উষালোকে তিনি প্রাঙ্গণ-পার্শ্বে কিয়ৎকাল স্থির-ভাবে বসিয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয় শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিল। এক বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় পিতামাতা স্বরূপ প্রতিপালকদ্বয়কে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি ক্রমশঃই উষালোকে অরুণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি কুমারকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন; সেই প্রভুপুত্র তাঁহারই সঙ্গে রহিয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে রাজা বীরসিংহ স্ত্রীপুত্র সমাভিব্যাহারে রাজ্যত্যাগ

করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাও হয়ত ভগবানের কৃপায় সংসাধিত হইবে। কিন্তু কোথায় রাজা বীরসিংহ? কে রাজা অমরনাথের সাহায্যে সেই হৃতরাজ্য উদ্ধার করিবে? কেই বা আজ কল্যাণীকে কুমার ভবানী-প্রসাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন? আর রাজকুমারী কল্যাণি! আজ তোমার কি আনন্দের দিন! কিন্তু তুমি কি কোন আনন্দ অনুভব করিতেছ? কোথায় তুমি আজ পিতৃরাজ্যে সখীজন-পরিবৃত হইয়া প্রাসাদোপরি বসিয়া থাকিবে, কোথায় তোমার সেই কুসুম-কোমল দেহ-লতিকা নানা আভরণে ভূষিত হইয়া অতুল শোভা বিস্তার করিবে, কোথায় তোমার প্রসাধন ও পরিচর্য্যার জন্য আজ শত পুরস্ত্রী ব্যতিব্যস্ত থাকিবে, কোথায় তোমাব ভ্রাতৃসম প্রজাবর্গ আজ বিবাহোৎসবে উন্মত্ত হইয়া সমস্ত নগরী আনন্দধ্বনিতে মুখরিত করিবে—আর আজ কিনা তার পরিবর্ত্তে তুমি কৃষ্ণবল্লভেব সংসাবে থাকিয়া দাসীরূপে সকলের সেবা করিতেছ। তোমার পিতৃরাজ্য অপহৃত হইয়াছে; তোমার পিতামাতা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—তাই আজ তোমায় দীন কাঙ্গালিনীর বেশে সজ্জিত হইতে হইয়াছে। তুমি দুঃখিনী; কিন্তু এ দুঃখ তোমার থাকিবে না। ভগবান আছেন—তিনই তোমার সকল দুঃখ অচিরে দূর করিবেন। আর কল্যাণি, তোমার পিতৃ-অন্নে প্রতিপালিত মথুরা আছে। সে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার সুখের জন্যই নিযুক্ত থাকিবে।

মথুরা উত্থিত হইলেন। স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ নিদ্রাবেশদৃষ্ট ঘটনাবলীর সহিত বাস্তব ঘটনার পার্থক্য দেখিয়া কিয়ৎকাল বিমূঢ় হইয়া থাকে, মথুরা সেইরূপ স্থিরভাবে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার পার্থক্যের উপলব্ধি হইলে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে যাইবার জন্য তিনি গ্রামের

বহির্ভাগে চলিয়া গেলেন এবং তথায় উন্মুক্ত প্রান্তরমধ্যে বসিয়া ভগবানের উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে যখন তাঁহার চিত্ত স্থির হইল তখন তিনি নব-দম্পতীর সুখ কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

গৃহস্থের প্রাঙ্গণে আসিয়া মথুরা দেখিলেন, গৃহস্বামী অরুণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। যখন তিনি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন গৃহস্বামী এইভাবে কথা বলিতেছিলেন—"আকৃতি, কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে ও দীন হীন ভিক্ষুক বলিয়া বোধ হয় না। আমার মনে হয়, তুমি কোন বড় ঘরের ছেলে। গ্রহবৈগুণ্যে আজ তোমায় ভিক্ষা করিতে হইতেছে। তুমি কে, কোথায় তোমার বাস আমায় স্পষ্ট করিয়া বল।"

ইতিমধ্যে মথুরা আসিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রশ্ন শেষ হইলে তিনি অতি বিনয়সহকারে বলিলেন, দীন ভিক্ষুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কেন তাহাদের কুণ্ঠিত করিতেছেন? আপনার ভদ্র-ব্যবহারে এবং দয়ায় আমরা দুইজনেই চিরকৃতজ্ঞ। অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া আর আপনি আমাদিগকে লজ্জিত করিবেন না। যখন আপনি এত সদাশয় তখন আমাদের একটি ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না কি? আমরা আজ এই নগরেই থাকিব মনে করিতেছি। আজ রাত্রে রাজকুমারের বিবাহ; শুনেছি স্বর্গচ্যুতা এক দেবীর সহিত এই বিবাহ হইবে। এই বিবাহে উৎসব দেখিবার ইচ্ছা হইতেছে এবং যদি সম্ভব হয় একবার সেই দেব-দম্পতীকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক করিব মনে করিয়াছি। কিন্তু এরূপ দীনবেশে তথায় গমন করিলে কেহই আমায় বিবাহ-সভায় প্রবেশ করিতে দিবে না। একখানি পট্টবস্ত্র পরিয়া সন্ন্যাসীর বেশে তথায় গমন করিলে নিশ্চয় সে ইন্দ্রপুরীতে প্রবেশাধিকার

পাইব। আজ ভারতের দুর্দ্দিন। কিন্তু এ দুর্দ্দিনেও সন্ন্যাসীর আধিপত্য সমাজ হইতে একেবারেই বিলুপ্ত হয় নাই। যদিও সে সন্ন্যাসী নাই, সন্ন্যাসীর সে হৃদয় নাই, তথাপি সেই গৈরিক আবরণ মাত্র এখনও ধনী নির্ধনের হৃদয়ে সমভাবে ভক্তির সঞ্চার করে। হিন্দুর কোন মঙ্গলকার্য্যে সন্ন্যাসী কখনও গৃহ হইতে বিতাড়িত হইতে পারে না। সুতরাং যদি একখানি পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় পাই, তাহা হইলে সন্ন্যাসীর বেশে সানন্দে সেই দেবপুরীতে যাইতে পারি। বিবাহ-পুরী হইতে যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি ততক্ষণ এই বালক আপনার গৃহেই থাকিবে।"

গৃহস্বামী পট্টবস্ত্র দিতে সম্মত হইলেন এবং সসম্মানে বলিলেন, "এ গৃহ আপনার গৃহ মনে করিয়া যতদিন ইচ্ছা আপনারা এখানে নিঃশঙ্কোচে বাস করিবেন। তাঁহাদের কথার প্রণালী, ভাবভঙ্গী ও ব্যবহার দেখিয়া গৃহস্বামী স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, দরিদ্র হইলেও ইঁহারা মহৎ, শিক্ষিত ও সদ্বংশোদ্ভব।

গৃহস্বামী অন্দরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অভ্যাগত লোক দুইটির স্নান ও জলপানের ব্যবস্থা করিয়া স্বকার্য্যোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মথুরাকে বলিলেন, "বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই আমি কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিব। তাহার পূর্ব্বে আপনারা স্নান করিয়া কিছু জলযোগ করিবেন। বুঝিয়াছি, আপনারা মহৎ—আপনি বলিয়া সম্বোধন করায় ক্ষুণ্ণ হইবেন না।"

দয়ার্দ্রচিত্ত গৃহস্বামীর ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া মথুরা ও অরুণ কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এই কঠোর, নিষ্ঠুরতাপূর্ণ, স্বার্থান্ধ সংসারমধ্যে কোমলস্বভাব মনুষ্য-হৃদয় দেখিতে পাইয়া তাঁহারা আনন্দ অনুভব করিলেন।

অরুণের আহারাদি সম্পন্ন হইলে আহারে অনিচ্ছুক মথুরাসিংহ গৃহস্থপ্রদত্ত পট্টবস্ত্র লইয়া একাকী গৃহত্যাগ করিলেন।—পল্লীর প্রান্তস্থিত

সরোবরে পুনরায় স্নান করিয়া মথুরা শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিলেন এবং জীর্ণ আর্দ্র বসনখানি বৃক্ষাবলম্বিত করিয়া কৃষকপল্লীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় একটি ফল ও কিছু পুষ্প সংগ্রহ করিয়া তিনি কৃষ্ণবল্লভের ভবনোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

রাত্রির প্রথম প্রহরে কুমার ভবানীপ্রসাদের বিবাহ। সন্ধ্যার সময় রাজপ্রাসাদ হইতে শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়া নগরে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবল্লভের ভবনে উপস্থিত হইবে এইরূপ স্থির ছিল। সুতরাং অপরাহ্ন হইতেই নগর ও উপনগর-বাসী অনেকেই শোভাযাত্রা দর্শন করিবার জন্য রাজপথপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। সেই জনতার মধ্য দিয়া মথুরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দূর হইতে মথুরাসিংহ দেখিলেন, কৃষ্ণবল্লভের সুন্দর আলয় সুসজ্জিত হওয়ায় ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি বুঝিলেন, রাজা অমরনাথের অভ্যর্থনার উপযোগী ব্যবস্থা করিতে কৃষ্ণবল্লভ ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কল্যাণীর এখন কি অবস্থা? কল্যাণীর কথা মনে হইবা-মাত্র তাহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন মথুরাসিংহ কোন রকমে আত্মদমন করিয়া বিবাহবাটি হইতে কিছু দূরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মথুরার কর্ণে সে সুন্দর সুর-লহরী প্রবেশও করিল না। তাঁহার চিত্ত তখন কল্যাণীর চিন্তায় পরিব্যাপ্ত ছিল। তখন স্থিরভাবে তিনি ভগবানের নিকট কল্যাণীর সুখ ও শান্তি কামনা করিতেছিলেন।

অকস্মাৎ অশ্বখুরশব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি দেখিলেন, কতিপয় সৈনিক দ্রুতবেগে সেই পথে আসিতেছে। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে তাহারা সেই পথ বাহন করিয়া কৃষ্ণবল্লভের

তোরণমধ্যে প্রবেশ করিল। মথুরা বুঝিলেন, শোভাযাত্রা নিকটে আসিয়াছে এই সংবাদ বহন করিয়া দূত অগ্রে আসিল। তখন সমবেত সকলেই শোভাযাত্রা ও কুমার ভবানীপ্রসাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সকলেই দেখিল, দূরে আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণবল্লভের বাড়ী হইতে আলোকধারীরা বাহির হইয়া রাজপথ-পার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়াইল।

শোভাযাত্রা নিকটবর্ত্তী হইল। বিবিধ বর্ণের পতাকা ধারণ করিয়া পদাতিক সৈন্য অগ্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। তৎপরে বাদকের দল। আবার পতাকাহস্তে অশ্বারোহীর দল যাইতেছিল। তৎপরে পুনরায় বাদকের দল সমস্বরে সুন্দর সুন্দর সুর বাজাইতেছিল। তৎপরে উন্মুক্ত কৃপাণধারী অশ্বারোহী সৈন্য। তৎপশ্চাৎ বাদক ও নর্ত্তকীর দল; ইহারা স্থানে স্থানে অভিনয় করিয়া দর্শকমণ্ডলীর তৃপ্তিসাধন করিতেছিল। তৎপরে শুভ্রবেশধারী বন্দীগণ রাজা অমরনাথ ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিগাথা গান করিতে করিতে যাইতেছিল। তাহাদিগের পশ্চাতে ছত্র-চামরধারী সহচরদিগের মধ্যে পুষ্পাভরণভূষিত শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া কুমার ভবানীপ্রসাদ যাইতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে আবার উন্মুক্ত কৃপাণধারী অশ্বারোহী সৈনিক। তাহার পর রাজা অমরনাথ ও পারিষদ-বর্গ অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেছিলেন। সমগ্র শোভাযাত্রা আলোকিত করিবার জন্য বাহক মধ্যে মধ্যে মশাল লইয়া যাইতেছিল। সকলের পশ্চাতে নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অশ্বে ও যানে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন।

শোভাযাত্রা কৃষ্ণবল্লভের উদ্যানে প্রবেশ করিলে কৃষ্ণবল্লভ বর ও বরযাত্রীদিগকে সাদর আহ্বান করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। শুভ শঙ্খ-ধ্বনি গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

রাজপথের জনতা কিছু কমিলে মথুরা কৃষ্ণবল্লভের উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে উন্মুক্ত কৃপাণধারী প্রতিহারী দুই দিকে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু কেহই পট্টবস্ত্র-পরিহিত পুষ্পহস্ত, ব্রাহ্মণোপম, সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষের গতিরোধ করিল না। মথুরা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন, বরের আসন শূন্য, অথচ সম্প্রদান-সভায় বর ছিল না। স্ত্রী-আচারের জন্য বরকে লইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলেন যে, বর সম্প্রদান-সভায় আসিলেন। কল্যাণী তথায় আনীতা হইলেন তাহাও তিনি দেখিলেন। পারিষদবর্গের সহিত রাজা অমরনাথ সম্প্রদান-সভায় উপস্থিত হইলেন; কৃষ্ণবল্লভও আসিলেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলে রাজা অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যা সম্প্রদান কে করিবে?"

তখন মথুরা অগ্রসর হইলেন। সম্প্রদান-সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"কন্যা সম্প্রদানের জন্য আমিই প্রেরিত হইয়াছি।"

সভাস্থ সকলেই দেখিলেন, অনিন্দ্যসুন্দর-কান্তি-বিশিষ্ট দেবোপম তেজোগর্ব্বশালী, পবিত্র-বসন-পরিহিত প্রশান্তমূর্ত্তিধারী মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। কৃষ্ণবল্লভ দেখিলেন এবং চিনিতে পারিয়া বলিলেন,—"কে মথুরা? তুমি এসেছ!"

"কুমার ভবানীপ্রসাদের করে কল্যাণীকে সমর্পণ করিবার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।" মথুরার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কল্যাণী অবগুণ্ঠনমধ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

যথাশাস্ত্র কন্যাসম্প্রদান-ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে মথুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ভাগ্যবতী নিরাশ্রিতা অনাথিনীরূপে রাজস্বসচিব কৃষ্ণবল্লভের সংসারে থাকিয়া রায়পুরাধিপতির একমাত্র পুত্র ভবানীপ্রসাদের সহিত পুষ্পমাল্য বিনিময় করিলেন, আপনারা কি তাঁহার পরিচয় পাইয়াছেন?"

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণবল্লভ বলিলেন, "ব্যবহারে বুঝিয়াছিলাম যে কন্যা সদ্বংশজাতা ; কিন্তু কুলপরিচয় কিছুই জানি না। শুধু তোমারই মুখে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলাম যে, ইনি তোমার আত্মীয়-কন্যা।"

"আমি এই বিবাহ-সভায় কল্যাণীর কুল-পরিচয় দিব। কল্যাণী ভগবানের নিতান্ত প্রিয় বলিয়াই এই অনাথা অবস্থায়ও রাজ-পুত্রবধূরূপে মনোনীত হইয়াছেন। ভগবানের এই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য যাঁহারা এ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমি চির-বাধিত রহিলাম। আমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আর একটি মাত্র বাসনা পূর্ণ করিয়া আমায় চরিতার্থ করুন। এই নগরের প্রান্তভাগে কৃষকপল্লীতে এক ব্রাহ্মণের বাটিতে এই কন্যার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরুণসিংহ অবস্থিতি করিতেছেন। কৃষকপল্লীতে ইনিই একমাত্র ব্রাহ্মণ বাস করেন ; সুতরাং অনুসন্ধান করিতে কোন কষ্ট হইবে না। তাঁহাকে এইখানে আনাইবার জন্য আপনারা সুব্যবস্থা করুন। আর সেই গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ অতি সদাশয়, অতি দয়ালু। আমার ইচ্ছা, তাঁহাকেও সে সঙ্গে আহ্বান করিয়া এইস্থানে আনয়ন করা হউক।"

এদিকে অরুণ ব্রাহ্মণের সহিত শোভাযাত্রা দর্শন করিয়া আসিয়া আহারান্তে তাঁহার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন, কতিপয় সশস্ত্র অশ্বারোহী প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই অশ্ব হইতে অবরোহণ করিল এবং একজন অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিল—"এই গৃহ-স্বামীব্রাহ্মণকে ও যুবক অরুণসিংহকে রাজস্ব-সচিব কৃষ্ণবল্লভ সাদরে আহ্বান করিয়াছেন। অশ্ব প্রস্তুত রহিয়াছে ; আপনারা অবিলম্বে আমাদের সহিত আগমন করিয়া বাধিত করুন।"

ব্রাহ্মণ ও অরুণ সৈনিকদলের সহিত কৃষ্ণবল্লভের ভবনে উপস্থিত

হইল। ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত বিলাস-সামগ্রী-পরিপূর্ণ বিবাহ-সভা-মধ্যে ভিক্ষুক-বেশী রাজকুমার অরুণসিংহকে উপস্থিত করা হইল।

অকস্মাৎ এরূপ স্থানে আনীত হওয়ায় অরুণসিংহ বিমূঢ় ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং সভাস্থ সকলেই ভিক্ষুকবেশী বালকের আগমন দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তখন মথুরা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"রাজ-নন্দিনী কল্যাণি! এই দেখ তোমার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা অরুণসিংহ তোমার সম্মুখে। কল্যাণীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বলিলেন, শুধু বিপদহারী নারায়ণের কৃপায় তোমার দাদাকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি। আর অরুণ, তোমার স্নেহের ভগ্নী কল্যাণী আজ কুমার ভবানীপ্রসাদের স্ত্রী। ভগবানের অনুগ্রহে আজ তোমার পিতৃ-উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখ এই যে, এ বিবাহ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। এক বৎসর হইল তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তুমি আজ অনাথ, পথের ভিখারী। তোমার রাজ্য শত্রু-কর-কবলিত। এতদিন তোমার দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। কিন্তু আজ হইতে আব তোমার জন্য আমার কোন চিন্তা নাই। তুমি সাদরে তোমার ভগ্নীর সংসারে গৃহীত হইবে।" মথুরা স্তব্ধ হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরতধারে অশ্রুবর্ষণ হইতেছিল। সভাস্থিত সকলেই স্বপ্নোত্থিতের মত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ভাবগদ্‌গদকণ্ঠে মথুরা বলিলেন—"প্রাণাধিক অরুণ! চির-আদরের কল্যাণি। ধর্ম্মপ্রাণ গুণগ্রাহী ভবানীপ্রসাদ! আজ আমার কর্ত্তব্যের বোধ হয় অবসান হইয়াছে। এখন এস, একবার সকলে মিলিয়া ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম করি।"

বিষাদ ও আনন্দের মধ্যে সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

বাহিরে সমাগত মানব-মণ্ডলী হইতে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইতেছিল; তোরণদ্বারে বিবাহ-রাত্রোপযোগী সাহানা-সুরে সানাই বাজিতেছিল; কিন্তু বিবাহ-সভায় সকলেই যেন রুদ্ধশ্বাসে বসিয়াছিলেন। সেখানে এক পবিত্র শান্তি ও ভক্তিপূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল।

হৃদয়ের আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মথুরা কল্যাণী, অরুণ ও ভবানীপ্রসাদকে লইয়া বিবাহ-সভায় এই ভ্রাতাভগ্নীর কুল-পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন।

কল্যাণীর কুলপরিচয় শুনিয়া বিদূষক বিষ্ণুদয়াল যে কিরূপ আনন্দিত হইলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কল্যাণীর প্রতি কুমারের আসক্তির সংবাদ তিনিই প্রথম জানিতে পারেন। কল্যাণীর ব্যবহার ও কৃষ্ণ-বল্লভের সংসারে প্রত্যেক কর্ম্মে তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট ও খ্যাতিসম্পন্না দেখিয়া তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, কল্যাণী সদ্বংশোদ্ভবা ও সুশিক্ষিতা। দেবসেবায় তাঁহার যত্ন, আগ্রহ ও ভক্তি দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি অতি পবিত্রা ও ভগবানে নির্ভরশীলা। তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব, ধীর-স্থির-ভাব ও সর্ব্বকর্ম্মে দক্ষতা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি অতি সুলক্ষণা, অচঞ্চলা ও বুদ্ধিমতী। কন্যা এই সকল গুণের অধিকারিণী মনে হওয়ায় তিনিই প্রথমে এই বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাঁহারই চেষ্টা ও সহানুভূতিতে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। সুতরাং কল্যাণীর কুলপরিচয় পাইয়া যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সকল অনুমান সত্য হইয়াছে, তখন তিনি হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে সকলের মুখ-প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অপার আনন্দে তাঁহার বদনমণ্ডল দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কল্যাণীর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সেই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী কন্যার মুখ সভাস্থিত সকলকে দেখাইয়া সগৌরবে বলিলেন, "পিতৃমাতৃহীনা রাজনন্দিনী কল্যাণী উপযুক্ত পাত্রেই অর্পিতা হইয়াছেন।

পরদুঃখকাতর সহৃদয় ভবানীপ্রসাদ এরূপ স্ত্রী লাভ করিয়া নিশ্চয় অধিকতর সুখী হইবেন।"

সদ্বংশোৎপন্না, সদ্‌গুণশালিনী, শিক্ষিতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ হইল বলিয়া রাজা অমরনাথ সন্তুষ্ট হইলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা বীরসিংহের কন্যা পুত্রবধূ হওয়ায় তাঁহার হৃদয়-নিহিত ক্ষোভ বিদূরিত হইল। হৃষ্টচিত্তে তিনি পুত্রবধূর চিবুক ধরিয়া মস্তক চুম্বন করিলেন এবং স্বহস্তে অরুণের ভিক্ষুকবেশ খুলিয়া রাজকুমারোপযোগী পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া আদরে স্বীয় আসনে স্থান দিলেন। শত্রুহস্তে নিপীড়িত হিন্দু-রাজন্যবর্গের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কুমার অরুণের তত্ত্বাবধান ও সৎশিক্ষার জন্য মথুরাকে তথায় থাকিতে তিনি অনুরোধ করিলেন।

রজনী প্রভাত হইয়া আসিল। পুরস্ত্রীরা বরকন্যা বাসর-ঘরে লইয়া যাইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যা কল্যাণীর ও তাঁহার ভ্রাতার পরিচয় শুনিতে শুনিতে তাঁহারা শোকে ও আনন্দে অভিভূত হইয়া বাসরের আনন্দোৎসবের কথা ভুলিয়াছিলেন। ইন্দুমতী কল্যাণীকে লইবার জন্য সকলের অগ্রে বসিয়াছিলেন। এখন তাঁহার পরিচয় শুনিয়া আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বিবাহসভা-মধ্যে আসিয়া কল্যাণীকে লইয়া গেলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত লতামধ্যে প্রস্ফুটিত কুসুমের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া চয়নোদ্যত বালক গুচ্ছে গুচ্ছে বিকশিত কুসুমের সুন্দর রূপ দেখিতে যেরূপ আনন্দিত হয়, অথবা স্বচ্ছ-সলিলোপরি প্রস্ফুটিত পদ্ম তুলিতে গিয়া বালিকা সুকোমল মৃণাল দেখিতে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হয়, কুমার ভবানীপ্রসাদ কল্যাণীর কুল-পরিচয় পাইয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। কল্যাণীর রূপে তাঁহার হৃদয়ে যেরূপ ভালবাসাব উদয় হইয়াছিল, এখন তাঁহাকে পিতৃ-মাতৃ-হীনা অনাথা দেখিয়া তাহার শতাধিকগুণ স্নেহোদ্রেক হইল। ভবানী-প্রসাদ যখন শুনিলেন যে, তাঁহারই উদ্দেশ্যে যাত্রা কবিয়া কল্যাণী পথিমধ্যে পিতৃমাতৃহারা হইয়াছেন, তখন হইতেই তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, যে ভাবেই হউক তিনি কল্যাণীর মনে আনন্দোৎপাদন করিবেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, রাজনন্দিনী হইয়াও কল্যাণী স্বীয় মনোভাব সম্যক্ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কৃষ্ণবল্লভের সংসারে দাসীবৃত্তি করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তখন সেই ধীর শান্ত বালিকাটির গুণে তিনি একান্তই মুগ্ধ হইলেন।

ভবানীপ্রসাদ ও কল্যাণী একমনে একপ্রাণে সংসারে কাজ করিতেছিলেন। একের সদ্‌গুণ অন্যে অর্জ্জন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছিলেন। বিবাহের পর তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের চিত্তের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি যখন দেখিতেন যে, কল্যাণী আত্ম-সুখ তুচ্ছ করিয়া অন্যের সুখোৎপাদনে সমর্থ হইয়া ভোগজনিত কায়িক

সুখের শতাধিক গুণ মানসিক সুখ উপভোগ করিতেন তখনই তাঁহার চিত্তে একটা নির্ম্মল আনন্দোদয় হইত। এরূপ আনন্দের আস্বাদ পাওয়ায় ভবানীপ্রসাদের মনে হইতে লাগিল যে, কায়িক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখ অধিকতরই আনন্দজনক। তখন হইতে তিনিও আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া অন্যের সুখোৎপাদনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবশেষে পরোপকারপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপ্রসাদের হৃদয়ে জীবের প্রতি ভাল-বাসার অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু প্রাণিহিংসা-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন শাক্ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অবস্থিতি করায় সে অঙ্কুর বালুকামধ্যে প্রোথিত বীজের ন্যায় অল্পে অল্পে শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল। বিবাহের পর হইতে জীব-প্রেম-মুগ্ধ-হৃদয়া কল্যাণীর সাহায্যে ভবানীপ্রসাদের সেই অন্তর্জ্জাত অঙ্কুর পল্লবিত হইয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক বসন্তকালীন পূর্ণকলেবর বৃক্ষের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবগৃহে প্রতিপালিতা কল্যাণী জীবহিংসা দেখিলে দুঃখানুভব করিতেন। এখন তাঁহারই সাহচর্য্যে ও যত্নে শাক্ত ভবানীপ্রসাদ সর্ব্ব জীবে প্রীতি অনুভব করিলেন।

কল্যাণীকে বিবাহ করার পর হইতেই ভবানীপ্রসাদের চিত্তে আর একটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি কল্যাণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদয়ালের নিকট স্বীয় আসক্তির কথা ব্যক্ত করেন এবং পরে যখন সংবাদ পাইলেন যে, সে বালিকা কৃষ্ণবল্লভের গৃহে দাসীরূপে অবস্থিত, তখন তিনি কল্যাণীকে পাইবার আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কল্যাণীও যখন পিতৃমাতৃহারা হইয়া রায়পুরে কৃষ্ণবল্লভের সংসারে আনীতা হইলেন, তখন তাঁহার কল্পিত স্বামীর সহিত মিলিত হওয়া দূরে থাক, তিনি যে সে সংসার হইতে জীবনে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন, এ

চিন্তাও কোন দিন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া ভগবান সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই চিরবাঞ্ছিত মিলন ঘটাইলেন, তখন তাঁহাদের চিত্ত ভগবানের শ্রীচরণে নিবিষ্ট হইল। সেইজন্য বিবাহের পরদিন হইতে সকল কর্ম্মারম্ভে তাঁহারা কমলাপতিকে স্মরণ করিতেন এবং সকল কর্ম্মের অন্তে কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন।

মনুষ্য হৃদয়ে প্রণয় এক স্বাভাবিক উচ্চ অঙ্গের প্রবৃত্তি। সে প্রবৃত্তি যখন নিম্নস্তরে অবস্থিত থাকে, তখন তাহা মোহরূপে মানব মন অধিকার করে। মোহ দম্পতীর চিত্ত পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করে, একের চিত্তে অন্যের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা সদাসর্ব্বদা জাগ্রত করিয়া রাখে এবং সে মিলন সংসাধিত না হইলে দম্পতী-হৃদয় শোকাভিভূত করিয়া দেয়। কিন্তু যখন এই মোহ দম্পতী-হৃদয়ে প্রণয়ে পরিণত হয়, তখন সে যুগল-হৃদয় মিলিত না হইলেও আর শোকে অভিভূত হয় না। মানব-হৃদয়ে প্রকৃত প্রণয় সঞ্চারিত হইলে দূর হইতে প্রণয়িণী প্রণয়ীর দর্শন পাইলেই পরিতৃপ্ত হয় কিংবা বহুদূরে অবস্থিত থাকিয়াও, একজন অন্যের চিন্তা অবলম্বন করিয়াও পরস্পরের সাহচর্য্য অনুভব করে। প্রণয় মনুষ্য-হৃদয় উন্নত করে; মর্ত্ত্যের পাপ ও কদর্য্যতা হইতে রক্ষা করিয়া মানব-হৃদয়ে পবিত্র সুখ ও শান্তি উপভোগের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়।

ভবানীপ্রসাদ ও কল্যাণীর মধ্যে এইরূপ পবিত্র প্রণয় সঞ্চারিত হইল। তাঁহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা পরস্পরের চিত্ত-প্রসাদনের জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিতেন। এই প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় সকল কার্য্যে এবং সকল স্থানেই স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর অবস্থিতি অনুভব করিতেন। যখন কোন কর্ম্মোপলক্ষে ভবানীপ্রসাদকে রাজধানী ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে হইত, তখনও তিনি তাঁহার পার্শ্বে

কল্যাণীর অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। রাজপ্রাসাদে কল্যাণীর পার্শ্বে থাকিয়া কোন সৎকর্ম্ম করিলে ভবানীপ্রসাদ যেরূপ তৃপ্তি অনুভব করিতেন বহুদূরে থাকিয়াও তাঁহার তৃপ্তি উৎপাদন করিতে পারে এরূপ কার্য্য করিয়া তিনি সমভাবেই আনন্দ অনুভব করিতেন।

নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত বলিয়া রাজপুরীমধ্যে ভবানীপ্রসাদ ও কল্যাণী অহরহঃ মিলিত হইবার সুযোগ পাইতেন না। সেইজন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাঁহারা পরস্পরের চিন্তা করিতেন এবং কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে পরস্পরের সাহচর্য্য অনুভব করিতেন। এই প্রবৃত্তি হইতে তাঁহাদের হৃদয়ে যে পবিত্র প্রেম উন্মেষিত হইয়াছিল, যে গভীর প্রেম সেই দুইটি নিষ্পাপ কোমল হৃদয়কে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা সাধারণের মধ্যে ক্বচিৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রেম অন্তর হইতে কুটিলতা, কামনা ও আসক্তি দূর করিয়া এক পবিত্র শান্তি আনয়ন করে; এই প্রেম কর্ম্মময় সংসারে জড়তা না আনিয়া মানবচিত্তে উৎসাহ আনিয়া দেয় এবং ক্লেশপূর্ণ মানবজীবনে এক পবিত্র আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত করিতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকৃতির লীলা-ভূমিতে যত প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে ভবানী-প্রসাদ শৈশবাবস্থা হইতেই সকলগুলি প্রত্যক্ষ করিতেন। নিদাঘকালে যখন সূর্য্য প্রচণ্ড কিরণ বর্ষণ করিত এবং সেই প্রখর উত্তাপে তাপিত হইয়া পক্ষীগণ প্রাসাদ-সংলগ্ন উপবন-বৃক্ষে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিত, তখন ভবানীপ্রসাদ এই আশ্রয়দাতা বৃক্ষগুলিকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

যখন নানাবিধ পক্ষীর কূজনে বৃক্ষগুলি মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন তিনি সেই নির্জ্জীব বৃক্ষকে সজীব বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্য যখন সেই সকল বৃক্ষ পুষ্পফলে শোভিত হইত, তখন তিনি উদ্যানরক্ষককে তাহা হইতে পুষ্প বা ফল চয়ন করিতে নিষেধ করিতেন এবং সমাগত পক্ষীগণের তৃষ্ণানিবারণার্থ সময়ে সময়ে বৃক্ষতলে পাত্রে করিয়া জল রাখিয়া আসিতেন। আবার যখন সন্ধ্যা-সমাগমে পক্ষীগণ স্বীয় আলয়াভিমুখে উড়িয়া যাইত, তখন ভবানীপ্রসাদ সংসারের আকর্ষণ ও তাহার মোহিনী শক্তির বিষয় চিন্তা করিতেন। কিন্তু শৈশব-সুলভ বুদ্ধিবশতঃ তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না। যখন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে পাপিয়া ঝঙ্কার করিত, তখন গবাক্ষপার্শ্বে আসিয়া তিনি ভাবিতেন, এই উপবনে পাপিয়া ত সকল সময় বাস করে, কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রি ভিন্ন অন্য সময়ে এত মধুর ডাকে না কেন ?

গ্রীষ্মশেষে যখন আকাশ ঘন-জলদ-জালে পরিব্যাপ্ত হইয়া আসিত, তখন ভবানীপ্রসাদের একটা অনির্ব্বচনীয় চিত্তপ্রসাদ জন্মিত। তিনি প্রাসাদোপরি উত্থিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। তিনি দেখিতেন—সেই ঈষৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত আকাশতলে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে এবং অন্যান্য পক্ষীগণ ব্যগ্রভাবে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। অল্পক্ষণ পরেই যখন বৃষ্টি আরম্ভ হইত তখন দুই একটি গৃহহারা পক্ষীকে সিক্তাবস্থায় ত্রস্তভাবে উড়িতে দেখিয়া তিনি দুঃখ অনুভব করিতেন এবং সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তে স্বীয় প্রকোষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতেন—এই গৃহহারা পক্ষীদের মত কত গৃহহারা পথিক পথিমধ্যে কষ্টভোগ করিতেছে ; তাঁহার কত দুঃস্থ প্রজা ভগ্নগৃহে বসিয়া বর্ষার জলধারায় কষ্টে দিনযাপন করিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পথিকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহার চিত্তে এত

আগ্রহ জন্মিত যে, বাল্যকালেই ভবানীপ্রসাদ পিতাকে অনুরোধ করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান পথে স্থানে স্থানে অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বৃষ্টি বন্ধ হইলে তিনি ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করিতে গমন করিতেন এবং যেখানে জলধারাপ্রপীড়িত দুঃখী প্রজার সন্ধান পাইতেন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া গৃহসংস্কারের জন্য তাহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন।

বর্ষাপগমে যখন শরতের নীল আকাশে শুভ্র মেঘখণ্ড ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, যখন শস্য-শ্যামল ধরণীতল কাশপুষ্প বিকশিত হওয়ায় নীলানন্তের অনুরূপ শোভাধারণ করিত, যখন উদ্যানমধ্যে নানাবিধ বৃক্ষ কুসুম-পরিশোভিত হইয়া চারিদিক গন্ধে আমোদিত করিত, তখন ভবানীপ্রসাদ কোন এক ভবিষ্যৎ সুখ কামনা করিতেন এবং যখন হেমন্তের শেষে তাঁহার প্রজামণ্ডলী শস্যপূর্ণ শকটারোহণ করিয়া গীতোচ্ছ্বাসে প্রান্তর মুখরিত করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিত, তখন তাঁহার কামনা পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তিনি নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন। সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টিবশতঃ আশানুরূপ ফসল না হওয়ায় প্রজামধ্যে অন্নকষ্ট হইত—এ সংবাদ বাল্যকালে ভবানীপ্রসাদ মধ্যে মধ্যে শুনিতেন। তাঁহার পরদুঃখকাতর হৃদয় এ সংবাদ সহ্য করিতে পারিত না বলিয়াই বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রজামণ্ডলীর এই দুঃখ দূর করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় রাজা অমরনাথের রাজত্বে কোন প্রজা তিন বৎসরের ভরণপোষণোপযোগী শস্য না রাখিয়া শস্য বিক্রয় করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইত। ভবানীপ্রসাদের এই চেষ্টার ফলে তাঁহার পিতৃরাজ্য হইতে অন্নকষ্ট দূরীভূত হইয়াছিল। শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলেই রাজাজ্ঞা পালনের পর উদ্বৃত্ত শস্য মধ্যে মধ্যে বিক্রয় করিয়া প্রজারা তাহাদের অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে

পারিত। সেই জন্যই শস্যপূর্ণ শকট দেখিলে ভবানীপ্রসাদ আনন্দ অনুভব করিতেন।

প্রতিবৎসর শীতের প্রারম্ভে ভবানীপ্রসাদের সম্মুখে আর একটি কর্ত্তব্য উপস্থিত হইত। হেমন্তের শেষভাগে তিনি নিজে যেমন শীতবোধ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখীদিগের ক্লেশের কথা তাঁহার মনে জাগ্রত হইত। তিনি নিজে যখন শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন দুঃস্থ প্রজামধ্যে শীতবস্ত্রদানের প্রয়োজন বোধ করিতেন। কিন্তু সকল বিষয়ের আবদার পিতার নিকট করিতে পারা যায় না বলিয়া তিনি স্বীয় অভিলাষ সম্পূর্ণ গোপনে রাখিতেন। মাতৃহারা একমাত্র পুত্র ভবানী-প্রসাদের সুখ ও আনন্দের জন্য রাজা অমরনাথ তাঁহার সকল অভিলাষই পূর্ণ করিতেন। কিন্তু ভবানীপ্রসাদ বুঝিতেন যে, পিতা প্রজার দুঃখে দুঃখানুভব করিয়া এ সকল কার্য্য করিতেন না, কেবল তাঁহারই মনস্তুষ্টির জন্য করিতেন। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অতি সতর্কতার সহিত স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা পুত্রের বিহার এবং বিলাসের জন্য মাসে মাসে প্রচুর অর্থ দিতেন। ভবানীপ্রসাদ তাঁহার সকল ব্যয়ের সঙ্কোচ করিয়া সঞ্চয় করিতেন এবং সেই অর্থের দ্বারা পিতার অগোচরে নিজের সাধ মিটাইবার চেষ্টা করিতেন।

যখন শীতের অবসানে পৃথিবী নূতন রূপ ধারণ করিত, যখন মলয় মারুৎ প্রতি পুষ্প হইতে গন্ধ বহন করিয়া জগদ্বাসীকে বসন্ত-সমাগম-বার্ত্তা অবগত করাইত, যখন সকল জীবের মধ্যেই একটা উৎসাহ ও আনন্দ দেখা যাইত, যখন বসন্ত-সখা কোকিল আসিয়া কুহুস্বরে প্রাসাদ ও উপবন প্রতিধ্বনিত করিত—তখন বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন কর্ত্তব্য সাধিত করিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া তিনি পুলকিত হইতেন। তখন বিশ্বের সেই চির-নূতন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সকল স্থানে বিশ্বপতির অবস্থিতি

অনুভব করিতেন। তখন তিনি আপন আনন্দে আপনি বিভোর হইয়া আবার আগামী বর্ষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন।

বাল্যাবস্থা হইতে এই ভাবে কর্ম্ম করায় প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপ্রবৃত্তি বালক ভবানীপ্রসাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। যে সকল নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে তিনি এতকাল মুগ্ধ ছিলেন, কল্যাণীকে পাইবার পর হইতে তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ সেই সকল পদার্থকেই নবভাবে উদ্ভাসিত বলিয়া বোধ করিলেন; সকল পদার্থেই নব-জীবন-সঞ্চার দেখিতে পাইলেন। ভবানীপ্রসাদের চক্ষে সবই নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণীর সহিত মিলিত হইয়া তিনি যখন রক্তিম-সূর্য্য-সিমন্তিনী ঊষারাণীকে উদিত হইতে দেখিতেন, যখন শিশির-সিক্ত পত্রাদি হইতে বালসূর্য্যকিরণ প্রতিঘাত হইতে দেখিতেন, পত্রান্ত-বিগলিত শিশিরবিন্দু সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে অপসারিত হওয়ায় বৃক্ষ যখন পতি-সোহাগদীপ্তমুখী কামিনীর ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিত, যখন প্রভাতসমীরণ সুপ্তোত্থিত ধরণীর সেবায় নিযুক্ত হইত, তখন ভবানীপ্রসাদ এক অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেন। আবার যখন দিবাবসানে বিহগকুল মঙ্গলগীতে উপবন প্রতিধ্বনিত করিত, যখন পশ্চিমগগন অশ্রুবর্ষণোন্মুখ ও রক্তাভ হইয়া হৃদয়সখা তপনদেবকে বিদায় দিত, যখন সান্ধ্যসমীর-বাহিত ধীরাগত নিশানাথের সাদর অভিমন্ত্রণের জন্য চম্পকবর্ণাভ পূর্ব্ব-গগন স্মিতবদনে অপেক্ষা করিত, যখন তারকাকুল-পরিবৃত চন্দ্রিকাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আকাশতলে নৈশ-নিস্তব্ধতায় শান্তি-সুখ অনুভব করিত, তখন ভবানীপ্রসাদ কল্যাণীকে বিশ্বের এই মোহন-ছবি দেখাইয়া আত্মহারা হইতেন।

প্রথম প্রথম ভবানীপ্রসাদ বিশ্বের সহিত কল্যাণীর পৃথক্ সত্ত্বানুভব করিতেন; কিন্তু কিছুকাল গত হইলে কল্যাণীর সাহচর্য্যে তিনি বিশ্বজগৎ

ভুলিয়া গেলেন। আবার কখনও বিশ্বজগতের প্রতি স্তরে কল্যাণীর অবস্থিতি অনুভব করিয়া আপনহারা হইতেন। যখন এই স্বামী-স্ত্রী আনন্দ ও শান্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল। বংশ-পরম্পরানুগত নরবলি প্রথায় ভবানীপ্রসাদ অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া রুষ্ট হইয়া রাজা অমরনাথ কল্যাণীর নিকট হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক বৎসরের জন্য কারাগৃহে আবদ্ধ রাখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যখন ভবানীপ্রসাদ ও কল্যাণী সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত এবং সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যাদয় পর্য্যন্ত প্রতিক্ষণে ভগবানের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দিনযাপন করিতেছিলেন, তখন রায়পুর রাজ্যাভিনয়ে এক নূতন অঙ্কের অবতারণা হইতেছিল। যখন বধূ কল্যাণীর নির্জ্জন-বাসের সংবাদ অন্তঃপুরমধ্যে প্রচারিত হইল, তখন অনেকেই শোকবিহ্বল হইয়া পড়িল। আর তাহারা সেই আনন্দ-প্রতিমাকে অন্তঃপুর মধ্যে ইতস্ততঃ দেখিতে পাইবে না এবং সেই সুখদাত্রীর স্নেহ ও যত্ন উপভোগ করিতে পারিবে না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিল—রাজপরিবারের গৃহলক্ষ্মী আবদ্ধ হইল, আর কি তথায় রাজ্যলক্ষ্মীই বসবাস করিবেন!

এদিকে রাজ্যমধ্যেও এক মহা দুঃখস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। রায়পুরের সকল দুঃখী প্রজাই কুমারের কারাবাসের সংবাদ পাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিল, রাজা অমরনাথের কঠোর

শাসনাগ্নির মধ্যে যেটুকু শান্তিবারি ছিল তাহা এইবারে শুষ্ক হইয়া গেল। আর কি সেই অবিরাম প্রবাহিত তাপরাশি সহ্য করা যাইবে? যে পরদুঃখানুভবসমর্থ, পিতৃবৎসল যুবরাজ, দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে আসিয়া সংবাদ লইতেন, আর কি তাহারা সেই দুঃখহারী প্রজানাথকে কখনও দ্বারদেশে দেখিতে পাইবে? তাহারা প্রত্যেকেই যুবরাজের এই কঠোর শাস্তি স্বেচ্ছায় নিজে বহন করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু কাহার সাধ্য এ প্রস্তাব রাজা অমরনাথের সম্মুখে উত্থাপন করে? তাহারা সকলেই বুঝিত যে, যখন একবার রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে তখন কোনমতেই ইহার লঙ্ঘন হইবে না। যে রাত্রে কুমার কারাগৃহে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার পরদিন হইতেই প্রজামধ্যে এক দারুণ দুঃখস্রোত প্রবাহিত হইল। এক গৃহ হইতে সে স্রোত অচিরে অন্য গৃহে যাইয়া সমস্ত নগর ও উপনগর প্লাবিত করিল। তখন প্রজাগণ দিনরাত্রি কুমারের কথা লইয়াই কালহরণ করিতে লাগিল এবং তাঁহারই চিন্তায় প্রত্যেক সংসারের সকল শান্তি বিদূরিত হইল।

রাজ্যের সকল স্থানেই যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী সম্বন্ধে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু সৈন্যদল-মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। কারণ তথায় সৈন্যাধ্যক্ষ মথুরাসিংহ অবিচলিতভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া রাজ্যে শান্তিরক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমরা বিশ্বসংসারে বাস করি। বিশ্বের সকল উপকরণ আমাদের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া বিবিধ অভাব মোচন করিতেছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন সেই বিশ্ব-জগতের দিকে চাহিয়া দেখে? কয়জনই বা বিশ্বের এই অনন্ত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে? এই বিশ্বে বসতি করিয়াও কয়জন সেই বিশ্বপতিকে চিনিতে বা তাঁহার সহিত মিলিত হইতে বাসনা করে? নিরবচ্ছিন্নভাবে অতি দীর্ঘকাল এই বিশাল সংসারে বাস করিয়াও কয়জন সেই সংসারপতির গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে?

ঐ যে নীল নভোস্থল আসমুদ্র পৃথিবীপৃষ্ঠে রক্ষিত হইয়া এক বিরাট পূজা-মন্দিরের সৃষ্টি করিয়াছে, ঐ যে কত বন, কত উপবন, কত তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতমালা, কত স্নিগ্ধ নয়নরঞ্জন নদনদী এই মন্দিরমধ্যে থাকিয়া তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে; ঐ যে বিস্তীর্ণ হরিৎক্ষেত্র স্থির নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহারই পার্শ্বে নীল সিন্ধুজল মৃদুল পবনে হিল্লোলিত হইয়া অবশেষে প্রচণ্ড ঝটিকাঘাতে আলোড়িত ও বিক্ষোভিত হইতেছে; ঐ যে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অগণিত দীপমালা জ্বালিত হইয়া এই অনন্ত মন্দিরে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃবিকীর্ণ করিতেছে—এত আয়োজন কাহার জন্য? কে সেই বিরাট পুরুষ—যিনি এই বিরাট মন্দিরের অধীশ্বর হইয়া এই সকল উপকরণ উপভোগ করিতেছেন? কাহার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে তপনদেব উদিত হইয়া কিরণ বর্ষণ করিতেছে এবং কাহারই বা নয়ন মন স্নিগ্ধ করিবার জন্য প্রচণ্ড তেজরাশি অপসারিত করিয়া চন্দ্রমা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকিরণ করিতেছে? সকল সময় সকল স্থানে পবন কাহার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে? কাহার তৃপ্তির জন্য ঐ

গহন বিজনে সুন্দর কুসুমটি বিকশিত হইয়া সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়াছে এবং কেনই বা সুমিষ্ট ফল বৃক্ষ হইতে আপনি খসিয়া ভূমিতে পড়িতেছে? কেন ঐ ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বতী অবিরলধারে সঙ্গীত করিতে করিতে আপন শরীর অনন্ত জলরাশিতে মিশাইয়া দিতেছে? কিসের আশায় ঐ অনন্ত পারাবার স্ফীত হইয়া গৃহীত জলরাশি প্রত্যর্পণ করিয়া তটিনীর সহিত হৃদয় বিনিময় করিতেছে?

বুদ্ধিমান মানুষ মনে করে যে, ঐ যে সরীসৃপটা ভূসংলগ্ন হইয়া যাইতেছে, সে এই পৃথিবীপৃষ্ঠে বাস করে বটে কিন্তু তাহার কোন সৌন্দর্য্য উপলব্ধিই সে করিতে পারে না। সে অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারে; কিন্তু সে সকল পরিবর্ত্তন কেন হয় তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়াই মানুষ ইতর শ্রেণীর সকল জীবকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। মানুষ বুঝে না যে, তাহার এই অল্প এবং অসম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া সে নিজেও এই জগতের কোন মীমাংসাই করিতে পারে না। যাহারা এই বিশ্বসৃষ্টির কোন কারণ অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা না করিয়া সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকে, তাহারাই সুখী। এ জগৎ তাহাদের চক্ষে বড়ই সুন্দর। তাহারা এ জগতে যতদিন থাকে, ততদিন সেই বিশ্বস্রষ্টার চিন্তায় অতি সুখেই কালযাপন করে এবং যখন এই সংসার ছাড়িয়া যায়, তখন সেই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার আশায় তাহারা পরমানন্দে এই জগতের নিকট বিদায় লইয়া থাকে।

আবার যাহাদের মধ্যে অনেক আশা থাকে এবং সেই সকল আশা একে একে পূর্ণ হয়, তাহাদের সম্মুখেও জগৎ অতি সুখকর বলিয়া বোধ হয়। আশাই সংসারের সুখ। আবার সেই আশা যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে চরম সুখ মানুষ পাইয়া থাকে। এই জন্যই কত লোক অর্থে অনর্থে, সম্পদে বিপদে পরিবেষ্টিত হইয়াও সংসার-মধ্যে কেমন সুখে বাস

করিতেছে। তাহাদের সাধ কখনও মেটে না। তাহারা যত পায়, আকাঙ্ক্ষা ততই বাড়িতে থাকে। সেইজন্যই মহাপ্রয়াণের দিন পর্য্যন্তও তাহারা এ জগৎকে ছাড়িতে চাহে না।

আবার আর এক শ্রেণীর লোককে সংসার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারে থাকিতে হয় তাই তাহারা সংসারে থাকে—কোন আকাঙ্ক্ষা তাহারা রাখে না বা রাখিতে সাহস করে না। প্রবৃত্তিবশতঃই হউক বা দৈবদুর্ব্বিপাকের জন্যই হউক তাহারা সকল সময়েই ভগবানে আত্মনির্ভর করিয়া থাকে। যাহারা প্রবৃত্তিবশতঃ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অসাধারণ মানসিক বলসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বশক্তি কর্ত্তৃক প্রত্যেক কর্ম্মে পরিচালিত হওয়ায় তাহারা সকল স্থানে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করে এবং সেইজন্য অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল সৎকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকে। যখন কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখন অসীম সাহস ও অদ্ভুত তেজের সহিত তাহারা তাহা সম্পাদন করে। কিন্তু কার্য্য সম্পন্ন হইলে আর তাহার প্রতি চিত্ত স্থাপন করে না, ফলাফলের কোন প্রত্যাশা রাখে না। এরূপ শ্রেণীর লোককে কখনও বিমর্ষ দেখা যায় না; বিষাদ তাহাদের চিত্তে কখনও স্থান পায় না।

যাহারা দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তাহারা সাধারণের মত মনুষ্যচর্ম্মাচ্ছাদিত রক্তমাংসের শরীর ধারণ করে বটে; কিন্তু নিরীক্ষণ করিলে তাহাদিগকে লতাচ্ছাদিত ভগ্নগৃহের মত বোধ হয়—উপরে সুকোমল পল্লব ও হরিৎ পত্র কিন্তু ভিতরে স্থানভ্রষ্ট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক ও প্রস্তররাশি; জীবনের এক একটি দুঃসহ শোকে তাহাদের এক একখানি পঞ্জরাস্থি ভগ্ন হইয়া যায় এবং অবশেষে সেই চর্ম্মাচ্ছাদিত ভগ্নাস্থিসমষ্টি পৃথিবীপৃষ্ঠে বিরাজ করিতে থাকে। তখন

তাহাদের সকল সুখ, সকল আশা, সকল ভরসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন অতি অল্প সময়েই তাহাদিগকে দুঃখ করিতে দেখা যায় এবং সংসারের সুখ দুঃখ তাহারা সমভাবেই দেখে। কিন্তু যদি কখনও তাহাদের নয়ন-পথে এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় যাহা তাহাদের জীবনে এক দিনও সুখকর বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখনই তাহারা আনন্দ অনুভব করে। নতুবা সকল সময়েই সংসারের দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া সেই অনন্ত পথের প্রতি তাহারা চাহিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদয়াল এই অবস্থায় সংসার মধ্যে বসতি করিতেছিলেন। উপস্থিত রাজা অমরনাথের সথাভাবে আসীন হইলেও তিনি ভূতপূর্ব্ব নৃপতির সভাসদ্ ছিলেন। সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা, সেই বিশাল রাজত্ব, সেই অনন্ত প্রতাপ—তিনি সবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, তাঁহাদের নিবৃত্তিভাব, তাঁহাদের শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা, ভারতবাসীর নিকট তাঁহাদের সম্মান—সকলই তখন অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার সংসার, তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী, তাঁহার একমাত্র পুত্র সকলই তখন বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এখন তাঁহার ভালবাসার কোনটিই বর্ত্তমান ছিল না—সকলই তিনি নিজের জীবদ্দশায় একে একে হারাইয়াছিলেন। সুতরাং সংসারে তাঁহার সুখের কিছুই ছিল না; তাঁহার সকল আশাই নির্ম্মূল হইয়াছিল। অধিকন্তু এখন তাঁহার শরীরে রোগের সঞ্চার হওয়ায় তিনি সকল সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন।

কল্যাণীর সহিত ভবানীপ্রসাদের বিবাহের পর হইতে বিষ্ণুদয়ালের মনে একটু শান্তিসুখ দেখা গিয়াছিল। যখন তিনি কুমারের চিত্তে পবিত্র প্রণয়-সঞ্চার দেখিয়াছিলেন, যখন কল্যাণীর সাহচর্য্যে ভবানীপ্রসাদের মহৎ অন্তঃকরণ মহত্তর হইতেছিল, তখন তাঁহার সেই অতীত যৌবনের সুখরাশি, তাঁহার প্রণয়-বন্ধন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তাঁর প্রতিদান

ও ভালবাসা—সেই বহুকালগত সুখময় জীবনের সকল ঘটনাই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই কুমারের বিবাহের পর কিছুদিন তাঁহার চিত্তপ্রসাদ জন্মিয়াছিল। কিন্তু যখন কল্যাণীময় ভবানীপ্রসাদ স্ত্রীর বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কারাগৃহে আবদ্ধ হইলেন, তখন বৃদ্ধের সকল দুঃখ আবার নূতন হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি আর কুমারের কারামুক্তির সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবার ইচ্ছা রাখিলেন না এবং যতই অন্তরের সহিত মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার রুগ্ন শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল।

এদিকে মন্ত্রী পান্নাসিংহ তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির উপক্রম হইয়া আসিতেছে দেখিয়া প্রভূত আশা সাদরে চিত্তে স্থান দিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে একজন সভাসদের নিকট আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তাঁহাকে ইহাও বলিয়া রাখিলেন যে, যদি এ কার্য্যে সফল হইতে পারা যায় তাহা হইলে তিনিই মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইবেন। আত্মোন্নতির আশায় তিনিও মন্ত্রীর এই কু-অভিপ্রায় সাধনে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। একে একে আরও তিনজন সভাসদ্ উৎকোচের প্রলোভনে পড়িয়া পান্নাসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রায়পুর-রাজ্য হস্তান্তরিত করিবার ষড়যন্ত্র ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মন্ত্রী অপর চারিজন সভাসদের সাহায্যে নানা আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অকস্মাৎ রায়পুর-রাজ্যে এক মহা বিপদের সূচনা হইল। সুস্থ শরীরে রাজা অমরনাথ কার্য্যাদি পরিচালনা করিতেছিলেন এমন সময় একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার শরীরে কঠিন পীড়ার লক্ষণ দেখা গেল। অচিরেই মথুরাসিংহের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি এখন সৈন্যদিগের অধিনায়ক হইয়া দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেন। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি রাজ-বৈদ্যকে সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট আসিলেন। পীড়া কঠিন মনে হওয়ায় নগরের অন্যান্য সকল বৈদ্যকে আহ্বান করা হইল। শীঘ্রই সকলে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। সমবেত বৈদ্যমণ্ডলী রাজার শরীর পরীক্ষা করিয়াই বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। সকলের মুখেই উৎকট শঙ্কা প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তাঁহারা রোগীর যেরূপ চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করিলেন, সমস্ত রাত্রি মথুরাসিংহ সেইভাবে কার্য্য করিলেন। রাত্রি শেষে রোগীকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলিয়া বোধ হইল। সকলেরই মনে হইল যেন রাজা নিদ্রা যাইতেছেন। এমন সময় অতি অস্পষ্ট, অতি কাতর, অতি করুণ একটি শব্দ শ্রুত হইল। মথুরাসিংহ রাজপার্শ্বেই ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তকে হাত রাখিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই মুখ একেবারে বিবর্ণ দেখিয়া বক্ষের উপরে হাত রাখিলেন, কিন্তু স্পন্দন অনুভব করিলেন না। নাসিকার সম্মুখে অঙ্গুলি রাখিলেন— নিশ্বাস বায়ু অনুভূত হইল না। তখন রাজা ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সকলে অতি ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইলেন এবং দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"রাজা এখন নিদ্রাভিভূত। আমরা বাহিরে যাইতেছি; পুরস্ত্রীদিগকে এখন এখানে আসিতে বল।"

মথুরাসিংহ বাহিরে আসিলেন। রাজবৈদ্য প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মন্ত্রী পান্নাসিংহ ও ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদয়ালের নিকট এই দুঃসংবাদ প্রেরিত হইল। অনতিবিলম্বে রাজপ্রাসাদ ক্রন্দনের রোলে বিদীর্ণ হইল। ভোর হইতে না হইতেই রাজা অমরনাথের মৃত্যু-সংবাদ নগর মধ্যে রাষ্ট্র হইল।

মন্ত্রী পান্নাসিংহ, বিষ্ণুদয়াল ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। এখন কি কর্ত্তব্য তাহাই স্থির করিতে তাঁহারা সকলেই ব্যস্ত হইলেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ব্বেই কুমারের রাজ্যাভিষেক আবশ্যক। অধিকন্তু পুত্র না আসিলে রাজার সৎকার হইতে পারে না। সুতরাং সৈন্যাধ্যক্ষ মথুরাসিংহ প্রস্তাব করিলেন, "এই মুহূর্ত্তেই কারাগার হইতে ভবানী-প্রসাদকে মুক্ত করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করা হউক; ভবানীপ্রসাদ সিংহাসনা-রোহণ করিলে পরলোকগত রাজার সৎকার করা হইবে।" অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বিষ্ণুদয়াল এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কিন্তু মন্ত্রী পান্নাসিংহ এ প্রস্তাবে আপত্তি দেখাইয়া বলিলেন যে, উপস্থিত কারগার হইতে ভবানীপ্রসাদকে মুক্ত করা যাইতে পারে না। প্রথমতঃ, রাজা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, এক বৎসরকাল ভবানীপ্রসাদকে কারারুদ্ধ করা হইল। আমি রাজমন্ত্রী হইয়া কিরূপে তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিব? দ্বিতীয়তঃ, কুলাচার ও কুলধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করার জন্যই ন্যায়পরায়ণ রাজা পুত্রকেও অপরাধী মনে করিয়া দণ্ড দিয়াছিলেন। আমি সেই পরলোকগত রাজার অনুগত ভৃত্য হইয়া কি করিয়া প্রভুর দেহান্তরিত হইবামাত্র তাঁহার অবাধ্য হইব? তৃতীয়তঃ, সাত মাস পূর্ব্বে কুমার ভবানী-মন্দিরে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে নগরবাসী সকলেই আজও দুঃখিত ও রুষ্ট। যদি এখন প্রজামণ্ডলীর অভিমত অবজ্ঞা

করিয়া কুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করা হয় তাহা হইলে নগরে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে। চতুর্থ কারণ এই যে, যদি আমরা রাজা অমরনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করি, তাহা হইলে আমরা সকলেই তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের পবিত্র আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইব এবং এই শান্তিময় রাজ্যের প্রতি রাজ্যলক্ষ্মী বিমুখ হইবেন। সেই জন্যই আমি স্থির করিতেছি যে, মৃত রাজার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করাই বিধেয়। কুমার ভবানীপ্রসাদ এক বৎসর কারাগৃহেই থাকিবেন। উপস্থিত বিপদের সময় তাঁহাকে কারাগৃহ হইতে আনিয়া রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও আনুষঙ্গিক সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করাইতে হইবে। কিন্তু সেই কার্য্যের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে পুনরায় কারাগৃহে আবদ্ধ করিতে হইবে। এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করা হইবে। যতদিন না কুমারের রাজ্যাভিষেক হয় ততদিন সিংহাসনের উপর রাজা অমরনাথের প্রতিকৃতি রাখিয়া তাঁহারই ভৃত্যস্বরূপ আমরা রাজকার্য্য পরিচালন করিব। আমার অভিমত ব্যক্ত করিলাম। এখন আমি কেবল সভাসদ্গণের অনুমোদনের অপেক্ষা করিব।

মন্ত্রী পান্নাসিংহ নীরব হইলে চারিজন সভাসদ্ তাঁহার মতের পোষকতা করিয়া বলিলেন, "যদি রাজ্যে শান্তি রক্ষাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এইভাবে কার্য্য করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। বিশেষতঃ আমরা লোকমুখে শুনিয়াছি যে, প্রজামণ্ডলী ভবানীপ্রসাদের উপর অসন্তুষ্ট ও তাঁহার ব্যবহারে তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আছে। এরূপ স্থলে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে করিতে কুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলে কেহই তত আপত্তি করিতে পারিবে না। কিন্তু অকস্মাৎ এরূপ অনাচারী হস্তে রাজ্য সমর্পিত হইলে একটা বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা সকলেই মন্ত্রী মহাশয়ের এই সাধু প্রস্তাবের জন্য তাঁহার নিকট অনুগৃহীত।

দেখিতেছি রাজ্য ও প্রজামণ্ডলীর হিত-সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন তাহা পরলোকগত রাজার আদেশ মনে করিয়া আমরা সযত্নে পালন করিব।

সৈন্যাধ্যক্ষ মথুরাসিংহ ও বিষ্ণুদয়াল স্থির হইয়া সকলের কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহারা কাহারও কোন কথার উত্তর দিলেন না।

সুযোগ বুঝিয়া মন্ত্রী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ছলে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। "আমি এইরূপ স্থির করিতেছি যে—অকস্মাৎ একটি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী পান্নাসিংহ ভূতলশায়ী হইলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া সকলেই দেখিলেন যে, দ্বারস্থিত প্রতিহারীর বন্দুকের সম্মুখে মণ্ডলাকারে ধূম উড়িতেছে। সকলেই বুঝিলেন তাহারই গুলির আঘাতে মন্ত্রী প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন সভাসদ্‌গণের মধ্যে কাহারও এরূপ সাহস হইল না যে, এই মন্ত্রীহন্তা প্রতিহারীকে আক্রমণ করে বা তাহার হস্তস্থিত বন্দুক কাড়িয়া লয়। তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই ভীত হইলেন এবং সভাসদ্‌গণ মুহূর্ত্তকালের জন্য তথায় অপেক্ষা না করিয়া অতি দ্রুতপদে রাজপ্রাসাদের বাহিরে আসিলেন; প্রকোষ্ঠমধ্যে দুরাকাঙ্ক্ষী পান্নাসিংহের মৃতদেহ পড়িয়া রহিল।

বিষ্ণুদয়াল ও মথুরাসিংহ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এখন কি কর্ত্তব্য সেই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে করিতে মথুরা বলিলেন, "আর বিলম্ব করা উচিত নহে। নগরে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। আপনি এই প্রাসাদের ও অন্তঃপুরবাসিনীগণের অভিভাবক হইয়া এস্থলে অপেক্ষা করুন—স্থানান্তরে যাইবেন না। আমি এই মুহূর্ত্তে সৈন্যাগারে গিয়া সৈন্যদিগকে প্রস্তুত করিয়া এবং অস্ত্র ভাণ্ডার রক্ষা করিবার ভার অরুণের হস্তে সমর্পণ করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব প্রত্যাবর্ত্তন করিব। বিদ্রোহের সূচনা এই সভামধ্যেই আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি।

মথুরা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কুমার ভবানীপ্রসাদের পরিচ্ছদ আনিয়া অশ্বারোহণে রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অতি দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া দুর্গ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রতিহারী যথারীতি দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছে। সৈন্যাধ্যক্ষকে দেখিয়া প্রতিহারী অভিবাদন করিল। মথুরা প্রত্যভিবাদন করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দুর্গদ্বার বন্ধ করিতে প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন। নিজ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়াই তিনি সকল সৈন্যকে যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইবার জন্য তূর্য্যধ্বনির দ্বারা সঙ্কেত করিলেন।

উপযুক্ত বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষ স্বীয় প্রকোষ্ঠে বসিয়া এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন—এত শীঘ্র বিদ্রোহের কিরূপ আয়োজন হইতে পারে, কতলোক বিদ্রোহীদলে যোগদান করিতে পারে, অধিক রক্তপাত না করিয়া কি উপায়ে সহজে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারা যাইবে। কিয়ৎকালের মধ্যেই তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যোদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া সৈন্যগণ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সমবেত হইতেছে। বিভিন্ন সৈন্যদল স্ব স্ব দলপতির অধীনে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া দাঁড়াইতে ছিল। যখন সকল সৈন্য সমবেত হইল তখন মথুরা তাহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "রায়পুর রাজ্যে ভীষণ বিপদ উপস্থিত। কল্য রাত্রিশেষে রাজা অমরনাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। কতিপয় দুষ্টলোক এই সুযোগে স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজ্যমধ্যে উৎপাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং বোধ হয় তাহারা অচিরেই নগরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবে। ইহার উপর আবার পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে সসৈন্যে মোগল সেনাপতি অবস্থিতি করিতেছেন। উত্তর ভারতে যাইবার পথে তিনি তথায় কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিতেছেন। যদি এ সময় রাজ্যে কোন অশান্তি উপস্থিত হয় এবং সে

সংবাদ মোগল সেনাপতি জানিতে পারেন, তাহা হইলে মোগল কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। এই তোমাদের পিতৃপিতামহের বাসস্থান। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই রাজ্য সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া হিন্দুর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তোমাদিগকে কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ দিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যদি প্রাণ দিতে হয় তাহাতেও কখনও কুণ্ঠিত হইও না। এখন কি ভাবে কার্য্য করিতে হইবে কেবল সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।"

মথুরা বলিতে লাগিলেন, "এক সহস্র সৈন্য দুর্গরক্ষায় উপস্থিত নিযুক্ত থাকিবে। অস্ত্রাগার রক্ষা করিবার জন্য পাঁচশত সৈন্য অতি সতর্ক থাকিবে। এবং অরুণসিংহ তাহাদের অধিনায়ক হইবেন। এক সহস্র সৈন্য রাজপ্রাসাদ রক্ষার জন্য তথায় উপস্থিত থাকিবে এবং তাহাদের সেনাপতি যেরূপ আদেশ করিবেন তাহারা সেইরূপ কার্য্য করিবে। অবশিষ্ট এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নগর রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিবে। যে মথুরা-হস্তে তোমরা এই তিন বৎসর কাল শিক্ষা পাইয়াছ, সেই আজ তোমাদের সেনাপতিরূপে নগর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে। অশ্বসকল দুর্গমধ্যে সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিবে এবং প্রতি সৈন্য-বিভাগান্তর্গত দূত, বাদক প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে প্রস্তুত থাকিবে।"

"রাজা অমরনাথের একমাত্র পুত্র কুমার ভবানীপ্রসাদের অভিষেক এই মধ্যাহ্নেই সম্পাদিত হইবে। অদ্য হইতেই তিনি আমাদের রাজা হইবেন। সেই সহৃদয়, পরদুঃখ-কাতর, উদার ভবানীপ্রসাদকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া আজ হইতে আমরা সকলেই তাঁহার সেবক হইব। এস, আমরা সকলে একবার স্ব স্ব কুলদেবতাকে প্রণাম করিয়া প্রতিজ্ঞা করি যে, রাজা ভবানীপ্রসাদের জীবন ও রাজ্য রক্ষার জন্য আমরা সকলে

মন-প্রাণ অর্পণ করিব ও তাঁহার রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষরিত করিব।"

সৈন্যাধ্যক্ষ তূর্য্যধ্বনি করিলেন। দুর্গদ্বার সশব্দে উন্মুক্ত হইল। এক সহস্র পদাতিক সৈন্য ধীর পদক্ষেপে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং প্রাসাদাভিমুখে গমন করিল। মথুরা অশ্বারোহণ করিয়া উন্মুক্ত তরবারী হস্তে দুর্গদ্বারের দিকে অশ্বচালনা করিলে এক সহস্র অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। অবশিষ্ট সৈন্য, দুর্গ ও অস্ত্রাগার রক্ষায় নিযুক্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মথুরাসিংহ কারাগারে উপস্থিত হইলেন। তোরণের নিকট অবতরণ করিয়া তিনি দৌবারিককে দ্বার খুলিতে আদেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কারাগার রক্ষকেরা শুনিয়াছিল যে, রাজার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং সৈন্যাধ্যক্ষ স-সৈন্যে কারাগারে উপস্থিত হইবামাত্রই তাহারা বুঝিয়াছিল যে, শুভদিন উপস্থিত; আর তাহাদের কুমার ভবানীপ্রসাদকে কারাগৃহে আবদ্ধ রাখিয়া দ্বার রক্ষা করিতে হইবে না। যে গৃহ অনন্ত পাপে পাপী নরপিশাচদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল এবং যাহাতে চোর, তস্করেরাই বাস করে, সেই গৃহে দয়ার্দ্রহৃদয়, উদার, পরদুঃখহারী ভবানীপ্রসাদকে বদ্ধ রাখিতে তাহারা অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিত। তীব্র দুঃখে তাহারা গত সাত মাস আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ করিয়াছিল এবং কারাগারের চতুর্দ্দিকে যাহাতে গভীর নিশীথকালীন নিস্তব্ধতা সকল সময় রক্ষিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিত।

রক্ষীগণ কুমারের দয়ার্দ্র-চিত্ত ও সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যবহারের জন্ত এত অনুরক্ত ছিল যে, প্রত্যহ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় তাহারা কুমারের প্রকোষ্ঠের সম্মুখে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত। যতই দিন যাইতেছিল, ততই তাহাদের চিত্তে কুমারের প্রতি ভক্তি অচলা হইতেছিল। প্রভাতে গিয়া প্রায়ই তাহারা দেখিত যে, গৃহতলে কুমার যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন,—তাঁহার সর্ব্বশরীর স্থির, নিস্পন্দ। বক্ষের স্পন্দন পর্য্যন্ত তাহারা দেখিতে পাইত না, নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইত না। মুদ্রিত নয়নে কুমার ধ্যান-মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তখন তাহাদের মনে হইত সেই অন্ধকারগৃহ স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছে মনে করিয়া তাহারা আনন্দে দিশাহারা হইত; কখনও বা পুলকভরে তাঁহারই পদতলে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত; আবার কখনও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিত এবং মনে করিত ছুটিয়া গিয়া রাজাকে সংবাদ দিই যে, কারাগৃহে কোন দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। ভক্তি ও আনন্দের আবেগে একদিন তাহারা প্রাসাদ পর্য্যন্ত গিয়াছিল কিন্তু তথায় প্রবেশ করিয়া রাজ-সমীপে এ সংবাদ দিতে সাহস করে নাই। তাহারা নিজের প্রাণের জন্য একবারও চিন্তা করে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, যদি এ সংবাদে কুমারের প্রতি রাজার পুনর্ব্বার রোষোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে কুমারের রক্ষার আর কোন উপায় থাকিবে না। এই ভয়ে ভীত হইয়া তাহারা সেদিন আত্মগোপন করিয়া প্রাসাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবার আদেশ দিবামাত্রই রক্ষীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল—“রাজা ভবানীপ্রসাদের জয়!” অতি ক্ষিপ্রহস্তে তাহারা দ্বার উন্মোচন করিয়া ভবানী-প্রসাদের ঘরের নিকট আসিল এবং সেখানেও দ্বার খুলিয়া দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

মথুরা কুমারের নিকট গেলেন এবং গৃহতল হইতে সাদরে তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"এস ভবানীপ্রসাদ—অশ্ব প্রস্তুত, আমার সঙ্গে প্রসাদে চল"। রাজকুমারোপযোগী পরিচ্ছদ পরাইয়া মথুরা ভবানীপ্রসাদকে লইয়া অতি ক্ষিপ্রপদে গৃহের বাহিরে আসিলেন।

দ্বারপালদ্বয় কুমার ও সৈন্যাধ্যক্ষের পদধূলি গ্রহণ করিল। ভবানী-প্রসাদ মথুরার সহিত কারাগার হইতে বাহির হইলেন।

রাজ-পথে অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া ভবানীপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন। কুমারকে দেখিয়া সকল সৈনিকই অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিল।

প্রাসাদে আসিয়া ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন যে, প্রাসাদের সম্মুখে বহুতর সৈন্য সমবেত রহিয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তনে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইল।

সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ রাজপথে সৈন্যদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া মথুরা কুমারকে লইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। দ্বার অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা ভিতরে যাইতেছিলেন, তখন একটা করুণ ক্রন্দনধ্বনি কুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কুমার অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ীর সব মঙ্গল?"

মথুরা বলিলেন, ভিতরে চল, সবই বলিতেছি। কল্যাণী ভাল আছে; কিন্তু রাজ্যে একটা মহা বিপদ্-পাত হইয়াছে।

মথুরা কুমারকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজার প্রকোষ্ঠের নিকট গিয়া বলিলেন, "তুমি ভিতরে যাও, সব বুঝিতে পারিবে। আমি একটু পরেই আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সভাগৃহের দিকে আসিতে আসিতে মথুরা দেখিলেন, বিষ্ণুদয়াল রাজস্ব-সচিব কৃষ্ণবল্লভের সহিত কথা কহিতেছেন। সৈন্যাধ্যক্ষকে দেখিয়াই

তিনি বলিলেন—পান্নাসিংহের পুত্র ও প্রতিবেশীরা কিছুপূর্ব্বে আসিয়া তাঁহার মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে প্রায় চারিশত লোক আসিয়াছিল। এখানে তাহারা কোন গোলযোগ করে নাই কিন্তু পরে শুনিতে পাইলাম যে, তাহারা রাজপথে চিৎকার করিতে করিতে আসিয়াছিল—"আমরা মন্ত্রী পান্নাসিংহের মৃত্যুর কারণ জানিতে চাই। আমরা এ হত্যার প্রতিশোধ লইব।"

অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার বোধ হয় দূর হইতে প্রাসাদপার্শ্বে সশস্ত্র সৈন্য দেখিয়া তাহারা নীরব হইয়াছিল। তাহারা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করে তখন তোরণ দ্বারের নিকট পাঁচশত সশস্ত্র সৈন্য দেখিয়া একটু ভগ্নোৎসাহ ও নিরাশ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা সশস্ত্র ছিল। যদি পূর্ব্ব হইতে আমাদের এরূপ বন্দোবস্ত না হইত তাহা হইলে এইখানেই তাহারা একটা উৎপাত করিত। আপনার দূরদর্শিতার জন্য প্রাসাদ এবং পুরবাসিনীগণ আজ রক্ষা পাইয়াছে। এখন আপনি কি ভাবে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন?"

মথুরা বলিলেন, "আমরা এখনই কুমারকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিব। রাজস্বসচিব আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে। কুলগুরুহিত এইখানেই উপস্থিত আছেন। কুমারের মঙ্গলস্নান সম্পাদন করাইয়া আমি শীঘ্র তাঁহাকে মন্ত্রণা গৃহে আনিতেছি। সেইখানেই আপনারা সমবেত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করাইবেন। সৈন্যদিগের মধ্যে বাদক আছে। তাহারাই অভিষেক বাদ্য বাজাইবে এবং দুই সহস্র সৈন্য সমস্বরে মঙ্গল-ধ্বনি করিয়া অভিষেকবার্ত্তা ঘোষিত করিবে।" এই কথা বলিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাজপ্রকোষ্ঠের নিকট গিয়া মথুরা দেখিলেন, কুমার অতি বিষণ্ণ হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। তিনি কুমারের পৃষ্ঠে হস্ত রাখিয়া বলিলেন,

"এখন অধীর হইলে চলিবে না। পিতৃশোকে কাতর হইয়া দুঃখ করিবার অবসর এখন নাই। তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস। রাজ্যের সকল সংবাদ তোমায় বলিতেছি।"

কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া মথুরা তাহাকে উত্তোলন করিলেন এবং বাহিরে আসিতে আসিতে বলিলেন, "রাজার অকস্মাৎ মৃত্যু দেখিয়া সভাসদ্‌গণ রাজ্য হস্তান্তরিত করিবার জন্য বিদ্রোহী হইয়া নগরবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। অচিরেই রাজ্যে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। আর বিলম্ব না করিয়া আমরা এখনই তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর আর আমি তোমারই সেবক হইয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপনা করি।" এই কথা বলিতে বলিতে মথুরা কুমারকে লইয়া বহির্বাটিতে আসিলেন।

অভিষেকের সময় যে সকল শাস্ত্রসঙ্গত আচার অনুষ্ঠিত হয় তাহার সকলগুলিই সংক্ষেপে পালন করা হইল, কিন্তু অভিষেকোৎসবের আনুষঙ্গিক যে সকল কৌলিক আচার প্রচলিত ছিল তাহার কোনটিই সম্পাদিত হইল না। বিনা সদনুষ্ঠানে, বিনা উৎসবে, বিনা আমোদে, নাগরিক ও অন্যান্য মিত্ররাজন্যবর্গের অনুপস্থিতিতে, কেবল অশ্রুজলের মধ্যে ভবানীপ্রসাদ রাজপরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। ভবানীপ্রসাদের অভিষেক-বার্ত্তা ঘোষিত করিবার জন্য দুই সহস্র সৈন্য সমস্বরে চিৎকার করিল—রাজা ভবানীপ্রসাদের জয়! রাজা ভবানীপ্রসাদের জয়!! রাজা ভবানীপ্রসাদের জয়!!!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইলে সকলেই মৃত-দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। এই অবসরে রাজা ভবানীপ্রসাদ অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ শয়নাগারে গমন করিলেন। দূর হইতে দেখিলেন যে, তথায় এক সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমে তিনি কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রকোষ্ঠের নিকট আসিয়া বুঝিলেন যে, কল্যাণীকেও তাঁহার শয়নাগারে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

দূরে দাঁড়াইয়া ভবানীপ্রসাদ প্রহরীকে নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। প্রহরী নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এখানে কি করিতেছ?

প্রহরী উত্তর করিল—"রাজাদেশে আমি এখানে পাহারা দিয়া থাকি। এই ঘরের ভিতর যিনি আছেন, তাঁহাকে ঘরের বাহিরে যাইতে দিবার হুকুম নাই এবং অপর কেহ বিনা রাজাদেশে ঘরের ভিতরে যাইতে পারে না।"

রাজা ভবানীপ্রসাদ বলিলেন—"আজ হইতে এই দ্বারের নিকট কোন প্রহরী থাকিবে না।"

প্রহরী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। ভবানীপ্রসাদ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, দ্বার ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ। নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে তিনি আবার বাহিরে আসিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। নগর হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। সকলে শব লইয়া যাত্রা করিবেন এমন সময় একজন অশ্বারোহী দূত আসিয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে সংবাদ দিল—নগরের শেষভাগে

দুই চারিটি গৃহস্থের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া কতকগুলি দুষ্টলোক তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেছে। নগরে আরও অনেক প্রকার অশান্তির লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

সৈন্যাধ্যক্ষ তুর্য্যধ্বনি করিলেন। এক সহস্র সৈন্য অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিল।

মথুরা বলিলেন—"আপনারা পাঁচশত সৈন্য লইয়া মৃতদেহের সৎকারের জন্য যাত্রা করুন এবং যত শীঘ্র সম্ভব সে কার্য্য সমাধা করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আমি পাঁচ শত সৈন্য লইয়া নগর রক্ষার্থে পরিভ্রমণ করিব। অবশিষ্ট এক সহস্র পদাতিক সৈন্য প্রাসাদ রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে।"

মথুরা পাঁচ শত সৈন্য লইয়া বিদ্রোহী-দমনার্থ যাত্রা করিলে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী মৃত রাজার দেহ নদীতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাহির হইলেন। অতি সংক্ষেপে যাহাতে এই কার্য্য সমাপ্ত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সামান্য ধন-রত্নাদি বিতরণ করিতে করিতে সকলে সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা অমরনাথের দেহ লইয়া চলিলেন।

সংসারের ইহা এক বিচিত্র গতি। যাহার যাহা আছে তাহাতে সে সন্তুষ্ট হয় না; যাহার যাহা পাওয়া সম্ভব সে তাহা চায় না। সকলেই এক বিপুল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করে এবং যখন তাহা পূর্ণ হয় না, তখনই দুঃখ অনুভব করে। জীবনে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ায় পরিতৃপ্ত-চিত্ত মানুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষকার ও অধ্যবসায়-দ্বারা যাহারা নিজের নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে, তাহারা আবার আকাঙ্ক্ষার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া নিজের পুত্র কলত্রাদিতে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত করিতে উৎসুক হয়। তাহাদের মনে যখন এই প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়, তখন তাহারা বুঝিতে পারে না যে, নিজের উপর যেরূপ আধিপত্য থাকে পুত্রাদির উপর

তাহার কণামাত্রও থাকে না। যাহারা মনে করে যে, সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয়—পুত্র, কন্যা, বা স্ত্রীর উপর আধিপত্য আছে, তাহারা ভ্রান্ত। কাহারও শরীরের উপর একজনের ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু অন্তরের উপর আধিপত্য কোনরূপেই থাকিতে পারে না। সেইজন্যই দেখা যায় যে, পিতার শত চেষ্টা সত্ত্বেও পুত্র পিতৃ-উদ্দেশ্য উপেক্ষা করিয়া বিভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিতেছে। সুতরাং পুত্রকলত্রাদি দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার বাসনা রাখিয়া অনেকে নিজের পরিতৃপ্ত জীবনে দুঃখ আনয়ন করে। বাসনাপূর্ণ জীবনের শেষ সর্ব্বত্রই এক প্রকার; মানব-জীবনের শেষ দিনে বাসনা অপূর্ণই থাকিয়া যায়। বোধ হয়, সেই নির্ব্বিকার, বাসনাশূন্য ভগবানের প্রতি চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্যই সংসারে এরূপ গতিবিধি নিরূপিত হইয়াছে।

রাজা অমরনাথের বাসনা ছিল যে, রায়পুর রাজ-বংশের কৌলিক প্রথা, কৌলিক আচরণ তিনি চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। তাঁহার অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল। সহৃদয় পিতৃ-সাহায্যে ও অর্থের প্রাচুর্য্য হেতু তিনি সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজ্যভার হস্তে লইয়া তিনি একদিনও কৌলিক প্রথার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি পরমানন্দে রাজত্ব করিতেছিলেন কিন্তু পুত্র ভবানীপ্রসাদের হস্তে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত করিবার বাসনা করিয়াই অশান্তির সূত্রপাত করিলেন। বংশপরম্পরাগত আচার রক্ষা করিবার জন্য পুত্রকে কারাগৃহে আবদ্ধ রাখিয়া রাজা অমরনাথ অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন। এমন সময় সর্ব্ব-দুঃখহর মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল দুঃখ দূর করিল।

রাজা অমরনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রায়পুর-রাজ্যে চিরপ্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ হইল। ঘটনাস্রোত এরূপ দাঁড়াইল যে, তাঁহারই দেহের সৎকারের সময় অধিকাংশ নিয়মই রক্ষিত হইল না। অতি সামান্যভাবে

এবং যত শীঘ্র সম্ভব শবদাহ করিয়া সকলে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে মথুরা সৈন্য লইয়া নগর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, অনেক গৃহ দগ্ধ হইতেছে; কতিপয় গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং বিদ্রোহে যোগদান করে নাই বলিয়া গৃহবাসীদিগের উপর নানাবিধ অত্যাচার হইতেছে। তিনি দেখিলেন, বিদ্রোহীদল রাজপথে ছুটাছুটি করিতেছে এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে যে, যাহারা বিদ্রোহে যোগ না দিবে তাহাদের সকলেরই অশেষ দুর্দ্দশা ঘটিবে।

অকস্মাৎ অশ্বারোহী রাজসৈন্য দেখিয়া তাহারা একটু ভীত হইল এবং রাজপথ ছাড়িয়া যে যেদিকে পাইল পলায়ন করিল।

বিদ্রোহীদিগকে অনুসরণ না করিয়া একটি কোলাহল লক্ষ্য করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে অশ্বচালনা করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, মাঠের মধ্যে অনেক লোক মণ্ডলাকারে সমবেত হইয়াছে। সেই জনতামধ্য হইতে উত্থিত এক করুণ ক্রন্দন ও বিলাপধ্বনি তিনি শুনিতে পাইলেন। সৈন্যদিগকে লইয়া মথুরাসিংহ দ্রুতবেগে তথায় গিয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়ায় বিদ্রোহীদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তাহারাও আক্রমণ করিল কিন্তু যুদ্ধনিপুণ রাজসৈন্যের তরবারির আঘাতে শীঘ্রই অনেকে প্রাণ হারাইল। কেহ কেহ আহত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজসৈন্য বিদ্রোহীদিগকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিলে মথুরাসিংহ আদেশ করিলেন, "আর রক্তপাত করিও না; সকলকে এই অবস্থায় বন্দী কর। যদি কেহ বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিবে।"

জয়লাভ করিয়া রাজসৈন্য সমস্বরে চিৎকার করিল—রাজা ভবানী-প্রসাদের জয়! তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল, "যে যেমন আছ ঠিক

ঐ ভাবেই থাক ; একটু নড়িলেই প্রাণ হারাইবে।" বিদ্রোহীদল বশ্যতা স্বীকার করিল। রাত্রি দ্বিতীয়-প্রহরের পর তাহারা রাজসৈন্য হস্তে বন্দী হইল।

সমস্ত রাত্রি মথুরা সসৈন্যে বন্দীদিগকে লইয়া সেইস্থানে রহিলেন। রাত্রিশেষে দূতমুখে আদেশ পাঠাইলেন যে, প্রাসাদ হইতে পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য অবিলম্বে এইস্থানে উপস্থিত হইবে। দূত তীরবেগে অশ্বচালনা করিয়া প্রাসাদাভিমুখে গমন করিল।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পাঁচশত সৈন্য আসিয়া প্রান্তরে উপস্থিত হইল। উষালোকে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শত্রুব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া মথুরা দেখিলেন, কতিপয় পুরুষ স্ত্রীপুত্র লইয়া তাহার মধ্যে বসিয়া আছে। সৈন্যাধ্যক্ষকে দেখিয়াই তাহারা ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল - "ইহারা আমাদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছে, সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে, আমাদিগকে মারিয়াছে।" তাহাদের দুঃখ দেখিয়া মথুরা ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।"

নির্য্যাতিত গৃহস্থদিগকে লইয়া মথুরা জনতা হইতে বাহির হইলেন এবং কতিপয় সৈন্যকে বলিলেন, "তোমরা এই ভদ্র-পরিবারদিগকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া প্রাসাদে লইয়া যাও। বিষ্ণুদয়ালকে ইঁহাদের অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া কাপড় ও আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিবে। দেখিও, যেন এই ভদ্র গৃহস্থদিগের কোন অসুবিধা না হয়। ইঁহাদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিয়া আবার তোমরা নগরমধ্যে আমার সঙ্গে যোগ দিবে।"

সৈন্যগণ গৃহস্থদিগকে লইয়া যাত্রা করিলে মথুরা কতকগুলি সৈনিককে বলিলেন, "এই যুদ্ধক্ষেত্রে কোন আহত ব্যক্তির এখনও প্রাণ আছে কি না অনুসন্ধান করিয়া দেখ। যদি কাহাকেও জীবিত দেখ, তাহা হইলে অচিরে তাহাকে চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইবে। অবশিষ্ট সৈন্যগণ এই বিদ্রোহী-

দিগকে নিরস্ত্র করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিবে। কারাগার রক্ষার জন্য তথায় একশত সৈন্য মাত্র থাকিবে এবং অবশিষ্ট সৈন্য নগরে আসিয়া রাজ-সৈন্যে যোগ দিবে। আমি এখন নগরে বিদ্রোহী দমন করিতে যাইব।"

সৈন্যাধ্যক্ষ এই সকল ব্যবস্থা করিয়া নবাগত পাঁচশত সৈন্য লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যেখানে কোনরূপ অত্যাচার বা উৎপীড়নের কথা শুনিতে পাইলেন সেইখানেই সসৈন্যে মথুরাসিংহ উপস্থিত হইয়া অত্যাচারী বিদ্রোহীদিগকে বন্দী করিতে লাগিলেন। নগর মধ্যে বিশেষ রক্তপাত না করিয়া প্রায় চারিশত বন্দী লইয়া সৈন্যাধ্যক্ষ সন্ধ্যাকালে কারাগারে উপস্থিত হইলেন।

নগরে বিপ্লবকারীদিগের অত্যাচার বন্ধ হইল বটে কিন্তু কতিপয় নগর-বাসীর মধ্যে বিদ্বেষভাব তখনও বর্ত্তমান ছিল। সেই জন্য মথুরাসিংহ সৈন্যমধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন যে, সাধারণ শান্তিরক্ষক ব্যতীত একমাস কাল প্রত্যহ সকল সময় পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য নগর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে। এই উপায় অবলম্বন করায় রায়পুর রাজ্যে ত্বরায় শান্তি পুনঃস্থাপিত হইল। কুমার ভবানীপ্রসাদকে রাজ্যের অধীশ্বররূপে পাইয়া নগরবাসী আনন্দিত হইল।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

অতি দুর্দ্দিনে, চারিদিকের রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্যে ভবানীপ্রসাদ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। রায়পুর রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া তিনি যে বিশেষ তৃপ্তি পাইয়াছিলেন তাহা নহে। কিন্তু এই সুযোগ তাঁহার প্রেমাস্পদ-বিরহিত হৃদয়-সিংহাসনে প্রাণপ্রিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠাসাধনে সক্ষম হইয়াছিল বলিয়া ভবানীপ্রসাদ আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। যে কোমল প্রকৃতির জন্য তাঁহাকে গত সাতমাস কাল নির্জ্জন কারাগৃহে বসতি করিতে হইয়াছিল, তাঁহার সেই প্রবৃত্তি অনুসারে এখন তিনি নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য করিতে পারিবেন বলিয়া সাগ্রহে এ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। যে পরহিতাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং যাহার জন্য কল্যাণীর সহিত মিলিত হইয়া সেই বধ্য ব্যক্তির প্রাণভিক্ষা করায় স্ত্রীর সহিত তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল—এখন সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না জানিয়া তিনি সানন্দে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বে এ রাজ্যে কাহারও অভিষেক হইলে নানা প্রকারের সদনুষ্ঠান হইত। কিন্তু ভবানীপ্রসাদ যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন কোন অনুষ্ঠানই সম্পাদিত হইল না। দুঃস্থ প্রজা ও দরিদ্রদিগের মধ্যে ধন বিতরিত হইল না; কারা-গৃহ হইতে বন্দীদিগকে মুক্ত করা হইল না। পূর্ব্বে রাজাজ্ঞায় প্রত্যক্ষে যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইত, আজ পরোক্ষে রাজা ভবানীপ্রসাদ নিজহস্তে সেই কার্য্য সাধন করিলেন। অভিষেকের

পর রাজা স্বয়ং বন্দীর বন্ধন মুক্ত করিলেন, এবং দীনজনকে স্বহস্তে আহার্য্য দিলেন। এ দয়ার পাত্র আর কেহ নহে; তিনি রাজমহিষী কল্যাণী।

অভিষেকের পরক্ষণেই রাজা ভবানীপ্রসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠের দ্বারস্থিত রক্ষককে দ্বারত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর পিতৃদেহের সংকার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি শয়নাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, দ্বার তখনও পূর্ব্বের ন্যায় ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। রাজা কিছুক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া রহিলেন; কিন্তু নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলেন না। তখন দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া অতি কাতর, অতি রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন,—"কল্যাণি!"

দ্বার অর্গলমুক্ত হইল। ভবানীপ্রসাদ দ্বার খুলিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—গৃহ অন্ধকারময়। সুতরাং, বাহিরে আসিয়া বর্ত্তিকাধার হইতে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা লইয়া পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন। সেই ক্ষীণালোকে গৃহতলে তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চিত্তে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। জীর্ণা, রুক্ষ-কেশা, মলিনবসনা স্ত্রী-মূর্ত্তি গৃহতলে শয়ানা দেখিয়া প্রথমে তিনি চিনিতে পারেন নাই; কিন্তু যখন সেই মূর্ত্তি অতি কষ্টে উত্থিত হইয়া ভবানীপ্রসাদের চরণোপরি মস্তক রক্ষাপূর্ব্বক অবিরাম বিগলিত অশ্রুপ্রবাহে চরণ-দ্বয় সিক্ত করিলেন, তখন ভবানীপ্রসাদ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। আজ তিনি কল্যাণীর অকৃত্রিম প্রেমের যে পরিচয় পাইলেন, সেরূপ পরিচয় পূর্ব্বে আর কখনও প্রাপ্ত হন নাই। তখন গাঢ় আলিঙ্গনে তিনি কল্যাণীকে হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন।

যে দৃশ্য আজ এই রাজ-প্রাসাদ পবিত্র করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিলে মনে হইবে যে, কল্পনাপ্রসূত রাজ্যে এরূপ দৃশ্য সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু

বাস্তব জগতে ইহা কদাপি দৃষ্ট হয় না। এরূপ ঘটনা জগতের অন্যস্থানে অতি অস্বাভাবিক বা অসম্ভব হইলেও পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে। এরূপ চিত্র আমাদের মানসদর্পণে প্রতিভাসিত হইলে বদনমণ্ডলে তাহা ঘৃণা বা অবজ্ঞারূপে প্রতিফলিত হয় না। একটি জীবনের জন্য অপর একটি জীবন কর্ম্ম-বিরহিত হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় ক্ষয়িত হইতে দেখিলে পাশ্চাত্য জাতি হাসিতে পারে, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন স্বদেশবাসী বিদ্রূপ করিতে পারে, কিন্তু যাহারা ধর্ম্মমূলক দেশীয় উপাদানে গঠিত ও শিক্ষিত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় যাহাদের চিত্ত বিকৃত হয় নাই, তাহারা এরূপ জীবনকে ভক্তির চক্ষে দেখিবে, আদর্শ জীবন মনে করিবে।

এই সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যেখানে রাজনন্দিনী উমা, বিভূতি-ভূষিত শ্মশানবিহারী মহেশ্বরের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া দুষ্কর তপস্যার দ্বারা শরীর ক্ষয় করিয়াছিলেন এবং যথায় পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দক্ষসুতা সতী, পিতৃ-ভবনে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; এই সেই দেশ যথায় সতীরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া দেবাদিদেব স্ত্রীর মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যথায় স্বামীর বিচ্ছেদ অসহনীয় বোধ হওয়ায় জনক-নন্দিনী সীতা রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া গহন-বনে স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন; এই সেই ধর্ম্মক্ষেত্র, যথায় নন্দ-নন্দন শ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনি শ্রবণ-মাত্রে পতি-প্রেম মুগ্ধ-হৃদয়া ব্রজনারী পতি-পুত্র ত্যাগ করিয়া কানন-বাসিনী হইয়াছিলেন, এবং যথায় সন্ন্যাসাবলম্বী পতির ক্লেশ স্মরণ হওয়ায় রাজপুত্র-বধূ গৌতম-বুদ্ধপত্নী গোপা প্রাসাদে থাকিয়াও সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। এই পুণ্য-স্মৃতি ধারণ করিয়া ভারতের গৌরব-কেতন আজিও অনন্ত আকাশে উড়িতেছে। এই আদর্শ-প্রেম স্মরণ মাত্রেই আবেগে মোহিত হইয়া ভারতবাসী আজিও আত্মহারা হইয়া পড়ে।

শোকের প্রথম আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন—কল্যাণীর চিক্কণ কুঞ্চিত অলকদাম রুক্ষ জটারাশিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে কবরীপরিবেষ্টন করিয়া সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম-মালিকা সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিত এবং তাহারই পরাগে মস্তক ধূসর হইয়া সুগন্ধ বিকীর্ণ করিত, এখন তথায় ধূলিকণা একে একে সমবেত হইয়া সেই জটাভার আরও ধূসর করিয়াছিল। যে সুন্দর কপোলদেশ কোমল উপাধানে রক্ষিত হওয়ায় রক্তিম হইয়া উঠিত, এখন প্রস্তরময় গৃহ-তলে বিনা উপাধানে শয়ন করায় তাহা কঠিন ও কালিমাবিশিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বদনমণ্ডলের যে যে স্থান পূর্ব্বে পলাশ-কুসুমের পরাগলিপ্ত হওয়ায় হরিদ্রাভ হইয়া থাকিত, এখন অশ্রু-জল বিশুষ্ক হওয়ায় সেই সেই স্থান পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন যে, বিকশিত-কমলিনীর ন্যায় কল্যাণীর চিত্তহারিণী মূর্ত্তি বিরহানলে দগ্ধ হইয়া সূর্য্যোত্তাপ-নিপীড়িত স্থলপদ্মের ন্যায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। কল্যাণীর হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইবার পরেই তিনি যে দুঃসহ শোক ভোগ করিয়াছিলেন, আজ তাহা আবার নূতন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন, তাঁহার শয্যা, তাঁহার বসন-ভূষণ, তাঁহার কাষ্ঠাসন—সকলই সুবিন্যস্ত, পরিষ্কৃত রহিয়াছে; কিন্তু কল্যাণীর সকল বস্তুই অপরিচ্ছন্ন, ধূলি-ধূসরিত; দেখিলেই মনে হয় বহুকাল তাহার কোনটিই স্পর্শ করা হয় নাই। কল্যাণীর জীর্ণ মলিন কার্পাসবস্ত্র দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই দীর্ঘ সাতমাস কাল তিনি এক-বস্ত্রে ছিলেন। অপ্রতিহত-বেগে ভবানীপ্রসাদের অশ্রুজল প্রবাহিত হইয়া কল্যাণীকে আর্দ্র করিতে লাগিল।

ভবানীপ্রসাদ চিন্তাশীল যুবক। বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ

দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ উপভোগ করিতেন। সৌন্দর্য্যানুভূতির জন্য যখন উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতেন তখন বিবিধ পত্র ও পুষ্পের বর্ণ সমাবেশ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইতেন। সৌন্দর্য্যলোলুপ ভবানীপ্রসাদ তাঁহার সৌন্দর্য্য লিপ্সার পরিতৃপ্তির জন্য বিবিধ বেশ-ভূষায় কল্যাণীকে সাজাইতেন। কল্যাণীও স্বামীর চিত্ত বিনোদনের জন্য অতি যত্নে, অতি আগ্রহে, তাঁহার অভিলাষানুরূপ বেশ ধারণ করিতেন। আজ কল্যাণীর অবস্থা দেখিয়া ভবানীপ্রসাদ বুঝিলেন, স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বেশভূষা অবৈধ মনে করিয়া স্ত্রী সকল ভোগ-বিলাসই ত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপ পতিপ্রাণা স্ত্রীর সাহচর্য্য লাভ করিয়া ভবানীপ্রসাদ স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

কল্যাণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া, তাঁহার সেই শুষ্ক মলিন মুখখানি দেখিয়া অসীম দুঃখের মধ্যে ভবানীপ্রসাদ যে আনন্দ পাইতেছিলেন তাহা সাধারণের ধারণাতীত। এ সুখ উপভোগ করা দূরে থাক, কল্পনা প্রভাবেও এ সুখের আস্বাদ গ্রহণ করা অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। রাজার ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ, অপ্সরার রূপ—কিছুই এ সুখ দিতে পারে না। এ সুখ দিতে হইলে প্রেমপূর্ণ হৃদয় থাকা চাই, এ সুখ ভোগ করিতে হইলেও প্রেমিকের হৃদয় থাকা আবশ্যক। ভবানীপ্রসাদ সেই হৃদয় বিনিময়ের সুযোগ আজ পাইয়াছেন বলিয়া ভগবানকে শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

কল্যাণী তাঁহার প্রাণের দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তাঁহারই শ্রীচরণে মস্তক রাখিতে পাইয়াছেন, তাঁহারই দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্বামী যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজ বক্ষে ধারণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি আবেগ ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ-হৃদয়ে অনিমেষলোচনে স্বামীর মুখপ্রতি চাহিয়া

ছিলেন, এমন সময় ভবানীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি অসুস্থ হইয়াছিলে? তোমার শরীর এত শীর্ণ দেখিতেছি কেন?"

উন্মুক্ত-হৃদয়া, সরলপ্রাণা কল্যাণী বলিয়া উঠিলেন, "কোন রোগ হয় নাই। এত প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু কোন কামনাই পূর্ণ হয় নাই। বুঝি ভগবান আমারই হিতের জন্য সে কামনা পূর্ণ করেন নাই। সে কামনা পূর্ণ হইলে আজ আমার দেবতার সাক্ষাৎ পাইতাম না। আমার সাধনা সফল হইয়াছে। অনশনে ও অর্দ্ধাশনে যে চিন্তা করিতাম তাহার সিদ্ধি হইয়াছে। আর যেন এ শান্তিপ্রদ পরম পবিত্রস্থান হইতে কখনও বঞ্চিত হইতে না হয়"—এই কথা বলিতে বলিতে কল্যাণী স্বামীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ক্লান্তভাবে নীরব রহিলেন। হিমাদ্রি-তনয়ার ন্যায় পবিত্র মূর্ত্তিখানিকে ধারণ করিয়া ভবানীপ্রসাদ তদবস্থায় অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রভাত হইলে ভবানীপ্রসাদ কল্যাণীর সেবার সকল প্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য বাহিরে আসিলেন।

সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া রাজা দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদয়াল ও রাজস্ব-সচিব কৃষ্ণবল্লভ তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহারা সসম্মানে আসন ত্যাগ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় রাজা ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "আপনারা আমার পিতৃব্য-স্থানীয়। আপনাদের চেষ্টায় পিতৃরাজ্য রক্ষায় সমর্থ হইয়াছি। আপনারা যদি এভাবে আমাকে কুণ্ঠিত করেন তাহা হইলে আমি আন্তরিক দুঃখিত হইব।"

অতি শিষ্টাচারের সহিত তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া ভবানী-

প্রসাদ তাঁহাদের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। রাজ্য সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তা কাহতে কহিতে মন্ত্রী পান্নাসিংহের কথা উত্থাপিত হইল। বৃদ্ধ বিষ্ণুদয়াল পূর্ব্ব দিবসের হত্যা সম্বন্ধে বলিতেছিলেন এমন সময় কৃষ্ণবল্লভ বলিলেন,—"পান্নালাল যে বহুদিন হইতে এরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। সে যে একটা মহাপাপী ছিল তাহার প্রমাণ আমি অনেক সময় পাইয়াছি। এত বড় বিশ্বাস-ঘাতককে এ জগত হইতে সরাইতে পারিয়াছে বলিয়া আমি সেই প্রতিহারীকে শত ধন্যবাদ দিতেছি।"

তাঁহাদের মধ্যে এইভাবে আলোচনা হইতেছিল এমন সময় দূতমুখে সংবাদ আসিল—"অনেক বিদ্রোহী রাজসৈন্যের হস্তে বন্দী হইয়াছে। সৈন্যাধ্যক্ষ নগর মধ্যে বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন না করিয়া প্রাসাদে ফিরিবেন না। পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি নগরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং যেখানে বিদ্রোহী দেখিতে পাইতেছেন সেই খানেই তাহাকে ধরিতেছেন। রক্তপাত অতি অল্পই হইতেছে।"

দূত চলিয়া যাইবার পর কতকগুলি লোক সৈন্যরক্ষিত হইয়া প্রাসাদে উপস্থিত হইল। বিষ্ণুদয়ালের নিকট তাহাদের আগমন-বার্ত্তা জানান হইলে রাজা তাঁহার ও কৃষ্ণবল্লভের সহিত বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিলেন। সৈন্যদের নিকট তাহাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া ও গৃহস্থদিগের পরিহিত বসন ছিন্ন ও রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া সকলে অত্যন্ত দুঃখানুভব করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণবল্লভকে বলিলেন—"আপনি রাজভাণ্ডার হইতে ইহাদিগের জন্য বস্ত্র ও আহার্য্য সামগ্রী প্রেরণ করিবার সুব্যবস্থা করুন। ইতিমধ্যে বিশ্রামের জন্য আমি ইহাদিগকে উপবন বাটিকায় পাঠাইতেছি। সেইস্থানে এই গৃহস্থ পরিবারেরা উপস্থিত বাস করিবে এবং রাজকোষ হইতে তাহাদের আহার ও পরিচর্য্যার সকল ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।"

প্রতিহারীকে ডাকিয়া রাজা তাহাদের উপবন বাটিকায় প্রেরণ করিলেন এবং সেই বিপন্ন গৃহস্থ পরিবারদিগের পরিচর্য্যার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে বলিলেন। কৃষ্ণবল্লভ রাজার আদেশ পালনার্থ স্থানান্তরে গমন করিলেন।

দুঃস্থ ব্যক্তিগণ চলিয়া গেলে রাজা বিষ্ণুদয়ালের সহিত পুনর্ব্বার সভাগৃহে আসিয়া উপবেশন করিলেন। মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া বিষ্ণু-দয়াল ভবানীপ্রসাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "এ রাজ্যে কোন রাজা নাই ; সুতরাং মন্ত্রীরও কোন আবশ্যকতা দেখি না। স্বয়ং ভগবানই এ রাজ্যের অধিপতি—আমরা সকলেই তাঁহার সেবক। তাঁহারই উপলক্ষ্য হইয়া আমরা এখানে কার্য্য করিতে আসিয়াছি। আপনার পরামর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, স্বার্থত্যাগী কর্ম্মবীর মথুরা সিংহ, ভ্রাতৃ-প্রতিম অরুণসিংহ ও কল্যাণীর সাহায্যে আমি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব। রাজ্য পালন করিব প্রজার সুখের জন্য ; অত্যাচার দমন করিব প্রজার শান্তির জন্য ; কর গ্রহণ করিব প্রজার অসময়ে দুঃখ দূর করিবার জন্য।"

"রাজা বা ভূম্যাধিকারী প্রজার প্রকৃত পালক। পিতা-মাতার হস্তে যেরূপ সন্তানের ইষ্ট অনিষ্ট নির্ভর করে, রাজার হস্তে প্রজার সুখ দুঃখ সেইরূপ নির্ভর করে। বিজাতীয় রাজার হস্তে দুঃখ পাইলে প্রজার যত কষ্ট হয়, দেশীয় রাজা তাহাদের দুঃখের কারণ হইলে তাহারা ততোধিক কষ্ট অনুভব করে। সেই প্রজাপালক হইয়া প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ মন্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কি করিয়া আমি আত্ম-সুখান্বেষণ করিব? যে রাজ্যে প্রজা দুঃখ পায়, যদি সেই রাজা আপন ভোগ-সুখের জন্য ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে সেই ভোগ-প্রবৃত্তি রাজার নীচতার পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাতে রাজার সম্মান বৃদ্ধি হয় না। তাহাতে রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হয় না। সহৃদয় রাজভক্ত প্রজা পাইতে হইলে, রাজাকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে ; প্রজার সুখ ও উন্নতির জন্য রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্য করিতে হইবে।

এবং সময় বুঝিয়া সেই অর্থ কর-রূপে আদায় করিয়া রাজ-ভাণ্ডারে পুনরায় সঞ্চয় করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত রাজধর্ম্ম। আমি সেই রাজধর্ম্ম পালন করিব। রাজ-ভাণ্ডার আজ হইতে পরহিতার্থে উন্মুক্ত হইল; রাজ-কোষের উপরে আজ হইতে সকলের সমান অধিকার হইল।"

ভবানীপ্রসাদ আরও বলিতে লাগিলেন—"রাজা-প্রজায় কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই মানুষ; উভয়ে একই প্রকার রক্তশিরাবিশিষ্ট মনুষ্য। উভয়েই পৃথিবী-পৃষ্ঠে ভূমিষ্ঠ হইয়া অসহায় অবস্থায় মাতৃ-ক্রোড়ে মাতৃ-স্নেহে প্রতিপালিত হয়। উভয়েই এক বায়ু সেবন করিয়া জীবন ধারণ করে। শরীর রক্ষার্থে উভয়কেই আহার করিতে হয়। উভয়েরই এক অন্তঃকরণ, এক প্রাণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই এক। লোক চক্ষুর সমক্ষে যে পার্থক্যটুকু দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তকালে তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ হয়। যেটুকু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শুধু বাহ্যিক, শুধু ভগবানের অনুগ্রহে তাহা সংসাধিত হইয়াছে। ভগবান আমাকে কর্ম্মঠ দেখিয়া, হিতাহিত জ্ঞান-সম্পন্ন দেখিয়া, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দেখিয়া, তাঁহারই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য আমায় এ রাজ্যভার দিয়াছেন। এ গুরুভার প্রাপ্ত হইয়া, ভগবানের এত অনুগ্রহ লাভ করিয়া যদি আমি তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম না করিতে পারি, তাহা হইলে যে মহাপাতক হইবে; তাহা হইলে যে এ জীবনের অসৎ কার্য্যের জন্য একবার মাত্র রাজা হওয়ার পর জন্ম-জন্মান্তরে কেবলই ত দীনহীন প্রজা হইতে হইবে। তাহাতে লাভ কি? বরং যদি ইহ-জীবনে কর্ত্তব্য পালন করিয়া ভগবানের সন্তোষ সাধন করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও সুন্দর রাজত্ব পাইবার আশা থাকিবে। আমি সেই রাজত্বের আশায় কর্ম্ম করিব। এত ক্ষুদ্র রাজত্বে আমার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না।"

ভবানীপ্রসাদ নিস্তব্ধ হইলেন। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদয়াল দেখিলেন—

এ রাজত্বে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি মনে করিলেন, রাজ-পরিবারের সকলে এবং রায়পুর রাজ্যের সকল প্রজাই তাঁহাকে পাইয়া ধন্য হইবে।

ভবানীপ্রসাদ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল আরক্ত হইয়া একটা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছিল। বৃদ্ধ বিষ্ণুদয়াল সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন—"দীর্ঘজীবী হও।"

বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া স্নানাহারের জন্য রাজা ভবানীপ্রসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুদয়ালও সভাগৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগরে শান্তি স্থাপিত হইল। মথুরাসিংহ ও অরুণসিংহ রাজ্যপালন করিবার জন্য রাজা ভবানীপ্রসাদকে সকল প্রকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সকলের উদ্দেশ্য এক—সুতরাং এক মনপ্রাণ হইয়া কার্য্য করায় রাজ্যে একটা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে যে রাজসভা ছিল এখন তাহা উঠিয়া গেল। সভার অধিকাংশ সভাসদ্ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া এখন কারাগৃহে আবদ্ধ ছিল। তাহাদের মধ্যে দুই একজন রাজ-সৈন্যের সহিত সংঘর্ষে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। আর নূতন সভা আহূত হইল না। সৈন্যাধ্যক্ষ মথুরাসিংহ, অরুণসিংহ, কৃষ্ণবল্লভ ও বিষ্ণুদয়াল রাজ-সভার সভ্য হইলেন এবং রাজ-মহিষী কল্যাণী পরোক্ষে বসিয়া মন্ত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন।

রাজার কন্যা, রাজার পুত্র-বধূ, রাজার স্ত্রী হইয়াও কল্যাণী কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত বা অসম্মত হইতেন না। তিনি সাধারণ নারীর মত সামান্যা নারী ছিলেন না। অধুনা স্ত্রী বলিলে যেরূপ এক রঙ্গ-রহস্যময়ী, আত্মসুখ-তৎপরা, সখিরূপিণী সহচরী বুঝায়, রাজা ভবানীপ্রসাদের স্ত্রী কল্যাণী সেরূপ প্রকৃতির সহচরী ছিলেন না। তিনি স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিনী ও সহকর্ম্মিনী ছিলেন। সেই জন্য রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে এবং স্বামীকে সকল কার্য্যে সাহায্য করিতে তিনি কখনও বিরক্তি বোধ করিতেন না।

যেখানে সকল কর্ম্মচারী অধিপতির একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্তরের সহিত কর্ম্ম করে, সেখানে কি কোন বিশৃঙ্খলা হইতে পারে? রায়পুর রাজ্য হইতে একে একে সকল বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হইল। সর্ব্বত্রই সুখ এবং শান্তিতে অধিবাসীগণ বসতি করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে সকল কৌলিক আচরণ অনুষ্ঠিত হইত, ভবানীপ্রসাদ তাহার সকলগুলিই পালন করিতে লাগিলেন। প্রতি অমাবস্যায় ভবানী-মন্দিরে পূজা হইতে লাগিল। কিন্তু কোন দিন বলির আয়োজন না দেখিয়া কেহই অসন্তুষ্ট হইল না।

ভবানীপ্রসাদের রাজত্বকালে তৃতীয় বর্ষে তাঁহার একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। তাহারই জন্মোপলক্ষে রাজা এক মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবর্গের জন্য রাজব্যয়ে বিরাট পূজাগৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন। নগরের স্থানে স্থানে নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল। হিন্দুদিগের জন্য মন্দির, বৌদ্ধদিগের জন্য মঠ, ও মুসলমানের জন্য মস্‌জিদ প্রস্তুত হইতে লাগিল।

নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে হিন্দুমন্দিরে বিশ্বনাথ মহাদেবের প্রতিষ্ঠা হইল। এ কার্য্য মহিষী কল্যাণী আসিয়া স্বহস্তে সম্পাদন করিলেন এবং

কন্যা মহামায়ার নামে মন্দির উৎসর্গ করিলেন। সেই অবধি এই মন্দির "মহামায়া মন্দির" নামে পরিচিত হইল। বৌদ্ধমঠ ও মহম্মদীয় মসজিদ রাজা স্বয়ং উৎসর্গ করিয়া দিলেন। দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইলে মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে রাজা এক দানপত্র লিখিলেন। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়োপযোগী অভিমত প্রকাশ করিয়া এবং নগরবাসীর হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ করিবার নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া অবশেষে লিখিলেন—এই রাজধানীতে কোনও দিন কেহ খাদ্যাভাবে অভুক্ত থাকিবে না। যদি কোন দুঃস্থ প্রজা কোন দিন অন্ন সংস্থান করিতে না পারে তাহা হইলে স্বীয় ধর্ম্মানুসারে এই মন্দির-ত্রয়ের কোনটিতে উপস্থিত হইলে সে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিতে পাইবে। যদি কোন বিদেশী অতিথি আসিয়া দেবতার শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রাঙ্গণ পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠে সে এক সপ্তাহের জন্য বাস করিতে পারিবে ও দেবতার ভোগ হইতে প্রত্যহ প্রসাদ পাইবে। যদি কোন সন্ন্যাসী সাধনা বা তপশ্চরণের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে যতদিন ইচ্ছা তিনি এই মন্দিরে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। তাঁহার ভরণ-পোষণের ব্যয় এই উৎসর্গীকৃত অর্থ হইতে নির্ব্বাহিত হইবে। এইরূপে অতিথি অভ্যাগতের সেবার ব্যবস্থা করিয়া, ভগবান তাঁহাকে তাঁহার অপার স্নেহের অধিকারী করিয়াছেন বলিয়া সেই সর্ব্বদুঃখহারী দেবাদি-দেবের শ্রীচরণোদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া দানপত্রের উপসংহার করিলেন।

যখন রায়পুরবাসী সকলে দেখিল যে, রাজা ভবানীপ্রসাদ সর্ব্বধর্ম্মে সমদর্শী, যখন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজার ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা হিন্দুরাজার হস্তে পরিতৃপ্ত হইল, তখন ভবানীপ্রসাদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া সকলে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।

মহামায়া-মন্দিরে নিয়মিতরূপে যখন পূজাদি হইতেছিল, যখন তথায়

মধ্যে মধ্যে উৎসব হইত, তখন একদিন ভবানীপ্রসাদের মনে হইল—নগরবাসী সকলেই এ উৎসবে যোগদান করিতে পায় এবং কিছু আনন্দ উপভোগও করে, কিন্তু যাহারা কারাগৃহে আবদ্ধ আছে, তাহারাই কেবল এ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহা হইতে পারে না। ক্ষণিক অপরাধের জন্য তাহারা যে যাবজ্জীবন কারাগৃহে আবদ্ধ থাকিবে এরূপ অন্যায় বিচার আমি করিতে পারিব না। কল্যাণী এ সংবাদ জানেন না; জানিলে তিনি নিশ্চয় এতদিন বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিতেন। আগামী পূর্ণিমার দিন সকল ধর্ম্মমন্দিরে উৎসবের আয়োজন করাইব এবং সেইদিন বন্দীদিগকে কারামুক্ত করিয়া সাধারণ প্রজার সহিত তাহাদিগকেও উৎসবে যোগ দিতে বলিব। আমি সেই দিন মহামায়া-মন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া বন্দীদিগের আমোদ-প্রমোদ স্বচক্ষে অবলোকন করিব। সে কি আনন্দ! নিজে সুখভোগ করিলে যে আনন্দ হয়, অন্যকে সুখী দেখিলে বোধ হয় তার শতাধিকগুণ আনন্দ পাওয়া যায়। সেই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিবার বাসনা আমার হইতেছে। আর সেই আনন্দ-প্রতিমা! যিনি রাজরাণী হইয়াও স্বহস্তে অন্যের সেবা করিতেছেন, যিনি অন্যের দুঃখ নিজে বহন করিয়া বিপদ মুক্তের সুখে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছেন,—এ সুখ সংবাদে তাহারই বা কত আনন্দ হইবে! ভবানীপ্রসাদ বন্দীদিগকে মুক্তি দিবেন স্থির করিলেন। আগামী পূর্ণিমায় মহামায়ার জন্মোৎসবোপলক্ষে সকল ধর্ম্মমন্দিরে উৎসবের আয়োজন হইবে, এই সংবাদ নগরময় প্রচারিত করিতে আদেশ দিলেন।

পূর্ণিমার দিন মহামায়া-মন্দিরে উৎসব চলিতেছিল, এমন সময় প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া বন্দীর দল তথায় উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণে বন্দীগণ উপনীত হইয়া দেখিল যে, তাহাদের অনেক পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু-বান্ধব উৎসবে মাতিয়া আনন্দ করিতেছে। বিদ্রোহীদল প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া থাকিতে

লজ্জাবোধ করিতে লাগিল। অনেকে পূর্ব্ব দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল।

অকস্মাৎ রাজপথ হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল,—রাজা ভবানী-প্রসাদের জয়! তোরণদ্বার হইতে নহবত স্বাগত জ্ঞাপন করিলে মন্দির প্রাঙ্গণস্থিত সকলেই বুঝিল, রাজা আসিতেছেন। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া তোরণদ্বার প্রতি চাহিয়া রহিল। অল্প পরেই তাহারা দেখিল যে, মথুরা ও অরুণসিংহের সহিত রাজা ভবানীপ্রসাদ প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহারা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সকলে আভূমি প্রণত হইয়া অভিবাদন করিল। প্রত্যভিবাদন করিয়া রাজা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বিশ্বনাথ সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পরে বাহিরে আসিলেন। তথায় ভক্ষ্যদ্রব্য সকল স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে মথুরা ও অরুণের সহিত প্রতি বিভাগের উৎসবে যোগ দিয়া ও নাগরিক-দিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া রাজা উৎসবানন্দ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর রাজা সহচর পরিবৃত হইয়া বন্দীদিগের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আমার কন্যা মহামায়ার আজি জন্মোৎসব; সেই উৎসবে নগরবাসী সকলেই স্থানে স্থানে আনন্দ করিতেছে। এ আনন্দের দিনে তোমরা যে, সকল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে তাহা আমি ইচ্ছা করি না। মহামায়ার নাম কল্যাণ-পূর্ণ করিবার জন্য এই মন্দির তাহার নামেই দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়াছে। তাঁহারই কল্যাণ কামনায় যাবজ্জীবনাবদ্ধ সকল বন্দী-কেই মুক্তি দেওয়া হইবে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আজ তোমা-দিগকেও এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে দেখিবার বাসনা করিয়াছি।

সৈন্যাধ্যক্ষ আদেশ করিলেন,—বন্দীদিগের বন্ধন মোচন কর। আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই প্রহরাগণ ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদের বন্ধন উন্মোচন

করিলেন। তখন অরুণ প্রত্যেক বন্দীকে এক একখানি নববস্ত্র ও উত্তরীয় প্রদান করিলেন। সকলে হৃষ্টচিত্তে নববস্ত্র পরিধান করিল।

যখন বন্দী সকল নূতন কাপড় পরিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, যখন তাহাদের মনের ভিতর আশার জ্যোতিঃ ক্ষণে ক্ষণে উদ্দীপ্ত হইতেছিল, যখন তাহাদের অন্তঃকরণে বহুদিন পরিত্যক্ত জনক, জননী, স্ত্রী, পুত্র ও আত্মবন্ধুর মুখের প্রতিচ্ছবি জাগিয়া উঠিতেছিল, যখন অনুশোচনায় অনেকের চক্ষে অশ্রুবিগলিত হইতেছিল, তখন পরদুঃখকাতর রাজা ভবানীপ্রসাদ বলিলেন,—"আজি হইতে তোমরা স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পার; তোমরা স্বাধীনভাবে সাধারণ প্রজার মতই নগরে বসতি করিতে পার। তোমরা একবার বিশ্বনাথকে প্রণাম করিয়া প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখনও অন্যের সুখ ও শান্তির ব্যাঘাতক হইবে না।—তোমরা মুক্ত।"

সকলেই সাষ্টাঙ্গে বিশ্বনাথ প্রণাম করিয়া রাজা ভবানীপ্রসাদকে প্রণাম করিল। অন্যের সৎপ্রবৃত্তি দেখিলে যাহাদের হৃদয় গলিয়া যাইত, যাহারা হৃদয়ের পবিত্রতা ও উদারতা অনুভব করিতে পারিত, যাহারা একদিনের জন্যও সাধু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া বিশ্ব-প্রেমিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল, তাহারা সকলেই রাজার এই ব্যবহার দেখিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল। যাহারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ বৎসর কারাগৃহে থাকায় তাহাদের সহিত পুনর্মিলনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা অকস্মাৎ এরূপ অযাচিত মুক্তি-প্রদানে উৎফুল্ল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সকলেই রাজাজ্ঞা শুনিল, "তোমরা মুক্ত," কিন্তু কেহই স্থান ত্যাগ করিল না। কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজা ভবানীপ্রসাদ তখন সস্নেহ-বচনে বলিলেন,—"তোমরা এই

উৎসবে যোগ দাও ও আজি হইতে আমার সকল কর্ম্মে সহায়তা কর। আজ তোমরা এই স্থানে বিশ্বনাথের প্রসাদ পাইবে। আহারান্তে সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিও।"

মথুরা ও অরুণসিংহের সহিত রাজা মন্দিরে উঠিতেছিলেন এমন সময় মুক্ত বন্দীর দল হইতে একজন লোক ছুটিয়া আসিয়া দুই হস্তে ভবানী-প্রসাদের চরণ-যুগল জড়াইয়া ধরিল এবং তাহারই উপর মস্তক রাখিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। সাগ্রহে ভবানীপ্রসাদ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তুলিলেন; দেখিলেন,—সে মন্ত্রী পান্নালালের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তাঁহার বাল্যবন্ধু। রাজা তাহাকে মিষ্টবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহাসমারোহে বিশ্বনাথের পূজা সমাপ্ত হইল। মথুরাসিংহ ও অরুণ-সিংহ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া উৎসবের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছিলেন এবং ভবানীপ্রসাদ নাটমন্দিরের সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক উৎসব দেখিতেছিলেন। তাঁহার সেই প্রশান্ত-মূর্ত্তি, সহাস্য-বদন ও নির্ম্মল-আনন্দ অবলোকন করিয়া সকলেই পুলকিত হইয়াছিল। সেইজন্য বিশ্বনাথের পূজা সমাপ্ত হইলে রাজা যখন মথুরা ও অরুণের সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন তখন প্রজাবৃন্দ ভগবানের যশোগান করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দে এরূপ বিভোর হইয়াছিল যে প্রেমাবেশে পার্শ্বাস্থিত ব্যক্তিকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই সঙ্গীতের অনুসরণ করিতেছিল। তখন এক নির্ম্মল আনন্দে সকলেরই মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে কি আনন্দ! জ্ঞানের সহিত ভক্তির আবির্ভাব হইলে যেরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, আজ ধর্ম্মের সহিত প্রেমের মিশ্রণে সকলে সেই আনন্দ উপভোগ করিল। এ আনন্দের সীমা নাই, এ আনন্দ বর্ণনা করা যাইতে পারে না, এ

আনন্দরশ্মি একবার যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, সেই পবিত্র হইয়াছে। এ আনন্দ-স্রোতে একবার যে অবগাহন করিয়াছে, সেই সে অনন্ত প্রেমপারাবারের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্নে আহার্য্য প্রস্তুত হইলে নৃত্যগীতাদি উৎসব বন্ধ করিবার আদেশ হইল। তখন প্রজামণ্ডলী প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। আজ তাহারা দেবতার আবির্ভাব অনুভব করিয়া, পবিত্র-প্রেমে বিভোর হইয়া একজন অন্যজনকে ভ্রাতৃভাবে দেখিল ; সকলেই অননুভূতপূর্ব্ব আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইল। যখন মানুষ ধর্ম্মের নিম্নস্তরে থাকে তখনই একের সহিত অন্যের পার্থক্য দৃষ্ট হয় কিন্তু একবার ভগবত-প্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট হইলে, একবার সেই বিশ্ব-প্রেমের কণামাত্র প্রাপ্ত হইলে মানব-চক্ষু হইতে সংসারের সকল পার্থক্য বিদূরিত হয়। তখন সকলের মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করায় সকলকেই এক অনন্ত প্রেমরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। ইহাই প্রকৃত সাম্যজ্ঞান। রাজা ভবানীপ্রসাদের প্রজাবর্গ আজ মহামায়া মন্দিরে সেই সাম্যভাব অনুভব করিল।

আজ মহামায়া মন্দিরে উৎসব ও প্রজামধ্যে সাম্যভাব দেখিয়া রাজা ও রাজ-সহচরদ্বয় অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে রাজা বীরসিংহের স্মৃতি মথুরার হৃদয়ে জাগ্রত হইল। প্রজামধ্যে একতা বন্ধনের জন্য যে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি এতকাল রাজা বীরসিংহের রাজত্বে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং রাজার সাহায্য ও সহানুভূতিতে যাহা প্রায় সাধিত হইয়াছিল, আজ কল্যাণীর রাজত্বে তাহা সম্পূর্ণ সাধিত হইল দেখিয়া তিনি অন্তরে বিশ্বনাথকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই প্রার্থনা করিতেছিলেন যে, এই রাজ্যের রাজনীতির ও নিষ্কাম ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ভবানীপ্রসাদের আদর্শে ভারতের রাজ্য সকল গঠিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের ছায়ায় সকলে একত্র হউক।

মানুষ যখন গভীর চিন্তামগ্ন থাকে বা কোন অপার আনন্দ অনুভব করে, তখন তাহার চক্ষু বাহ্যদৃষ্টি শূন্য হইয়া অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায়। তখন সে কাহারও সাহচর্য্য সহিতে পারে না এবং অন্যের সহিত বাক্যালাপ চাহে না। আত্মচিন্তায় মুগ্ধ হইয়া বা হৃদয়ানন্দে বিভোর হইয়া নিভৃতে বাস করিতে ইচ্ছা করে। যদি তখন কোন ভাবের আদান-প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে চিন্তাকে বা আনন্দকে সহচর বিবেচনা করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাহারই সহিত বাক্যালাপ করে। তখন সময়ে সময়ে মানুষ এরূপ অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় যে, বিপন্ন-ব্যক্তি মুক্তিপথের সন্ধান পায়, সুখাকাঙ্খী সুখের উপায় ভাবিতে পারে, শান্তিপ্রয়াসীর সম্মুখে শান্তিমার্গ উন্মুক্ত হয়।

গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া রাজা ভবানীপ্রসাদ মহামায়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন ও প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মথুরা ও অরুণ অসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিঃশব্দে তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া রাজা বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন এবং মথুরা ও অরুণকে আহ্বান করিয়া সম্মুখে বসাইলেন। তাঁহার সেই গম্ভীর ভাব দেখিয়া মথুরাসিংহ বুঝিলেন যে, রাজা কোন একটা জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য চিন্তা করিতেছেন কিন্তু যেন কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। তিনি রাজার প্রতি অনিমেষ-লোচনে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল,—নিদাঘতাপক্লিষ্ট ধরণীকে সুশীতল করিবার জন্য শান্তিবারি বর্ষণোম্মুখ জলদ-জালের ন্যায় রাজা বসিয়া আছেন। যোগ-প্রভাববিশিষ্ট সন্ন্যাসীর নিষ্কম্পদেহ যেরূপ পর্ব্বত-গুহার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করে, সেইরূপ ভবানীপ্রসাদের গম্ভীর-মূর্ত্তি বিলাসভূষণ মণ্ডিত বিশ্রামাগারেও গাম্ভীর্য্য সঞ্চার করিল। সে পবিত্র গাম্ভীর্য্য কেহই বিনষ্ট করিলেন না।

বহুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিবার পর ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "আপনার

এই জনসাধারণের দুঃখ দূরীকরণ প্রবৃত্তি ও চেষ্টা, ভ্রাতৃপ্রতিম অরুণসিংহের এই বন্ধুনির্ব্বিশেষে প্রজার প্রতি ভালবাসাও স্নেহ এবং আমার এই প্রজারঞ্জনবৃত্তি—এ সকল কার্য্য কি আমরা নিষ্কাম হইয়া করিতেছি? আমরা কি আমাদের এই কার্য্যের কোন প্রতিদান চাহি না? বাহির হইতে এ কার্য্য যতটা নিষ্কাম বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, আমার বোধ হয় ইহা সকাম। সাম্রাজ্যের সুখ-বৃদ্ধির জন্য আমরা প্রজাহিতার্থে চেষ্টা করি, সাম্রাজ্যের শান্তির জন্য আমরা প্রজাদিগকে ভালবাসি ও যত্ন করি। যেহেতু আমাদের সুখ ও শান্তি এই সাম্রাজ্যের সুখ-শান্তির উপর নির্ভর করে, আমার মনে হয় পরোক্ষে এই আত্মসুখ-প্রবৃত্তিই আমাদিগকে এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। আমি যখন দিবসের কার্য্যের সহিত বিশ্রাম-কালান্তর্গত কার্য্যাবলীর আলোচনা করি, আমি যখন আশ্রিত প্রজার সহিত আমার আশ্রিতা অন্তঃপুরবাসিনীর সাদৃশ্য অনুধাবন করি, আমি যখন এই রায়পুর রাজ্যের সহিত কল্যাণীর হৃদয়রাজ্যের তুলনা করি, তখনই আমি এই সিদ্ধান্তের সত্যতা বুঝিতে পারি। আমি যখন তাঁহার প্রতি স্নেহাদর প্রদর্শন করি, তখন কোন প্রতিদানের আশা রাখিয়া এ কার্য্য করি না। ভালবাসিলে তৃপ্তি পাই বলিয়া ভালবাসি, যত্ন করিতে সুখবোধ হয় বলিয়া যত্ন করি। আমার সুখবৃদ্ধির জন্য তিনিও যখন কোন কার্য্য করেন, তখন প্রতিদানের আশা একেবারে রাখেন না। উভয়পক্ষেই এ প্রবৃত্তি যত উদার এবং প্রণয়ীযুগলের মধ্যে এ প্রবৃত্তি যত নিষ্কাম হইবে ততই তাহাদের ভিতর এক অনাবিল পবিত্র প্রেম সঞ্চারিত হইবে। এই পবিত্র নিষ্কাম প্রেমের আস্বাদ পাইয়াই গোপবালাগণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া প্রেমিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের করে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।"

ভবানীপ্রসাদ স্থির হইলেন। নিষ্কাম প্রেমোপভোগের প্রবল বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবানীপ্রসাদ দশ বৎসর রায়পুর রাজ্য পরিচালন করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে যে কর পাইয়াছিলেন তাহা তাহাদেরই সুখ ও সুবিধার জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার ব্যবহার ও কার্য্যকুশলতায় প্রজার সুখের সীমা ছিল না। তাঁহার অনুকম্পাপূর্ণ শাসনে সকলেই শান্তিতে বাস করিতেছিল। রাজপরিবারের সকলেও পরম তৃপ্তিতে বসতি করিতেছিলেন। রাজার সর্ব্বজীবে সহানুভূতি ও রাণীর সস্নেহ ব্যবহার সকলকেই মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। রাজ্যময় রাজা ভবানীপ্রসাদ ও রাণী কল্যাণীর সুনাম কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

এরূপ সর্ব্বব্যাপী ভালবাসা ও প্রশংসা পাওয়ায় এবং প্রজার হিতের জন্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হওয়ায় ভবানীপ্রসাদ একটা নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন। কিন্তু এরূপ আনন্দোপভোগ-স্পৃহা তাঁহার চিত্ত হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতেছিল—ইহাও বোধ হয় নির্ম্মল আনন্দ নহে। তিনি যখন সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাত্রে কল্যাণীর নিকট আসিয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্মের তালিকা শুনাইতেন, তখন কল্যাণীর প্রফুল্ল বদন দেখিয়া সুখী হইতেন। যখন তিনি ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন একথা ভাবিতেন, তখন তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইবার আশায় আরও উৎসাহিত হইতেন। তখন অধিকতর যত্নে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইত। রায়পুর রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য ভবানী-প্রসাদ দিবাভাগে অন্তরের সহিত কার্য্য করিতেন এবং রাত্রে প্রাণপ্রিয়া

কল্যাণীর হৃদয়রাজ্যে আসিয়া তাঁহার অকপট প্রেম, আন্তরিক ভালবাসা ও সেবায় সকল শ্রান্তি দূর করিতেন।

শিশু যেরূপ মধুর আস্বাদ পাইয়া প্রথম প্রথম সকল সময় মধু খাইবার বাসনা করে এবং কিছুদিন পরে যেমন সেই প্রিয় সামগ্রীতে পরিতৃপ্ত না হইয়া অধিকতর সুমিষ্ট পদার্থের অনুসন্ধান করে, ভবানীপ্রসাদও সেইরূপ পরহিতানুলব্ধ নির্ম্মল আনন্দে আর পরিতৃপ্ত না হইয়া অধিকতর শান্তি-সুখের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, প্রজার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিয়া ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলে যখন এত তৃপ্তি পাওয়া যায়, তখন অহর্নিশি ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইলে না জানি আরও কত তৃপ্তি পাওয়া যাইতে পারে। কল্যাণীর আনন্দ ও পরিতোষের জন্য কর্ম্ম করায় সেই বিশ্বেশ্বরীর কণামাত্র শক্তি ধারিণীর আদরে যখন এত তৃপ্তি হয়, তখন সেই অনন্ত দয়াময়, প্রেম-ময়ের আদর না জানি কত মনমুগ্ধকর। এই নগরের অবিরল কোলাহলের মধ্যে যখন ভগবানের এত মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন নির্জ্জন বনভুমিতে বাস করিলে না জানি প্রতিক্ষণে কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া থাকে। যেখানে এত মনুষ্য-সমাগম, সেখানে ভগবানকে সহজে পাওয়া যায় না অথচ মনুষ্য-সমাগমশূন্য নির্জ্জন প্রান্তরে ভগবান সকল সময় বিরাজ করেন। এইরূপ স্থানেই লীলাময়ীর লীলা দর্শন করিয়া মানব তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে। কল্যাণীর সহিত মিলিত হইয়া সমাজ হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়া ভগবানের অনন্ত প্রেম উপলব্ধি করিবার বাসনা ভবানীপ্রসাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইল।

সংসারের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন, সংসারের মোহন রূপে আকৃষ্ট হইয়া, মানব হত-জ্ঞান হইয়া সেইদিকে ধাবমান হইতেছে। নিবিড় অন্ধকার মধ্যস্থিত উজ্জ্বল আলোক দর্শন করিয়া সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ পতঙ্গ

যেরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে আলোক-প্রতি ধাবিত হয়, মানবও সেইরূপ আত্মহারা হইয়া আপাতঃ-রমণীয় সংসারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উত্তাপ অনুভব করিয়াও প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া সুখের আশায় অগ্নি স্পর্শ করিয়া দগ্ধ হয়, মানবও সেইরূপ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াই দুঃখানুভব করে কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করে; দুরাশায় উন্মত্ত হইয়া বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য যতই তাহারা কার্য্য করে ততই তাহাদের জীবন সঙ্কটপূর্ণ ও ক্লেশকর হইয়া উঠে এবং পরিশেষে জর্জ্জরিত হইয়া জীবনের শেষদিনে এই দুঃখময় সংসার ও সমাজ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। কোনও কোনও পতঙ্গ অগ্নির উত্তাপে ঈষৎ দগ্ধ হইয়া প্রত্যাগত হইলে যেরূপ তাহারা শীতল ধরিত্রী-ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়া সুস্থ হয়, সেইরূপ কোন কোন মানব সংসারের দুঃখে দগ্ধান্তঃকরণ হইয়া যখন মায়ামোহশূন্য-চিত্তে সংসারের প্রতি বিমুখ হয়, তখনই তাহারা স্নেহময়ী জগজ্জননীর করুণা প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। সংসারীর দুঃখ সম্বন্ধে আলোচনা করায় ভবানীপ্রসাদের চিত্তভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সংসারাশ্রমের সকাম জীবনের সহিত সংসারাতীত নিষ্কাম জীবনের তুলনা করিয়া যতই রাজা মানবের দুঃখ ও অশান্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই নির্জ্জন-বাসের প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল। যতই সংসারের কার্য্য আসিয়া তাঁহাকে এই পবিত্র চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিত, ততই সংসারের উপর তাঁহার বিরাগ জন্মিত; ততই তিনি সংসার হইতে দূরে সরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেন। তাঁহার মানস-নেত্রের সম্মুখে নির্জ্জন উন্মুক্ত প্রান্তর, পত্র পুষ্পশোভিত অনিবিড় বনভূমি, ঈষৎ তরঙ্গান্দোলন-কম্পিত সাগর-বক্ষ প্রভৃতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যসকল সময় প্রতিভাত হইতে লাগিল। তখন তিনি সংসার ও সমাজের সহিত

সম্বন্ধ-শূন্য হইয়া স্বাধীন ও স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প করিতেন। আবার যখন নির্জ্জন-বাসের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভবানীপ্রসাদ আতঙ্কিত হইতেন, তখন অন্ধকারাবৃত শব্দলেশশূন্য প্রান্তর, বিচ্ছেদশূন্য শ্বাপদসঙ্কুল গভীর বনভূমি, প্রবল বাত্যাতাড়িত স্ফীত-বক্ষ ফেনিল সমুদ্র প্রভৃতি ভয়াবহ দৃশ্যসমূহ চিন্তাপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে এই অমানুষিক সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিত। কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে অসমর্থ হওয়ায় রাজা ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

বসন্তাপগমে একদিন রাজা মথুরাসিংহের সহিত পার্ব্বত্যপ্রদেশ পরিভ্রমণের জন্য বহির্গত হইলেন। অতি প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া প্রায় দুই প্রহর কাল অশ্বচালনা করিবার পর ক্লান্তিবোধ হইলে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নির্ঝরিণী-পার্শ্বে একটি বটবৃক্ষতলে তাঁহারা উপবেশন করিলেন। তথায় ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন যে, আতপ-ক্লিষ্ট অসংখ্য পক্ষী একে একে তাঁহাদেরই মত সেই বৃক্ষে আশ্রয় লইতেছে। তিনি দেখিলেন, পক্ষীগণের মধ্যে কেহ বা কূজন করিতেছে, কেহ বা স্থির হইয়া আগন্তুকদিগকে দেখিতেছে, কেহ বা পক্ষ স্পন্দন করিয়া গাত্র মার্জ্জিত করিতেছে ; কোন কোন পক্ষী সুপক্ব ফল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবারণ করিতেছে বা নিকটস্থ নির্ঝরিণীর জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিতেছে।

ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন যে, এক বিপুলায়তন আশ্রয়তলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বহু পক্ষী একত্রে বসতি করিতেছে—অথচ তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, কোন পার্থক্য নাই। সকলেরই আহার একরূপ, আচরণ অভিন্ন। কেহই আহার্য্য বস্তু সঞ্চয় করে না, অথচ কোন দিন তাহাদের কাহারও খাদ্যের অভাব হয় না। বড়, ছোট, সুন্দর, কুৎসিত, সকল পাখীই সমভাবে প্রকৃতি-প্রদত্ত খাদ্য-সামগ্রী আহার করিয়া ও নির্ম্মল জল পান করিয়া আনন্দে দিন যাপন করিতেছে। এই পক্ষীগণ যেরূপ

শান্তিতে বাঁচিয়া থাকে, সমাজ-মধ্যে মনুষ্যগণ তাহার কণামাত্রও পায় কি ? সামাজিকদিগের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, বলী, দুর্ব্বল, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—এরূপ প্রভেদ সকল সময় বিদ্যমান আছে এবং এই পার্থক্যের জন্য তাহাদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকে। সমতল ক্ষেত্র হইতে উচ্চে আরোহণ করিতে করিতে পর্ব্বতশৃঙ্গে উত্থিত হইলে যেরূপ বৃক্ষাদির পার্থক্য বিলুপ্ত হয়, ও সকল বৃক্ষই সমানোচ্চ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সমাজের বন্ধন হইতে বাহির হইয়া প্রেমের রাজত্বে বাস করিলেই সকল বিভিন্নতা লুপ্ত হইতে পারে, সকল বিরোধ মিটিয়া যায়। তখন সকলকেই আত্মীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। বিশ্বের সহিত আত্মীয়তা ও অনন্ত শান্তি উপভোগ করিবার জন্য ভবানীপ্রসাদ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

অপরাহ্নে যাত্রা করিয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে রাজা মথুরাসিংহের সহিত প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মথুরাসিংহ ও অরুণকুমার রাজার গম্ভীর চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। কোন্ দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল, তাহা স্থির করিবার জন্য তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন কারণই দেখিতে পাইলেন না। অথচ যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহারা রাজাকে চিন্তান্বিত, অন্যমনস্ক ও অবসন্ন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

সহসা একদিন রাজা ভবানীপ্রসাদ মথুরাসিংহের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কল্যাণীর সহিত তীর্থযাত্রা করিবার বাসনা জানাইয়া তিনি বলিলেন, "আপনি ও অরুণ কিছুকালের জন্য রাজকার্য্য পরিচালনা করুন। আমার হৃদয়ে শান্তিসুখ উপভোগ করিবার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। সেই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য আমি ভারতের পবিত্র তীর্থ বারাণসীধামে যাইবার সঙ্কল্প

করিয়াছি। রাজধানীতে থাকিয়া ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি কিন্তু তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিতে পাই না। সেইজন্য একবার স্বয়ং বিশ্বনাথের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিব স্থির করিয়াছি। আপনারা কেহই আমার এ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা এই অবসরটুকু দিয়া আমায় চিরবাধিত করিবেন।

রাজা ভবানীপ্রসাদ সাশ্রুনয়নে এই কথাগুলি বলিলেন। তাঁহার ব্যগ্রভাব ও দীনতা দেখিয়া মথুরাসিংহ ভাবিলেন, যে দীনতা একজন প্রজার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা আজ রায়পুরাধিপতির ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা ভিন্ন এরূপ দীনতা কখনও সম্ভব হয় না। যাঁহার এরূপ একাগ্রতা, তাঁহাকে কোনরূপেই নিবৃত্ত করা যাইবে না। সুতরাং তীর্থ-যাত্রায় তিনিও রাজার সহচর হইবেন, এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। অরুণ একাকী সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন শুনিয়া ভবানীপ্রসাদ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

রাজা সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করিবেন এ সংবাদ নগরময় রাষ্ট্র হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখনও ভারতের এতদুর অবনতি হয় নাই। তখনও ভারতবাসীর অন্তঃকরণ হইতে ধর্ম্মভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যদিও ভারতবাসীর হৃদয় হইতে সনাতন-ধর্ম্মের উদারতা ও সাম্যভাব বিদূরিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মবিদ্বেষ জাগ্রত হইয়াছিল, যদিও রাজার সাহায্যলাভে

বঞ্চিত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা অনন্যচিত্ত হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে পারিতেন না, যদিও অন্নচিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, যদিও বৈদেশিক আক্রমণ-ফলে হিন্দুধর্ম্মাদিমার্গীয় ব্যক্তিদিগকে কিছু কিছু নির্যাতন ভোগ করিতেও হইতেছিল—তথাপি ধর্ম্মের আধিপত্য একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। সমাজের ভিতর সংযমের অভাব থাকিলেও সংসারাশ্রমের বহির্ভাগে সংযতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির অভাব তখনও হয় নাই। অন্যান্য সমাজ প্রচলিত ভোগপ্রবৃত্তি সামাজিক-দিগের চিত্ত-আকর্ষণ করিলেও নিবৃত্তিভাবাপন্ন নির্লোভী বিশুদ্ধাত্মা সাধু-সন্ন্যাসীর অধিষ্ঠান সর্ব্বদাই তীর্থক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহাদের অবস্থিতির জন্যই পবিত্র তীর্থধাম পবিত্রতর হইত। তীর্থক্ষেত্রে তাঁহারা এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিতেন যে, দর্শনমাত্রেই সংসারীর চিত্ত হইতে সংসার চিন্তা দূর হইত; ভোগীর চিত্ত হইতে ভোগ-লালসা বিনষ্ট হইয়া নিবৃত্তিভাব জাগ্রত হইত; সংসার-তাপ-দগ্ধ মৃত্যুক্লেশ-প্রপীড়িত নরনারী শান্তি অনুভব করিত। তখন পবিত্রান্তঃকরণে প্রণাম করিয়া সকলেই দেবতার দর্শন পাইত ও তাঁহার করুণা অনুভব করিত।

দেব সেবক মোহান্তদিগের প্রকৃতিই বা কত সুন্দর ছিল! অন্তরের সহিত দেবসেবা করিয়া দিবসের অবশিষ্ট সময় তাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা ও যোগাভ্যাসেই রত থাকিতেন। কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া বিভূতি-চর্চ্চিত হইয়া তাঁহারা মন্দির দ্বারে উপবিষ্ট থাকিতেন; কখনও বা সমাগত সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় বা বিচারে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তীর্থ-যাত্রীরা বিগ্রহ প্রণাম করিয়া দেবসেবার জন্য যাহার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ প্রণামী দিয়া মোহান্তের চতুষ্পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক শাস্ত্রালোচনা শ্রবণ করিত। যখন তাহারা পরিতৃপ্ত হইত, তখন মোহান্তকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার সেবার জন্য কিছু প্রণামী রাখিয়া সে স্থান ত্যাগ করিত।

কে কিরূপ যাত্রী, কাহার আর্থিক অবস্থা কিরূপ, কে কত প্রণামী দিল—এ সকল বিষয়ের তাঁহারা কোন সন্ধান রাখিতেন না। সন্ধ্যা হইলে সেই উদারচেতা মোহান্তেরা প্রণামীগুলি ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়া মন্দির মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিতেন।

তখন ভারতেব অবস্থা এত মন্দ হয় নাই। যদিও বহুকাল হইতে বৈদেশিক আক্রমণ ও লুণ্ঠনেব জন্য ভারতভূমি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছিল, তথাপি অন্য দেশের তুলনায় ভারতের ধনবল তখনও পর্য্যাপ্ত ছিল। দুই মুষ্টি আহারের জন্য ভারতবাসীকে কখনও অকূল চিন্তাসাগরে মগ্ন হইতে হইত না। রত্নপ্রসূ ভারতভূমি তাহাব উর্ব্বর-ক্ষেত্র হইতে প্রতিবৎসর যে শস্যাদি উৎপন্ন করিত তাহাতেই তাহার অধিবাসীগণের যথেষ্ট সঙ্কুলান হইত। তখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অতি দরিদ্রকেও কোন দিন চিন্তা করিতে হইত না। উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করিয়া তাহারা যে ধন-রত্নাদি পাইত তাহাই গৃহে গৃহে সঞ্চিত হইত। তখন সকল গৃহস্থেরই কিছু কিছু সুবর্ণ-রত্নাদি থাকিত এবং বড় ঘরের ধনসম্পত্তির ইয়ত্তা ছিল না। তখন সকলেই ধর্ম্ম ও রীতি অনুসারে সঞ্চিত অর্থের কোন একটি অংশ দেবসেবার জন্য উৎসর্গ করিত।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর অবনতি হইলেও তখনও তাহাদের মধ্য হইতে ধর্ম্মেব আবরণ অন্তর্হিত হয় নাই। তখনও তাহারা ধর্ম্ম ও দেবতাকে অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিত। গমনাগমন বহু আয়াস-সাধ্য হইলেও তখনও তীর্থস্থানে যাত্রী সমাগম হইত। যাত্রীদিগের প্রণামী হইতে যে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হইত তাহা দেবসেবায়, অতিথি অভ্যাগতের সেবায়, ধর্ম্মের বিস্তার এবং শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনার জন্য ব্যয়িত হইত। কোন কোন তীর্থস্থানে অসীম অর্থের প্রভুত্ব পাইয়াও মোহান্তেরা তখন স্ব স্ব সুখের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না। এরূপ নিষ্কাম, ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুদিগের

অবস্থিতির জন্তই তীর্থপর্য্যটনে গৃহীর মন প্রশান্ত হইত, অন্তরে জ্ঞানের সঞ্চার হইত এবং মায়া-মোহ-শূন্ত হইয়া তাহারা পবিত্র ও নির্লোভ হইয়া উঠিত।

ভারতের পবিত্র তীর্থ বারাণসী দর্শন করিয়া ভবানীপ্রসাদ দেবানুগ্রহ লাভ করিবার মানস করিয়াছিলেন।

রাজা মথুরার নিকট তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া যেদিন তীর্থ-পর্য্যটনের সঙ্কল্পের কথা জানাইয়াছিলেন, তাহার পরদিন শুভলগ্ন স্থির করিবার জন্ত মথুরা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ডাকাইলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া কালাকাল বিচার করিয়া বলিলেন,—"অন্ত হইতে একবিংশতি দিবস যাত্রার স্থবিধা হইবে না। দ্বাবিংশ দিবসে মাহেন্দ্র-যোগে যাত্রা করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। রাজার যেরূপ অপূর্ব্ব অভিলাষ, এ শুভযোগও সেইরূপ অপূর্ব্ব। অনন্তশান্তি এই যোগে লক্ষিত হইতেছে; স্থতরাং এই যোগে যে কার্য্য আরম্ভ হইবে তাহা হইতে অনন্ত শান্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। মহারাজ দীর্ঘজীবী হইয়া সেই শান্তি উপভোগ করুন।"

পুরস্কারের সহিত ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া মথুরাসিংহ অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যাত্রার প্রাক্কালিক ব্যবস্থা ও আয়োজনের জন্ত রাজা ও মথুরা প্রস্তত হইলেন। কিন্তু যতই তাঁহারা এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেছিলেন, ততই তাঁহাদের মনে চিন্তার উদ্রেক হইতেছিল। ভবানীপ্রসাদ মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, সৈন্তাধ্যক্ষ ও কল্যাণী তাঁহার সহিত যাইলে যুবক অরুণসিংহ রাজ্য লইয়া অতি বিপন্ন হইয়া পড়িবে। পূর্ব্বে রাজকার্য্য পরিদর্শনের জন্ত মন্ত্রী থাকিতেন কিন্তু আমার হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হওয়া অবধি কল্যাণীই মন্ত্রীর কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। কোন পরামর্শ আবশ্যক হইলে বা কোন কার্য্যে আমাদের মধ্যে মত-দ্বৈধ হইলে আমি কল্যাণীর

সহিত যুক্তি করিতাম। কোন জটিল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে অরুণ কাহার সহিত যুক্তি করিবে বা কাহার উপদেশমত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। শুভানুধ্যায়ী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদয়াল আর ইহ-জগতে নাই। তাঁহার ন্যায় সুবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বার্থশূন্য, বিবেচক ব্রাহ্মণ রায়পুরে আর দেখা যায় না। পাত্রমিত্র অনেকে আছেন বটে, কিন্তু এই দশবৎসর কাল তাঁহাদের নিকট কোন উপদেশ চাওয়া হয় নাই। সুতরাং কোন কার্য্যো-পলক্ষে যদি অরুণ তাঁহাদের সহিত যুক্তি করে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বার্থ-সিদ্ধির অনুকূল পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিবেন। বিশেষতঃ এখন আর ভারতবর্ষের কোথাও শান্তি নাই। রণপিপাসু মোগল-সেনানী সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা হিন্দুর সহিত সঙ্ঘর্ষে নিযুক্ত হইতেছে এবং পরস্বাপহারী মোগল-সৈন্য সুবিধা পাইলেই গ্রাম লুণ্ঠন ও প্রজার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিতেছে। ওদিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই দুই জাতির মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয়া রায়পুর-রাজ্য যে কতদিন শান্তিভোগ করিবে, তাহার কোন স্থিরতাই নাই। সুতরাং অরুণের হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইলে তাহাকে অকূল-সাগরে নিমজ্জিত হইতে হইবে।

রায়পুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তায় রাজা যতই চিত্ত নিবিষ্ট করিতেছিলেন, ততই ক্ষীণজ্যোতিঃ সন্ধ্যা-প্রদীপের মত তাঁহার আশা ঘোর বিপদজালে বেষ্টিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, সন্ধ্যা-প্রদীপ ক্ষীণ রশ্মিসম্পন্ন হইলেও যেরূপ তৎপার্শ্বস্থিত অন্ধকার রাশি বিদূরিত করিয়া আলোক বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ এই রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও ঘনীভূত সঙ্কটরাশি মথিত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু প্রবল-বাত্যাতাড়িত হইয়া দীপ নির্ব্বাপিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে তমোরাশি প্রদীপকে প্রচ্ছন্ন করিয়া যেরূপ অদৃশ্য করিয়া রাখে, সেইরূপ অকস্মাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হইলে

অরাতি-সৈন্য অনায়াসেই এই রাজ্য হস্তগত করিবে ও রায়পুর রাজ্যের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিবে।

ভবানীপ্রসাদের মনে হইল—রায়পুরবাসী আত্ম-রক্ষায় অক্ষম নহে। অরুণসিংহ বীর এবং বুদ্ধিমান্। তাহার দ্বারা পরিচালিত হইলে রায়পুর-রাজ্যতরণী এই তরঙ্গসঙ্কুল সংসার-পারাবারে নিয়ত ভাসমান থাকিয়া ধীরে ধীরে অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্থির যে, হিন্দুর প্রাধান্য ভারতে আর অধিকদিন থাকিবে না। উত্তর ভারত হইতে হিন্দুর প্রাধান্য একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা কিছু দাক্ষিণাত্যে আছে, তাহাও এইবার লোপ পাইবে।

যে দেশে এক সনাতন ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র গ্রহণ করিয়া এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া ধর্ম্মভূমি নর-রক্তে কলুষিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, যে দেশে সনাতন ধর্ম্মের মূল নীতি ভুলিয়া সেই অদ্বিতীয় ভগবানের রূপান্তরের মধ্যে একের উপর অন্যের প্রাধান্য প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়া ধর্ম্মগ্লানি করিতে দ্বিধাবোধ করে না, যে দেশে এক ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যেও আচার-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, যে দেশে জাতিভেদের উদ্দেশ্য ভুলিয়া বংশগত জাতিবিচার করিয়া শূদ্রেতর জাতিকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, যে দেশে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, সে দেশের পতন অবশ্যম্ভাবী। যে দেশের রাজা-প্রজা সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য ভুলিয়া কেবল কামসেবারত থাকে, যে দেশের নর-শ্রেষ্ঠ নৃপতি পর্য্যন্ত একাধিক স্ত্রীতে পরিতৃপ্ত না হইয়া পরদার কামনা করে, যে দেশে ধর্ম্মের আবরণ মধ্যে পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে—সে দেশবাসীকে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিদেশী রাজার অধীনে বসতি করিতেই হইবে। যে দেশের অধিবাসী স্বীয় ক্ষমতায় অধৈর্য্য হইয়া অভিমানে আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, যে দেশে বংশ পরম্পরায় জাতি-বৈরিতা ও ঈর্ষানল

প্রজ্বলিত থাকে, যে দেশে ভ্রাতার উচ্ছেদ সাধনের জন্য অন্য ভ্রাতা ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশীর হস্তে দেশমাতাকে সমর্পণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না—সে দেশবাসীকে অনন্ত দাসত্বভোগ করিতেই হইবে।

গভীর দুঃখে ভবানীপ্রসাদ অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া তিনি মথুরাসিংহেব অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মথুরার সহিত সাক্ষাৎ হইলে রাজা “বলিলেন, আমি একাকীই তীর্থ-পর্য্যটনে যাইব মনে করিতেছি। আপনাকে লইয়া গেলে অরুণকে রক্ষক-হীন হইয়া থাকিতে হইবে। ইহা কোন রূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। অধিকন্তু, এখন ভারতে যেরূপ চারিদিকে অশান্তির সূত্রপাত হইতেছে তাহাতে মনে হয়, অচিরেই মুসলমানের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। তখন উত্তর ও দক্ষিণ হইতে দুই বিপুলবাহিনী চালিত হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী রায়পুর নগরী কখনও নিরাপদে থাকিতে পারিবে না। সে বিপদ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে ও পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আপনি দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ, রণ-কৌশলী ও বীর। সুতরাং আপনি যত সহজে এই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন, অরুণ কখনই সেরূপ পারিবে না।

তিনি আরও বলিলেন, “কল্যাণীকেও সঙ্গে লইয়া যাইব না স্থির করিতেছি। তিনি সংসারে সুখের মধ্যে পালিতা ও বর্দ্ধিতা। যদিও তিনি শরীরের সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিষয় অতি অল্পই চিন্তা করেন, তথাপি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। যে কল্যাণী জন্মাবধি পিতা ও মাতার

সোহাগে পালিত হইয়াছেন, যিনি রাজৈশ্বর্য্যসম্ভূত সকল প্রকার আরাম ও বিলাস ভোগে অভ্যস্ত, যিনি যৌবনে রাজার সহধর্ম্মিণী হইয়া অন্তঃপুর, উপবনবাটিকা ও মহামায়া-মন্দির ভিন্ন অন্য কোথাও পদার্পণ করেন নাই, আজ যে তাঁহাকে এই সকল সুখভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দুষ্কর তীর্থ-পর্য্যটন করাইতে লইয়া গিয়া অনন্ত ক্লেশের মধ্যে স্থাপিত করিব তাহা কখনও হইতে পারে না। জানি আমি, কল্যাণী অন্তরের তৃপ্তি পাইলে শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ করেন না, তথাপি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমি তাঁহাকে এত কষ্টের মধ্যে লইয়া যাইতে পারি না। আমি একলাই যাইব স্থির করিতেছি"।

মথুরা ধীরভাবে রাজার সকল কথা শুনিলেন। এতক্ষণ রাজার কোন কথায় তিনি প্রতিবাদ করেন নাই; এইবার তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ের একটি একটি করিয়া উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

"আপনি বলিয়াছেন, অরুণ অল্পবয়স্ক ও রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ। সুতরাং বিপদের সময় আমার সাহায্য ভিন্ন রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। আমি মনে করি, অরুণ অল্পবয়স্ক হইলেও ঐকান্তিকতা, দৃঢ়তা ও শিক্ষানুরাগের জন্য রাজকার্য্যে সকল অভিজ্ঞতাই অর্জ্জন করিয়াছে। আপনি ত শুনিয়াছেন, বালক-কাল হইতে এই ভ্রাতা-ভগ্নীকে আমিই লালনপালন করিয়াছি। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়াছিলাম যে, মনুষ্য-প্রীতির অভাবে ও স্বজাতি-বৈরিতার জন্যই ভারতের এত দুর্দ্দশা। আমার বিশ্বাস ভারতবাসী যেদিন জাতিনির্ব্বিশেষে পরস্পরকে ভালভাসিতে শিখিবে, সেইদিন হইতে ভারতের সুখরবি উদিত হইবে। সেই বিশ্বাসমত অরুণের হৃদয়ে জাতিনির্ব্বিশেষে মনুষ্য-প্রেম জাগাইবার জন্য তাহার শৈশবাবস্থা হইতে চেষ্টা কারয়া আসিয়াছি। তাহাকে শিখাইয়াছি যে, প্রেমই মনুষ্য-হৃদয় অর্জ্জন করিতে পারে; তুমি আপনাকে

ভুলিয়া অন্যকে ভালবাস—দেখিবে সে নিজের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া তোমার সুখোৎপাদনে চেষ্টা করিবে।”

ভবানীপ্রসাদ কহিলেন, “সে বিশ্বাস আমারও আছে। তবে সে বালক মাত্র, তাই কুণ্ঠা হয়।

মথুরা কহিতে লাগিলেন—“অরুণ ও কল্যাণীকে শিখাইতাম তোমরা আর্ত্তের সেবা কর, দুঃখীর দুঃখ মোচনে চেষ্টা কর, প্রজার দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ কর, তাহাদের বিপন্ন দেখিলে পুনরায় যাহাতে সে বিপদ না ঘটে তাহার ব্যবস্থা কর, দেখিবে তোমার স্বার্থসিদ্ধি ও সুবিধার জন্য সকল প্রজাই সচেষ্ট থাকিবে। হিন্দু এখনও অকৃতজ্ঞ হয় নাই কিন্তু অধিককাল বিদেশীর হস্তে নিপীড়িত হইলে এ সদ্‌গুণ তাহাদের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং এখনও যদি চেষ্টা কর তাহা হইলে সকলই আবার ফিরাইতে পারিবে।

“এই ভ্রাতা-ভগ্নীকে বলিতাম, তোমরা ভারতের চারিদিকে চাহিয়া দেখ; দেখিবে সর্ব্বত্র ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। একজনের অভ্যুত্থান অন্যজন সহ্য করিতে পারে না; স্বদেশবাসী একজনের প্রভুত্বাধীন হইয়া থাকিতে লোকে ঘৃণা বোধ করে। সেইজন্য সকল সময়েই অন্তর্বিপ্লব, অন্তর্যুদ্ধ ভারতে চলিতেছে। তাহারা একবারও ভাবে না যে, সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু-রাজ্য সমবেত হইলেও উত্তর-ভারতস্থিত মোগলদিগের বিপুলবাহিনীর সমকক্ষ হইতে পারিবে না। এরূপ গৃহ-বিচ্ছেদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে স্বজাতি-বিদ্বেষ ও মানাভিমান ভুলিয়া করদ-রাজ্যের সহিত শত্রুতা মিটাইয়া সকলের সঙ্গে সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে হইবে। তখন তোমাদের সম্মুখে কেবল মাত্র একটি উদ্দেশ্য থাকা চাই—ভারতের হিতসাধন—এবং সেই উদ্দেশ্য সাধিত করিতে গিয়া তোমাদের নিকট যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাই তোমরা

কায়মনোবাক্যে সাধিত করিবে। মহান্ স্বার্থের নিকট ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবে। তখন এমন একদিন আসিবে যে, তোমাদের সেই স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে স্বার্থসিদ্ধিজনিত আনন্দের শতাধিক গুণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।"

ভবানীপ্রসাদ কহিলেন, "আমারও সেই আশা"।

"সেই নির্ম্মল আনন্দ, সেই পবিত্র শান্তি ও তৎসহ ভারত-জননী ও ভারত-সন্তানের দুঃখ বিমোচনের একমাত্র উপায়—প্রেম। প্রেমের মহিমা ও ভারতের ভবিষ্যতের সহিত সম্বন্ধ আমি তাহাদিগকে সকল সময় বুঝাইতাম। তাহারই ফলে অরুণসিংহের হৃদয়ে দৃঢ়তার সহিত কোমলতার শুভ সংমিশ্রণ হইয়াছে। তাহারই ফলে অরুণসিংহ জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে। দুই চারিটি লঘুচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন রায়পুরবাসী সকলেই তাহার প্রেমে মুগ্ধ। আমার বিশ্বাস, তাহারা সকলেই অরুণের আদেশে স্ব স্ব দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত ক্ষরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না"।

"অনেক বিজেতা মোগল-সৈনিক অতি সামান্ত কারণে বিজিতের প্রতি যেরূপ নির্যাতন করিতেছে, তাহাতে মনে হয় মোগল-সাম্রাজ্য আর অধিক কাল থাকিবে না। যতক্ষণ কোন জাতির মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে, যতক্ষণ রাজা এবং উচ্চতর কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে উদারতা থাকে, যতক্ষণ বিজেতা পরাভূতের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার দেখাইতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজ্য অধিকার করিয়া শাসনাধীন রাখা সম্ভব। কিন্তু যখন কোন জাতির মধ্যে নীচতা দেখা দেয়, যখন তাহারা বিজিতের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে দ্বিধা বোধ করে না, যখন তাহারা আর্ত্তের প্রতি অত্যাচার করিতে আনন্দ বোধ করে, তখন সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রজার সহানুভূতি ভিন্ন রাজ্য স্থায়ী হইতে পারে না। সেই সহানুভূতি মোগল হারাইয়াছে। আর সাম্রাজ্য স্থাপন, সাম্রাজ্য শাসন

এবং একটা জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার মানবের শক্তি বা তাহার ইচ্ছার অধীন নহে; তাহা ভগবানের লীলার একটি অংশমাত্র। যেদিন ভগবানেব উদ্দেশ্য আর সাধিত না হইবে, সেই দিন হইতেই সেই সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইবে। তাহার শক্তি যত বেশীই হউক না কেন, বালির স্তূপ যেরূপ ক্ষীণধারা বৃষ্টির জলে ধুইয়া যায়, সেইরূপ সহজে সে সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে"।

"আর কল্যাণি! সে দেবী-প্রতিমার সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলিতে ইচ্ছা করি না। কেবল এই পর্য্যন্ত বলি, আপনার অনুপস্থিতিতে সে এই রাজপুরী অরণ্য অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টকর মনে করিবে, রাজভোগ বন্য ফলমূল অপেক্ষাও তিক্তবোধ করিবে, সুকোমল শয্যা কণ্টকাকীর্ণ অনুভব করিবে।

"আপনার চিন্তার কারণ সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করিলাম। কল্যাণী সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে আপনিই বুঝিতে পারিবেন যে, সে চিন্তাও অমূলক। সুতরাং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে তখন আর কোন দ্বিধা থাকিবে না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনুষ্য-প্রকৃতির একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, যখন যে কাজ করা যায় তখন মন সম্পূর্ণভাবে তাহাতেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে এবং দেহও সেই কর্ম্মোপযোগী হইয়া উঠে। সেই জন্যই অনেক সময় দেখা যায়, অতি ভীরু ব্যক্তি দুর্দ্দম সাহসিকতার সহিত ভয়ঙ্কর স্থানে কর্ম্ম করিতেছে, অতি দুর্ব্বল ব্যক্তি আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া বলবানের সমকক্ষ হইতেছে।

ইহার কারণ এই যে, মনুষ্য শরীর প্রচুর শক্তি, প্রচুর সামর্থ্য ধারণ করে। মানুষের মধ্যে যে দুর্ব্বলতা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মানসিক। মনকে কোমল করিলে মানুষ কোমল হয়। সর্ব্বংসহ শরীর সকল অবস্থারই বশীভূত হইয়া থাকে।

যখন হইতে রাজমহিষী কল্যাণী শুনিয়াছিলেন যে, স্বামী তীর্থযাত্রা করিবেন, তখন হইতেই তিনি অবসর মত তীর্থবাসের চিন্তা করিতেন। প্রবাসে আত্মীয়-বন্ধু বিহীন হইয়া থাকিতে হইলে কি কি অসুবিধা হইতে পারে, রাজধানী হইতে বহুদূরে থাকিতে হইলে কিসের অভাব হওয়া সম্ভব, সকল অভাবের মধ্যে কোন্ কোন্ অভাব সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হইবে, ইত্যাদি বিষয় লইয়া যতই তিনি মনোমধ্যে আলোচনা করিতে ছিলেন ততই তাঁহার চিত্ত হইতে প্রবাস-বাসের বিভীষিকাগুলি চলিয়া যাইতে লাগিল। বাস্তব ঘটনা একে একে তাঁহার মানসপটে উদিত হওয়ায় তিনি সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। সুতরাং এই কয়দিনের মধ্যেই অভিজ্ঞ পুরুষের মত সকল আশঙ্কা ও সকল অভাব দূর করিবার উপায় স্থির করিতে পারায় দুই একদিন হইতে তিনি বেশ নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

এদিকে রাজা যখনই অন্তঃপুর-মধ্যে আসিয়া কল্যাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তখনই তিনি দেখিতেন, কল্যাণী অন্যমনস্ক ও চিন্তাকুলা। তাহাতে তাঁহার মনে হইত যে, তীর্থযাত্রার দুশ্চিন্তায় রাণী কিছু ব্যথিতা হইয়াছেন। যে কল্যাণীর প্রকৃতি স্থির ও আনন্দময়, বদন যাঁহার সদা প্রফুল্ল, হস্ত যাঁহার পর-সেবারত, চিত্ত যাঁহার পতিচিন্তা ব্যাপৃত, সেই স্ত্রীকে এখন কথঞ্চিৎ নিষ্ক্রিয় ও চিন্তা-বিমূঢ় বোধ হওয়ায় রাজা সস্ত্রীক তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ সেইজন্যই তিনি একাকী তীর্থযাত্রা করিবেন এইরূপ অভিমত মথুরার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অথচ কল্যাণী যে এখনও তাঁহার হৃদয়ের দেবতার চিন্তা ও সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিলেন না। রাজার কি অভাব ও কি অসুবিধা হইতে পারে এই কথাই তিনি সকল সময় মনে মনে আলোচনা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, রাজপুরী-মধ্যে রাজার তত্ত্বাবধানের জন্য কত লোক রহিয়াছে। স্বীয় অভাব ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার সম্মুখে ঈপ্সিত সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছেন। অবশ্য প্রবাসে এখানকার মত সকল জিনিষের আবশ্যক হইবে না। সেইজন্য তিনি যে যে বিষয়ের নিশ্চিত অভাব অনুভব করিবেন মনে হইত, কল্যাণী তাহা পূরণ করিবার উপায় চিন্তা করিতেন। তিনি নিজের সম্বন্ধেও বিশেষভাবে অনুধাবন করিতেছিলেন। কায়িক সকল বিষয়ে তাঁহার যে যে বাহুল্য ছিল, সেইগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল জীবন ধারণের জন্য যাহা একান্ত আবশ্যক তাহাতেই তিনি অভ্যস্ত হইতেছিলেন। ফলতঃ এই অষ্টাদশ দিবসের চেষ্টায় তিনি নিজের শরীরকে অধিকাংশ বিষয়েই আয়ত্বাধীন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার যে সকল কার্য্য অন্যে ভীতিমূলক বিবেচনা করিতেছিলেন, বস্তুত তাহাই তাঁহার শরীর ও মনকে দৃঢ় করিতেছিল।

কেবল দুই দিন মাত্র বাকী আছে দেখিয়া আজ কল্যাণী কতকগুলি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া গুছাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় রাজা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ তিনি যে উৎসাহের সহিত যাত্রার প্রাক্কালিক আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া রাজা স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে একটু দ্বিধাবোধ করিলেন। কিন্তু এ কথা না বলিলেই নয়; সুতরাং অনেক ইতস্ততঃ করিয়া তিনি সস্নেহে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কল্যাণি, এতদিন ইচ্ছা ছিল যে, তোমাকে সঙ্গে করিয়া তীর্থ-পর্য্যটন করিব; ভারতের পবিত্র

তীর্থ তোমাকেও দেখাইব। কিন্তু আজ আর সে ইচ্ছা নাই। এখন স্থির করিতেছি, আমি একাকীই তীর্থযাত্রা করিব; তুমি ও তোমার কাকা রাজপুরীমধ্যে থাকিয়া অরুণকে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে সাহায্য করিবে। রাজ্যের অবস্থা ও তোমার কষ্টের কথা ভাবিয়া এইরূপ ব্যবস্থাই সমীচীন মনে করিতেছি।"

রাজা এই কথাগুলি বলিলেন, কিন্তু কল্যাণী তাহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি আরও বলিলেন,—"আমি তোমারই মতের অপেক্ষা করিতেছি। যদি তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত হও, তাহা হইলে এখনই তোমার কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকেও নিবৃত্ত করি এবং নির্দ্ধারিত দিবসে একাকী যাত্রা করিবার আয়োজন করিয়া লই।"

রাণী এ প্রস্তাবে নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া বাষ্পাকুললোচনে বলিলেন,— "আমার স্বামীই আমার আশ্রয়। সে আশ্রয়তলে বসতি করিবার অধিকার ধর্ম্ম ও ভগবান আমায় দিয়াছেন; তাহা হইতে আমায় কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না। যতদিন আপনি রাজপুরীমধ্যে থাকিয়া সুখভোগ করিয়াছিলেন, ততদিন আমি তাহার অংশভাগিনী হইয়া ছিলাম। এখন আপনি যে তীর্থপর্য্যটন ক্লেশ অনুভব করিতে যাইতেছেন, তাহারও অংশ আমায় বহন করিতে হইবে। তাহাতে শারীরিক কষ্ট হইতে পারে; কিন্তু শান্তি অসীম। সেই অনন্ত শান্তি উপভোগ করিবার অবসর আমায় দিন!

কল্যাণী স্বামীর পদতলে মস্তক স্থাপন করিলেন, এবং পদরজ লইয়া স্বীয় মস্তক ও সর্ব্ব-শরীরে বিলেপিত করিয়া তাঁহারই আদেশের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

এ ব্যবহারের পর আর কোন প্রতিবাদ চলে না দেখিয়া ভবানীপ্রসাদ স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেই স্বীকৃত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না, কাহারও সুবিধা অসুবিধার জন্য অপেক্ষা করে না। দিন আসে, দিন চলিয়া যায়, আবার রাত্রি আসে, রাত্রি চলিয়া যায়। নদী যেরূপ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, অধিত্যকা হইতে উপত্যকা, উপত্যকা হইতে সমতলভূমি মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপন জলরাশি বহন করিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, সময়ও সেইরূপ জাগতিক সকল পদার্থ, সকল জীবকে বহন করিয়া অনন্তের দিকে চলিয়াছে। কত জীব আসিতেছে, ভাসিতেছে, আবার মিশাইয়া যাইতেছে। জলরাশির উপর জলবুদ্‌বুদ্‌ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ যেমন তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই জীব যতক্ষণ তাহার দেহ ধারণ করিয়া থাকে ততক্ষণ তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু একবার দেহান্ত হইলে সে যে কোথায় মিশাইয়া যায় তাহা আর স্থির করিতে পারা যায় না। জলস্রোতের সহিত প্রতি জলবুদ্‌বুদ্‌ সাগরে গিয়া লীন হইতেছে কিন্তু জীবদেহ কাল-স্রোতের মধ্য দিয়া কোথায় যাইতেছে কে বলিবে!

একটী একটী করিয়া দুইদিন কাটিয়া গেল। আজ রাজা ভবানীপ্রসাদ সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করিবেন। কিছুকালের জন্য তিনি রায়পুর নগর ত্যাগ করিয়া তীর্থস্থানে থাকিবেন বলিয়া অদ্য প্রাতঃকাল হইতে নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রাসাদে উপস্থিত হইতেছিলেন। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—সুতরাং সকলেই বিষণ্ণ। আজ তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃসম, সহৃদয়, প্রজা-বৎসল নরপতিকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। কতদিনে তিনি আবার স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহা রাজার মুখে শুনিবার জন্য সকলেই উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় রাজা, সৈন্যাধ্যক্ষ

মথুরাসিংহ ও অরুণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই দেখিলেন তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত, সহাস্য; আত্মবন্ধু-বিরহজনিত দুঃখ-কালিমা তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। সভাগৃহে পদার্পণ করিবামাত্রই সকলে আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। রাজা আসন গ্রহণ করিলে মথুরা ও অরুণ তাঁহার দুই পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। গৃহতলস্থ সকলে আসন গ্রহণ করিলে রাজা সাদরে সকলকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "অদ্য অপরাহ্নে কন্যা ও সহধর্ম্মিণীকে লইয়া আমি তীর্থযাত্রা করিব। কোথায় কোথায় যাইব এবং কতদিন পরে এই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব, তাহার এখন কোন স্থিরতা নাই। আমি মনোমধ্যে একটী অশান্তি ভোগ করিতেছি। কেমন একটা অব্যক্ত ভাব অন্তর মধ্যে উদিত হইয়া আমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। কি সে অশান্তি, কিসের জন্যই বা এত চিত্তচাঞ্চল্য তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু বেশ স্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, জ্যোৎস্না-বিধৌত হৃদয়াকাশে করাল কাদম্বিনী পরিব্যাপ্ত হইয়া সুখরশ্মি অপসারিত করিতেছে। কবে এই কৃষ্ণাবরণ দূরীভূত হইবে কে বলিতে পারে? আপনারা সকলে এই দীনহীনের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন যেন 'আমার কাম্য জগৎ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন না থাকিয়া অচিরেই পবিত্র রশ্মিপাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।"

তিনি আরও কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইল না। অগত্যা তাঁহাকে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতে হইল। তাঁহার হৃদয়নিহিত রুদ্ধ আবেগ নেত্রবিগলিত অশ্রুরূপে গণ্ড বহিয়া নিস্থত হইতে লাগিল। সভাস্থ সকলেই বিস্মিতচিত্তে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে রাজা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিলেন, "আপনারা সকলেই জানেন যে, এই রাজ্যে আমি একজন সামান্য প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহি। রাজ্য ভগবানের, আমি তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া আপনাদের

সাহায্যে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই কার্য্যে অনেক ত্রুটি হইয়াছে। সুতরাং ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় আমি মুক্তান্তঃকরণে সকল সময় ভগবচ্চরণে দোষ স্বীকার করিতেছি। ভগবানের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আপনাদের ও রায়পুরবাসী সকল আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি অনেক সময় অন্যায়াচরণ করিয়াছি। সুতরাং বিনীতভাবে আজ এই বিদায়ের দিনে আপনাদের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি—আপনারা সকলে মৎকৃত ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া সহোদর জ্ঞানে আমায় ক্ষমা করুন।

"আর একটি ভিক্ষা আছে। আপনারা মহান্, আপনাদিগের অদেয় কিছুই নাই। আপনারা অনুমতি করুন, আমি অরুণসিংহকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া কিছুকালের জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করি।"

কোন অমাত্য উত্থিত হইয়া আপত্তি করিল না দেখিয়া রাজা স্বয়ং অরুণকে রাজোচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন এবং স্বীয় মস্তক হইতে সেই বহুমূল্য মুকুট উন্মোচন করিয়া তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিলেন। রায়পুর রাজ্যের রাজ্যলক্ষ্মী এতদিনে রায়পুর রাজবংশ হইতে হস্তান্তরিত হইল। এ দৃশ্য কাহারও চক্ষে সুখকর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু রাজা ভবানীপ্রসাদ যখন স্বীয় রাজদণ্ড অরুণসিংহের হস্তে দিয়া স্বয়ং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নাসনে আসিয়া বলিলেন—"রাজা অরুণসিংহের জয়" তখন সকলেই সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন, "রাজা অরুণসিংহের জয়!"

অরুণসিংহ এতক্ষণ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি এই অনুষ্ঠিত ব্যাপার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহার কেবল মনে হইতেছিল যে, রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে ত রাজবেশ ধারণ করিতে হয় না। সিংহাসনে উপবেশন, রাজমুকুট ধারণ—এই সকলেরই বা অর্থ কি? তিনি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় রাজা

ভবানীপ্রসাদ তাঁহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়া স্বয়ং সভাসদের আসন গ্রহণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"রাজা অরুণসিংহের জয়!" এই:শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল; তাঁহার আপাদ-মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল এবং বোধ হইল যেন হস্তমুষ্টি স্খলিত হইয়া রাজদণ্ড পতিত হইতেছে। তিনি অভূতপূর্ব্ব দুর্ব্বলতা অনুভব করিলেন এবং তাঁহার বদনমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া আসিল। কিন্তু যখন কুলপুরোহিত তাঁহার মস্তকে অভিষেক-বারি সেচন করিয়া বেদমন্ত্রোচ্চারণ করিলেন তখন অরুণসিংহ তাঁহার লুপ্ত-সাহস পুঃনপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে রাজদণ্ড ধারণ করিলেন এবং চিত্ত স্থির করিয়া ভাবিলেন—"যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে; কিন্তু এই শুভ-মুহূর্ত্তে এমন কোন দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিব না যাহা হইতে নাগরিকের চিত্তে আতঙ্ক উপস্থিত হইতে পারে বা তাহারা কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে পারে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার বদনমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পরে যখন পুরোহিত রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন অরুণসিংহ স্থিরভাবে তাহা শ্রবণ করিলেন। তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় কান্তি দেখিয়া সকলেই রাজদেহে দেবরাজ ইন্দ্রের আবির্ভাব কল্পনা করিতে লাগিলেন।

অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হইলে ভবানীপ্রসাদ বলিলেন—"আজ আমরা তীর্থযাত্রা করিব। আমার এই রায়পুর রাজ্যে পুনরাগমন অদৃষ্টে ঘটিবে কিনা জানি না। সুতরাং ইচ্ছা হইতেছে যে, যাত্রার অব্যবহিতপূর্ব্বে একবার আপনাদের দর্শন করি। আপনাদের সহৃদয়তা, আপনাদের ভালবাসা আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমার বেশ ভরসা আছে যে, অরুণসিংহের অধীনে আপনারা সুখে ও নিরাপদে বসতি করিতে পারিবেন।

প্রহরকাল অতীত হইল দেখিয়া ভবানীপ্রসাদ সভাভঙ্গ করিলেন এবং

একে একে সকল সভাসদ্‌গণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিলেন। পরে তিনি মথুরা ও অরুণকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে অন্তঃপুরে প্রতি কুলস্ত্রী সাশ্রুনয়নে রাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছিলেন এবং কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে যাইতেছিলেন। আজ যে তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মী রায়পুর ত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য স্থানান্তরিত হইতেছেন তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সুতরাং কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীকে নয়নান্তরালে রাখিতে হইবে ভাবিয়া তাঁহারা দুঃখভারাক্রান্ত হইতেছিলেন। বৃদ্ধারা সন্তান-বিচ্ছেদ দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন; সমবয়স্কাগণ সখী ও বন্ধু-বিচ্ছেদ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন; এবং কনিষ্ঠাবা মাতৃহারা হইবে বলিয়া বিহ্বল হইয়াছিল। কল্যাণীর চিত্ত আজ সুখ ও দুঃখের মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। এতদিন তিনি পুরবাসিণিগণের প্রতি স্নেহ, দয়া ও যত্নের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন এখন তাহার প্রতিদান প্রাপ্ত হইলেন। প্রতি অশ্রুবিন্দু আজ তাঁহার নিকট প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির মত মনে হইতে লাগিল। তিনি আগ্রহের সহিত এই পবিত্র উপহার লইয়া বয়োজ্যেষ্ঠাদিগকে প্রণাম করিতেছিলেন, সমবয়স্কাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন ও কনিষ্ঠাদিগকে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। যখন সংবাদ আসিল যে, রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন সমবেত সকল পুরস্ত্রীগণ রাণীর প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভবানীপ্রসাদ রাজবেশ-পরিহিত রাজমুকুট-শোভিত, রাজদণ্ডধারী অরুণকে লইয়া মথুরাসিংহের সহিত কল্যাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কল্যাণীকে একাকী দেখিয়া বালকের ন্যায় সরলচিত্তে হাসিয়া হাসিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিলেন—"দেখ, আমার ভাই অরুণকে কত সুন্দর দেখিতে হইয়াছে। এমন সোণার

ভাইকে এই বেশেই সুন্দর দেখায়। একি কল্যাণি! তুমি চুপ করিয়া রহিলে যে? তুমি বুঝি কাকার সম্মুখে মুখ তুলিয়া অরুণকে পূর্ণাঙ্গ দেখিতে পাও নাই?"

কল্যাণী যখন মুখ তুলিলেন তখন দেখিলেন গৃহের মধ্যে স্বামী ও সহোদর ভিন্ন অন্য কেহই নাই। সুতরাং অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া তিনি দেখিলেন, অরুণকুমার রায়পুরের অধিপতিবেশে সম্মুখে দণ্ডায়মান—তাঁহার মস্তকে মুকুট, হস্তে রাজদণ্ড, পরিধানে রাজবেশ। তাঁহার সেই সুন্দর শরীর মণিমুক্তাদিখচিত বসনভূষণে শোভিত হওয়ায় নক্ষত্র-পরিশোভিত নীল শারদাকাশতলস্থ চন্দ্রিকার ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়াছিল। ভ্রাতার সেই সুন্দর স্বভাব-গম্ভীর মুখ দেখিয়া, তাঁহার সেই অচিন্তিত-পূর্ব্ব অভ্যুদয় অনুভব করিয়া মহিষী কল্যাণী একটুও আনন্দ প্রকাশ করিলেন না। বরং তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "কেন তুমি তোমার পিতৃবংশের রাজমুকুট আমার ভ্রাতাকে প্রদান করিলে? কেন তুমি তোমার পিতৃপুরুষাধিকৃত রাজত্বের রাজদণ্ড আমার ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিলে? ইহার তো কোন আবশ্যকতা ছিল না। তোমার অনুপস্থিতিকালে আমার ভ্রাতা তোমার রাজত্ব শাসন করিতেছে শুনিলে আমি সুখী হইতাম। তাহার এ গৌরবে আমি কোন আনন্দ অনুভব করিতেছি না। আমি কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলাম যে, তুমি তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় সুখবোধ কর না। যে অবস্থাকে লোকে সুখের পরাকাষ্ঠা মনে করে, যে অবস্থায় উন্নীত হইবার জন্য সৃষ্টিকাল হইতে পৃথিবী-পৃষ্ঠ নরশোণিতসিক্ত হইতেছে, যে অবস্থায় অবস্থাপিত হইলে মানুষ অন্য মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইতে পারে—আমি অনেকদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলাম যে, তুমি সেই অবস্থায় থাকিয়াও প্রকৃত সুখবোধ করিতেছিলে না। আমি স্পষ্ট অনুভব করিতাম যে, তুমি প্রকৃত সুখান্বেষণ করিতেছিলে কিন্তু এত শীঘ্র যে তোমার এই

পরিবর্ত্তন হইবে তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই। সেইজন্যই বলিতে-ছিলাম—কেন তুমি তোমার রাজত্ব আমার ভ্রাতাকে দিলে ?"

ভবানীপ্রসাদ এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। এইবার কল্যাণীর বক্তব্য শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "যদি শুনিতে চাও, কেন এ কাজ করিয়াছি তাহা হইলে বলি—তুমিই ইহার কারণ। আমি এতদিন রাজ্য-লক্ষ্মীর সাহচর্য্যের জন্য আমার আদরিণী কল্যাণীর পূর্ণ সমাদর করিতে পারি নাই। এখন সেই উদ্দেশ্য-বিঘ্নকারিণী রাজ্যলক্ষ্মীকে হস্তান্তরিত করিয়া তোমারই সম্বর্দ্ধনা করিব স্থির করিয়াছি, কারণ আমি জানি পতিরতা অভিমানিনী-স্ত্রী, স্বামীকে অন্যাসক্ত দেখিলে অন্তর মধ্যে কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে।

আর এক কথা, আমি পরাধীনতা বড় ঘৃণা করি, স্বাধীনতা ভালবাসি। প্রকৃত স্বাধীনতা পাইবার জন্যই আমার এই রাজ্যত্যাগ। অন্যের দাসত্ব করিতে হইলেই যে, কেবল পরাধীনতা হয়, তাহা নহে। নিজের ভিতর যে কামনা, লোভ, মোহ প্রভৃতি আছে তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া থাকাও পরাধীনতা। শরীরের পরাধীনতা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের পরাধীনতা আরও কষ্টকর। যদি কাহারও শরীর অন্যের অধীন থাকে, অথচ ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য তাহার মন সকল প্রকার ভোগ-প্রবৃত্তির অনায়ত্ত হয়, তাহা হইলে সে মুক্ত, মুক্তির আনন্দ সে জানে। যদি একটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নরনারী সকল প্রকার অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে সে সম্প্রদায়ের পক্ষে বাহ্যিক-স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে অধিক সময় লাগে না। একটা জাতি প্রজার সমষ্টি মাত্র। সেই প্রজার সম্মুখে প্রকৃত স্বাধীনতার চিত্র রাখিবার জন্য আমার এই রাজ্যত্যাগ। যখন তাহারা আমাকে এই রাজ্যত্যাগ করিতে দেখিবে, আমাকে সকল সুখের অধিকারী দেখিয়া ও সর্ব্ববিষয়ে সক্ষম জানিয়াও যখন তাহারা সকল

প্রকার ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে দেখিবে, যখন তাহারা আমার এই ত্যাগের কথা লইয়া আলোচনা করিবে, তখনই ত্যাগের সুখ উপলব্ধি করিতে পারিবে। একবার সেই সুখের আস্বাদ পাইলে, একবার মনের স্বাধীনতায় নিজের স্বাধীনতা বোধ করিলে, তাহারা সকল সময়ে নিজেকে প্রবৃত্তির বন্ধন হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। আমার প্রজার মধ্যে যদি এই পরিবর্ত্তন আনিতে পারি, তাহা হইলে পরাধীনতার মধ্যেও তাহারা স্বাধীনতা ভোগ করিবে। এরূপ পরাধীনতায় অতি অল্প স্বাধীনতার লোপ হইয়া থাকে। একটা সাম্রাজ্য বিদেশীয় রাজার করতলগত হইয়া পরাধীন হইলে, প্রত্যেক প্রজার স্বাধীনতা অতি অল্প মাত্রায় বিলুপ্ত হয়। তাহাতে জাতির উচ্ছেদ হয় না। কিন্তু এরূপ পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের পরাধীনতা আসিলেই একটা জাতি ধ্বংস হইয়া যায় যাহাতে রায়পুর রাজ্য একেবারে বিনষ্ট না হয় এবং যাহাতে আমার প্রজার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহারই জন্য আজ আমি রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রজাকে ত্যাগের শিক্ষা দিলাম।”

ভবানীপ্রসাদের কথা শুনিতে শুনিতে কল্যাণীর লোচন-যুগল বাষ্প-পরিপূর্ণ হইয়া আসিল এবং তাঁহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল।

তাঁহারা সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, এমন সময় মথুরাসিংহ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—“দেখ অরুণ, তোমার পিতার দুইটি উদ্দেশ্যই ভগবানের অনুগ্রহে সাধিত হইয়াছে। তাঁহার আদরের কল্যাণী ভবানীপ্রসাদের সহধর্ম্মিনী হইয়াছে। এই বিবাহের পর তিনি যে সাহায্য লাভের আশা করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অধিক সুযোগ তোমার হস্তগত হইয়াছে। ভগবানের অনুগ্রহে তুমিই এখন রায়পুরাধিপতি হইয়াছ। এখন ইচ্ছা করিলে তুমি তোমার অর্থ ও সামর্থ্য তোমার অভিলাষানুরূপ

কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পার। এখন আমার ইচ্ছা তুমি তোমার রাজ্য শাসনাধীন করিয়া, তোমার প্রজাদিগকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিয়া, অবসরমত তোমার স্বর্গীয় পিতার তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হইবে। ভগবান কমলাপতির কৃপাদৃষ্টি ও তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ, তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবে।

"বেলা অধিক হইয়াছে; আর কালবিলম্ব করিও না। সকলে এইবার স্নানাহারের উদ্যোগ করিয়া লও।" এই বলিয়া মথুরাসিংহ গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

আজ অপরাহ্নে ভবানীপ্রসাদ সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করিবেন। মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পর হইতেই নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রাসাদে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বেই অসংখ্য নাগরিক প্রাসাদ সম্মুখে সমবেত হইল। অদ্য অরুণসিংহকে রাজ্যার্পণ করিতে দেখিয়া সকল সভাসদই রাজার ব্যবহারে একটু সন্দিহান হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই এই ধারণা হইয়াছিল যে, রাজা হয়ত স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। এই সংবাদ নগরে প্রচারিত হইলে অধিকাংশ নাগরিকই তাঁহাদের মহানুভব প্রজাবৎসল রাজার শেষ দর্শন-প্রাপ্তির আশায় প্রাসাদ-দ্বারে সমবেত হইয়াছিল।

আহারাদির পর ভবানীপ্রসাদ কল্যাণীকে লইয়া ভবানীমন্দির ও মহামায়ামন্দিরে গমন করিয়া প্রতিমা দর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অন্তঃপুরবাসী সকলেরই নিকট বিদায়

লইলেন। উভয় পক্ষেরই অবিরলধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। অন্তঃপুরবাসী সকলেরই হৃদয় কেমন একটা অজ্ঞাত দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রবাস-যাত্রার পূর্ব্বে এইরূপ সার্ব্বজনীন অশ্রুপতন অমঙ্গল-সূচক মনে হওয়ায় বৃদ্ধারা কনিষ্ঠাদিগকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু অশ্রুসম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহারাও অশ্রুবর্ষণে যোগ দিতে লাগিলেন। যে কল্যাণী রাজনন্দিনী হইয়াও কৃষ্ণবল্লভের সংসারে দাসি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সামান্য দাসী হইতে সচিব গৃহিণীকে পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে আপন সংসারে আসিয়া আপনার কর্তৃত্ব নিজহস্তে পাইয়া সকলকেই সুখী করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে? সেই জন্যই তাঁহাদের অঙ্কবাসিনী, চিত্তবিহারিণী, লক্ষ্মী-প্রতিমাকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে মনে করিয়া বৃদ্ধারা বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রেমের উৎসস্বরূপিনী কল্যাণীও তপ্ত অশ্রুপ্রবাহে তাঁহাদের স্নেহের সমভাবেই প্রতিদান দিতেছিলেন।

অন্তঃপুরবাসিনী সকলের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া ভবানীপ্রসাদ অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছিলেন। তাঁহার এক একবার মনে হইতেছিল—কেনই বা আমি ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বজনের এরূপ মনঃকষ্টের সৃষ্টি করিলাম। যখনই তাঁহার চিত্ত দুর্ব্বলতার অধিকারভুক্ত হইতেছিল, তখনই নানা প্রকার আশঙ্কা আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কল্যাণী ও মহামায়ার শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট, পুত্রোপম প্রজাদিগের চিন্তা, নির্জ্জনবাসের ক্লেশ ও বিপদ—এইরূপ কত ভাবনা ঘনীভূত হইয়া তাঁহার মানসচক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছিল। একবার তাঁহার ইচ্ছা হইল—এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সুখ ও দুঃখের সহিত এই সংসার মধ্যেই বাস করি। তাহাতে আত্মতৃপ্তি না হইতে পারে কিন্তু অপর কাহারও ত কোন কষ্ট হইবে না। একবার ইচ্ছা হইল,

মথুরাকে ডাকাইয়া তীর্থযাত্রা বন্ধ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি কিন্তু সহসা তাঁহার মনে হইল—এ রাজ্য দান করিয়াছি ; এখন এ রাজ্যে বসতি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অধিকন্তু, এতদিন যে কথনও কোন মানসিক দুর্ব্বলতা কাহারও সমক্ষে প্রকাশ করে নাই, আজ সে কেমন করিয়া এত দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে? ভবানীপ্রসাদ আত্মদমন করিলেন। যেমন তাঁহার চিত্তস্থির হইল, তথনই সংসারের আবিলতা, চাঞ্চল্য, ও অশান্তি তাঁহার মানসপটে উদিত হইল। তিনি পুনর্ব্বার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ত্যাগের সহিত লোভের দ্বন্দ্বে লোভেরই পরাজয় ঘটিল।

ভবানীপ্রসাদ ও কল্যাণী অশ্রুবর্ষণের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় যাত্রার সঙ্কেতসূচক তূর্য্যধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, যাত্রার সময় হইয়াছে। ভবানীপ্রসাদের মনে হইল—তাঁহার পিতৃপুরুষের বাটী ও তাঁহার জন্মস্থান—যথায় তিনি শৈশব হইতে লালিত পালিত হইয়াছেন, তাঁহার সেই প্রকোষ্ঠ—যথায় বসিয়া তিনি জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মোহন ছবি দেখিতেন, তাঁহার সেই গৃহ—যথায় যৌবনাবধি কল্যাণীর প্রেমোপভোগ করিয়াছেন, যথায় পবিত্র প্রেমের ফলস্বরূপ কল্যাণীকে কারাবাস করিতে হইয়াছিল—এইবার সেই সকল সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে ভরা জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তিনি মহামায়াকে ডাকাইলেন এবং স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন।

ভবানীপ্রসাদ কল্যাণীকে লইয়া একবার পালঙ্কে উপবেশন করিলেন। অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি একত্র সম্মিলিত হইয়া তাঁহার চিত্তাবরোধ উন্মোচন করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু-প্রবাহ অবাধগতিতে প্রধাবিত হইল। কল্যাণীর হস্তে হস্ত রাখিয়া তিনি একবার করিয়া গৃহস্থিত সমুদয় বস্তুই

দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যে, ইহাদের সহিত এই তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ। অল্পক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা কল্যাণীর চক্ষু মুছাইয়া নিজ অশ্রু মুছিলেন এবং মহামায়া ও কল্যাণীকে লইয়া তিনজনে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইষ্টদেবকে প্রণাম করিলেন। পরে বিশ্বনাথকে স্মরণ করিতে করিতে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া তাঁহারা বহির্দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন, রাজপথে একদিকে অসংখ্য সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং অন্যদিকে নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শকট ও অশ্বারোহণে অপেক্ষা করিতেছেন। রাজশকট তথায় উপনীত হইলে সকলকে প্রস্তুত হইবার জন্য তুর্য্যধ্বনির দ্বারা আদেশ করা হইল এবং পরক্ষণেই মন্থরগতিতে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদত্ত হইল। তখন সেই বিপুলবাহিনী ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। সূর্য্যকিরণ-প্রতিফলিত উর্ম্মিমালার ন্যায় সেই অগণ্য সশস্ত্র সৈন্য সমতাল পদক্ষেপে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

অতি অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই ভবানীপ্রসাদ দেখিলেন যে, প্রান্তরমধ্যে সংখ্যাতীত লোক সমবেত হইয়া রাজপথ-প্রতি উন্মুখ হইয়া চাহিয়া আছে। তিনি বুঝিলেন, তাঁহারই প্রজামণ্ডলী আজ রাজসন্দর্শনার্থে আগমন করিয়াছে। এ দৃশ্য দর্শন করায় তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইল। দুই এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়নপ্রান্তে দেখা দিল. রাজশকট প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী হইলে আবার তুর্য্যধ্বনি হইল। তখন সেই বিপুলবাহিনী জোয়ারের অবসানে গঙ্গাজল যেরূপ নিশ্চল থাকে, সেইরূপ ভাবেই স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সকলকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে রাজা শকটোপরি দণ্ডায়মান হইলেন এবং অল্পক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া তিনি তাঁহার পুত্রোপম প্রজাদিগের নিকট বিদায় চাহিলেন। তখন সেই অসংখ্য

জনমণ্ডলী অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাহাদের অধিপতিকে প্রণাম করিল এবং পরে সেই বদ্ধাঞ্জলি উর্দ্ধদিকে প্রেরণ করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইল। রাজা পুনরায় সকলের দিকে ফিরিয়া বিদায় লইলে তূর্য্যধ্বনি-দ্বারা সেই বিপুলবাহিনী চালিত হইল।

পূর্ব্ব হইতেই নগরের প্রান্তভাগে পট্টাবাস সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল এবং স্থির ছিল যে, রাজা তথায় স্ত্রী কন্যা ও সহচরদিগের সহিত রাত্রি-যাপন করিবেন। সন্ধ্যার পর সেই বিপুলবাহিনী তথায় উপস্থিত হইল।

রাজরাণী কল্যাণী ও রাজপুত্রী মহামায়াকে লইয়া অরুণসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলে ভবানীপ্রসাদ মথুরাসিংহকে লইয়া একে একে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। সকলের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সৈন্যদিগের নিকট গমন করিলেন। তথায় তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া তাহাদের জন্মভূমি ও পিতৃপুরুষের আবাসস্থলের রক্ষা ও সমৃদ্ধি-সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সময়োচিত উপদেশ দিলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে কতিপয় প্রসিদ্ধ সৈনিক পুরুষকে থাকিতে বলিয়া অবশিষ্ট সকলকে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন।

সকলে বিদায় গ্রহণ করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলে তাঁহারা শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং অরুণের নিকট গিয়া বিদায় গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু মথুরাসিংহ ও কল্যাণীর নিকট যাপন করিতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন কিন্তু যখন ভবানীপ্রসাদ আসিয়া তাঁহাকে সস্নেহে বক্ষবদ্ধ করিয়া গভীর প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিলেন, তখন তিনি প্রথম বিচ্ছেদ দুঃখ অনুভব করিলেন। রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এতদিন তিনি তাঁহার নিজের অবস্থা-সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। তাঁহার মেঘাচ্ছন্ন অদৃষ্টাকাশ কিছুকালের জন্য নির্ম্মল

হইয়া আবার যে কিরূপ অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে তাহা তিনি পূর্ব্বে সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন ভবানীপ্রসাদের বক্ষে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় তথা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন, তখন জগৎ তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া মনে হইল, চতুর্দ্দিক তমসাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার মস্তক ঈষৎ ঘূর্ণিত হওয়ায় তিনি বালকের ন্যায় বিমূঢ় হইয়া ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন। পূর্ব্বানুভূত এবম্প্রকার ভীষণদর্শন চিত্র তাঁহার মানসপটে উদিত হইল। পিতামাতার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার জীবনের উপর দিয়া যে মহাবাত্যা বহিয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার নয়নসমক্ষে নিমেষের মধ্যে প্রতিফলিত হইল। তারপর ভবানীপ্রসাদের সহিত কল্যাণীর বিবাহ হওয়াতে যে তাঁহার দুঃখের অবসান হইল এবং পুনরায় আত্মীয়ের সেবাযত্ন পাওয়ায় তাঁহার চিত্ত রায়পুর রাজপরিবারের প্রতি যে কিরূপ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সে কথাও তাঁহার মনে হইল। মথুরার স্বার্থত্যাগ ও আত্মীয়তার কথা স্মরণ করিয়া মুগ্ধান্তঃকরণে অরুণ তাঁহার চরণযুগল বেষ্টন করিয়া তাহার উপর মস্তক রক্ষা করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মথুরা তাঁহাকে বাহুমধ্যে বেষ্টন করিয়া তাঁহার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"অরুণ, কর্ম্মময় জগৎ তোমার সম্মুখে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে থাকিয়া যতই তুমি কর্ম্ম করিবে, ততই তোমার আত্মীয়, বন্ধু ও সুহৃৎ লাভ হইবে। অবশ্য কর্ম্ম করিতে বা গতানুগতিক ভাব ছাড়িয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে দেখিলে অনেকে ঈর্ষান্বিত হইয়া তোমার প্রতি শত্রুতা সাধন করিবে। কিন্তু যদি তুমি দিক্‌দর্শনশলাকার ন্যায় ভগবচ্চরণাবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কর্ম্ম করিতে থাক এবং ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ্য বিবেচনা করিয়া নিজেকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত কর, তাহা হইলে তোমার তেজঃপ্রভাব অচিরেই শত্রুকুলকে হীনপ্রভ করিবে। কর্ম্মই একমাত্র সুখ। সুবুদ্ধিপ্রণোদিত কর্ম্মে যত সুখ পাওয়া যায়, তত

অন্য কোন মার্গে পাওয়া যায় কিনা, জানি না। আমি এই সুখাস্বাদে তৃপ্তি পাইয়াছিলাম বলিয়াই তোমাকে এই পথে আনিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি—তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে সক্ষম হও।”—মথুরা পুনরায় তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মস্তক চুম্বন করিলেন এবং মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কল্যাণী আসিয়া সাশ্রুনয়নে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে প্রণাম করিলেন এবং মহামায়াকেও তদ্রূপ করিতে বলিলেন। সকলে অরুণের নিকট বিদায় লইলে তিনি তাঁহাদের সহিত অবশিষ্ট রাত্রি সেইখানে থাকিবেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভবানীপ্রসাদ বলিলেন—“আজ পুরবাসিনী সকলেই অত্যন্ত শোকাকুলা; বিশেষতঃ তোমার বালিকাপত্নী; তুমি অবিলম্বে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন কর। তোমাকে দেখিলে এবং তোমার মুখে আমাদের সংবাদ পাইলে তাঁহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইবেন।”—কিছু-দিন পূর্ব্বে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুরূপা কন্যার সহিত অরুণসিংহের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

এই কথার উপর অরুণ পুনরুক্তি না করিয়া দুঃখ-ভারাক্রান্তচিত্তে তিনি মহামায়াকে চুম্বন করিলেন এবং ধীরে তাহাকে শকট হইতে অবতরণ করাইয়া অশ্ব চালিত করিতে আদেশ দিলেন। যতক্ষণ সেই শিবির ও শিবিরবাসীগণ দৃষ্টিপথবর্ত্তী রহিলেন, ততক্ষণ অরুণসিংহ সেইদিকেই চাহিয়া থাকিলেন। যখন তাঁহারা দৃষ্টিপথ অতিক্রান্ত হইলেন, তখন শকট অতি দ্রুতবেগে চালিত হইল এবং তিনি শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে সেই অদৃশ্য প্রিয়তমগণের স্মৃতি-ধ্যানে তন্ময় হইয়া তন্মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

"কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারম্।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীসহিতং নমামি ॥"

মহাশিবপুরাণ।

মথুরাসিংহ বালক-কাল হইতে অদৃষ্টবৈগুণ্যে এরূপ পর্য্যটনে অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কখন কোন্ দ্রব্যের অভাব অনুভব করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। তাঁহার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাবশতঃ পর্য্যটনকালেও এরূপ ব্যবস্থা হইতে লাগিল যে, ক্লেশসহনে অনভ্যস্ত ভবানী-প্রসাদ ও মহামায়া কোন কষ্ট অনুভব করিতেন না। পান্থশালা পাওয়া গেলে তাঁহারা সেইখানে আশ্রয় লইতেন কিন্তু রাজপরিবারের কাহাকেও পর্য্যটনশ্রমে কাতর দেখিলে গ্রামের নিকট শিবির স্থাপন করিয়া মথুরা সকলকে লইয়া কিছুদিনের জন্য তথায় বিশ্রাম করিতেন। গ্রামবাসীগণ তাঁহাদের সুখ ও সুবিধার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিত। যদিও ভবানী-প্রসাদ এবং তাঁহার সহচরদিগের মধ্যে কোনও প্রকার রাজচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না, তথাপি তাঁহাদের আকৃতি ও আচার ব্যবহার দেখিয়া সকলেই অনুমান করিত যে, কোন সঙ্গতি-সম্পন্ন পরিবার তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। কখনও কখনও তাঁহারা গ্রামবাসীদিগের নিকট এরূপ সমাদর, সহানুভূতি ও সেবা পাইতেন যে, ভবানীপ্রসাদ, কল্যাণী ও মহামায়া নূতন আনন্দ উপভোগ করিয়া তীর্থ-পর্য্যটন-ক্লেশ সম্যক্ বিস্মৃত হইতেন। উন্মুক্ত প্রান্তর, অবিচ্ছিন্ন বনরাজি, অবিরল প্রবাহিত স্রোতস্বিনী, স্বচ্ছন্দবিহারী বন্য পশুপক্ষী, অরণ্য-মধ্যে ক্বচিদ্দৃষ্ট হরিণ ও সময়ে সময়ে ময়ূরদম্পতী তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিত। বালিকা মহামায়াকে সময় সময় ক্ষুধা-

তৃষ্ণায় কাতর হইতে হইত; কিন্তু এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে সে এই কাতরতা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে কখনও মাতাপিতার নিকট এরূপ অবিচ্ছিন্ন আদর ও যত্ন পায় নাই বলিয়া সে এখন সকল সময়ে আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিত। সুখ ও দুঃখের মধ্য দিয়া এই ভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহারা চতুর্থ মাসে তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন।

সহরের এক প্রান্তভাগে গৃহস্থ পরিবারের বাসোপযোগী একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে সকলে মিলিয়া এক সপ্তাহ কাল বাস করিলেন। অষ্টম দিবসে ভবানীপ্রসাদ তাঁহার সৈন্য, পাচক ও বাহক প্রভৃতি সকলকে পাথেয় ও যথোচিত বিদায় দিয়া রায়পুর নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। যে সকল অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন, সেগুলিকেও রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। সুতরাং আজ হইতে রায়পুরাধিপতি ভবানীপ্রসাদ সাধারণ গৃহস্থের মত স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া মথুরার অভিভাবকত্বে বসতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সেই পুণ্যতীর্থ বারাণসী—যথায় মহারাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে নিজস্ব সকলই দান করিয়া দক্ষিণা প্রদানের জন্য চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন; যথায় ভগবান বুদ্ধদেব জন্মজরাব্যাধিমৃত্যুর হস্ত হইতে জীবের উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া জনসমাজে সেই মুক্তিপথ প্রথম প্রদর্শন করিয়াছিলেন; যথায় ভাস্করানন্দ প্রমুখ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ সকল কালে অবস্থিতি করিয়া স্থানটি পবিত্র ও শান্তিময় করিতেছেন! সংসার সুখকামনাবিরহিত ভবানীপ্রসাদ শান্তি ও আনন্দলাভের উপায় হইতে পারিবে আশা করিয়া কাশীপুরাধিশ্বরী অন্নপূর্ণাদেবী ও বারাণসীপুরপতি বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণে উপস্থিত হইলেন।

প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সকলে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে গমন

করিতেন এবং তথায় পূজাদর্শনাদি সমাপন করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া দণ্ডী ও ব্রহ্মচারীদিগের শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রালোচনা শুনিতেন। যখন বেলা প্রহরাতীত হইত, তখন তাঁহারা আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। সাধারণ আহারের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত করণে সকলেই সাহায্য করিতেন এবং কল্যাণী সেইগুলি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন এবং পরে স্বামীর পাত্রে প্রসাদ পাইতেন। অপরাহ্নে আবার সকলে গঙ্গাতীরে যাইয়া অগ্নিহোতৃগণের হোম দেখিতেন ও শাস্ত্র পাঠ শুনিতেন। যখন রাত্রি হইত তখন তাঁহারা স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

এইরূপে কিছুদিন তাঁহাদের বেশ আনন্দে কাটিল। কোলাহলপূর্ণ নগরী, অভাব ও আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সংসার, বাসনাধীন ও অতৃপ্তচিত্ত সংসার-বাসীদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সদানন্দময় আত্মীয়স্বজন লইয়া শান্তিপূর্ণ, নিবৃত্তিভাবোদ্দীপক নগরীতে বাস করিতে কাহার না আনন্দ হয়? কিন্তু জীবধর্ম্ম এই যে, সহজে কেহ অভ্যস্ত পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথ অবলম্বন করিতে পারে না। সুতরাং এই অভিনব জীবন সুখময় হইলেও কিয়দ্দিবস পরে কল্যাণী ও মহামায়া কেমন একটা অতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। আর যেন কোন জিনিষেই তাঁহারা আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন না। যখন কল্যাণী নিজ চিত্তের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া আত্মদমন করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি দেশকালের প্রভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহারও অলক্ষিতে তাঁহার নিজের মনের উপর ৺কাশী স্বকীয় মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে।

পবিত্র তীর্থ কাশীর একটি বিশেষত্ব এই যে, যাহার মন যেরূপই সংসারাসক্ত বা কামনাপূর্ণ হউক না কেন, কিছুদিন তথায় বাস করিয়া গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শন করিলে এবং গঙ্গাতীরে দণ্ডী, ব্রহ্মচারী ও অসি-

সঙ্গমে জীবন্মুক্ত সাধুসন্ন্যাসী দর্শন করিলে, তাহার মন হইতে সকল বাসনা তিরোহিত হওয়ায় সংসারে অনাসক্তি আসিয়া থাকে। কল্যাণীরও তাহাই হইল। কিছুকাল অতীত হইলে তিনি সেই তীর্থস্থানের শান্তি ও পবিত্রতা অনুভব করিয়া সংসারকে অশুচি জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক হৃদয়মুকুরে জগৎস্বামী বিশ্বনাথ তাঁহার পতি-দেবতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক অপরূপ জ্যোতিষ্ক মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রতিভাত হইলেন। এতদিন স্বামীর মহান্ উদ্দেশ্য ও মহান্ হৃদয় ধারণা করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি নিজেকে অতি হীন বিবেচনা করিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তখন তিনি শাস্ত্রের আদেশ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিলেন,—

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবদিষ্ট কার্য্যেষু ভার্য্যাভর্ত্তুঃসদা ভবেৎ ॥ *

—এবং এখন হইতে চিন্তা ও কার্য্যে এই উক্তির অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

একদা সন্ধ্যার পর সকলের সহিত দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কল্যাণী রন্ধন সমাপন করিলেন এবং সকলকে আহার করাইয়া নিজে স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পাইলেন। স্বামী শয়ন করিলে শয্যাতলে বসিয়া পদসেবা করিতে করিতে যখন তাঁহাকে গভীর নিদ্রাভিভূত দেখিলেন তখন তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া স্বামিপদ সম্মুখে রাখিয়া শয্যাতলে বসিলেন এবং বারাণসী ধামে আসা অবধি পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা চিন্তা করিতে লাগিলেন। যতই তিনি আলোচনা করিতেছিলেন, ততই

* "পত্নী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত হইবেন, পবিত্র থাকিবেন, স্বামীর হিতকর্ম্মে সখীর ন্যায় হইবেন এবং আদিষ্ট কার্য্যসমূহ দাসীর ন্যায় সম্পাদন করিবেন।" [বিবাহমঙ্গল]।

তাঁহার চিত্তে ক্ষোভের উদয় হইতেছিল। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া স্বকৃত পাপের জন্য তিনি আত্মনিন্দা করিলেন এবং চিত্তের স্থৈর্য্য ও পবিত্রতা সম্পাদনের জন্য রাত্রিশেষে গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইলেন। পতিতপাবনী, সন্তাপহারিণী গঙ্গাকে স্পর্শ ও প্রণাম করিয়া কল্যাণী পাপপ্রক্ষালনার্থ অবগাহন করিলেন। চিত্তের চাঞ্চল্য বিনষ্ট হইলে আর্দ্রবস্ত্রে ও আর্দ্রমস্তকে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই স্বামীর শ্রীচরণে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া পুনর্ব্বার গৃহতলে উপবেশন করিলেন। যখন স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন তিনি তাঁহার আর্দ্রমস্তক স্বামীর চরণতলে ধারণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করিলেন।

স্বামীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কল্যাণী অধিকতর উৎসাহে তাঁহার প্রত্যক্ষ দেবতার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বের মতই স্বামীর অভিপ্রেত ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আদিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই আহরণ করিয়া যথাস্থানে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন। পূর্ব্বের মতই তিনি স্বামীর পূজার স্থান মার্জ্জিত করিয়া পুষ্পচন্দনাদি উপকরণ সাজাইয়া রাখিতেন। পূর্ব্বের মতই তিনি স্বামীর সহিত বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইতেন এবং দশাশ্বমেধঘাটে বা অসিসঙ্গমে সাধুদিগের শাস্ত্রালাপ শুনিতেন। কিন্তু এখন তাঁহার সকল কার্য্যেই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। যতক্ষণ স্বামী পূজায় নিযুক্ত থাকিতেন, ততক্ষণ তিনি তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া মুদ্রিতনেত্রে ভগবানের চিন্তা করিতেন। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে স্বামীর সহিত একযোগে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাধুসন্ন্যাসীদিগের শাস্ত্রালাপ শুনিয়া স্বীয় বুদ্ধির অগম্য বিষয়গুলি বুঝিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মীমাংসা করিয়া লইতে লাগিলেন। কখনও বা সংশয়াধীন হইয়া কোন বিষয়ে তিনি স্বামীর সহিত আলোচনা করিতেন। একদিন স্বামীর সহিত বসিয়া দুইজন

সাধুর কথোপকথন শুনিতে শুনিতে কোন এক বিষয়ে সন্দেহপ্রযুক্ত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া এরূপ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন যে, তাঁহার কথা শুনিয়া ও চিত্তভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। যখন সেই সাধুদ্বয় কল্যাণীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার বুদ্ধি ও সৎপ্রবৃত্তির প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহারই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন তখন ভবানীপ্রসাদ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন। মীমাংসা সমাপ্ত হইলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সেই জীবন্মুক্ত-পুরুষদ্বয়কে প্রণাম করিয়া সানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কল্যাণীর এরূপ উচ্চ মনোভাব, ধর্ম্মবুদ্ধি ও আকিঞ্চন দেখিয়া ভবানীপ্রসাদ স্বস্তি বোধ করিলেন। এতদিন তাঁহার এই সন্দেহ ছিল যে, তাঁহাদের জীবনের এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে কল্যাণী হয়ত কত কষ্টই অনুভব করিয়া থাকিবেন। কল্যাণী এই নূতন জীবন সম্বন্ধে কোন কথাই স্বামীকে বলিতেন না বলিয়া এরূপ সন্দেহ ভবানীপ্রসাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু সে অমূলক সন্দেহ আজ তাঁহার মন হইতে দূরীভূত হইল। তিনি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া স্ত্রীর সহিত মুক্তিপথপ্রয়াসী হইতে সক্ষম হইলেন।

কল্যাণী ও ভবানীপ্রসাদ যতই ধর্ম্মপথাবলম্বী হইতে লাগিলেন, ততই সংসারের প্রতি তাঁহাদের অনাস্থা জন্মিতে লাগিল। তাঁহাদের আহার নিদ্রার সময় অনিয়মিত হইয়া উঠিল দেখিয়া মথুরাসিংহ মহামায়ার সকল তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। মহামায়ার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া, তাহার স্নানাহারের ব্যাবস্থা করিয়া, অবসরমত তাহাকে প্রাথমিক শিক্ষাদান করিয়া মথুরা তাহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কখনও বা স্নেহবশতঃ সংসারের সকল রন্ধনাদি সমাপন করিয়া অসময়ে মন্দির হইতে প্রত্যাগত ভবানীপ্রসাদ ও কল্যাণীকে আহার করিতে

বলিতেন। ফলতঃ, সংসারত্যাগী সেই স্ত্রীপুরুষের সেবা ও মহামায়ার লালন-পালনই মথুরাসিংহের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া তাহার মাতাপিতার অপূর্ব্ব চরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু নিজের কাছে তাঁহাদিগকে সকল সময়ে না পাওয়ায় সে সেই মহান্ চরিত্রের বিশেষ ধারণা করিতে পারে নাই। অধুনা মাতাপিতার নিকট সকল সময়ে থাকিতে পাইয়া সে বেশ বুঝিয়াছিল যে, সে যুগ্মহৃদয় কত উদার, কত উন্নত, কত প্রেমিক। যখন সে রায়পুর রাজান্তঃপুরবাসিনী সকলের নিকট আন্তরিক স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পাইত, যখন তাহাকে আদর করিবার জন্য জনপদবাসী প্রত্যেক গৃহস্থকে উৎসুক হইয়া আসিতে দেখিত, তখন তাহার মনে হইত যে, এ সকলই তাহার মাতাপিতার প্রেমের প্রতিদান। কিন্তু সে প্রেম কত গভীর তাহার ধারণা মহামায়া তখন করিতে পারিত না। এখন সেই প্রেমময় মাতাপিতার অতুলনীয় চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে তাঁহাদিগকেই নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ স্থির করিল। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, পবিত্র অনুষ্ঠান, শাস্ত্রালাপ এবং শাস্ত্রালোচনা তাহার অনুকরণের আদর্শ হইয়া উঠিল। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই সে বহিঃসৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তঃসৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ ও কমনীয়তা অনুভব করিল এবং পিতৃপ্রদর্শিত মার্গই যে প্রকৃত সুখোৎপাদন করিতে পারে এই বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল।

রায়পুররাজ্যে বসতিকালে মহামায়া সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া-

ছিল। এখন মথুরাসিংহ ও পিতার নিকট সে অধিকতর আগ্রহসহকারে সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। কাশীতে চারি বৎসর অবস্থানকালে সে সংস্কৃত চর্চ্চায় অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। পিতামাতার মধ্যে শাস্ত্রালোচনার সময় সে মাতার পার্শ্বে বসিয়া সে সকল বুঝিবার চেষ্টা করিত এবং অভ্যাসবশতঃ অনেকস্থলে বুঝিতেও পারিত। এইরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ণ ও শাস্ত্রালাপই তাহার দৈনন্দিন প্রিয় কার্য্য হইয়া উঠিল।

পবিত্র চিন্তা ও পবিত্র কার্য্যে লিপ্ত থাকায় মহামায়ার শরীর-মনের উপর এক অনন্যসুলভ জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিল। সংসারাশ্রমোপলব্ধ অঙ্গসৌষ্ঠব ও কমনীয়তার সহিত তপোবনসুলভ পবিত্রতা ও তেজস্বিতার সংমিশ্রণে মহামায়ার রূপরাশি অপূর্ব্বভাব ধারণ করিল। ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সে মাতাপিতার সহিত প্রয়াগ দর্শনে যাত্রা করিল।

যেদিন এই ধর্ম্মপ্রাণ-গৃহস্থ বাস উঠাইয়া কাশী হইতে প্রয়াগ যাত্রা করিলেন, সেইদিন অনেক সাধু-সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষ হইতেই সাধু সমাগম আরম্ভ হইয়াছিল। মহামায়া:সেই মহাপুরুষদিগের পদ প্রক্ষালন করিয়া আতিথ্য-ধর্ম্ম পালন করিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছিল। পরে তাঁহাদের পরিচিত এক জীবন্মুক্ত পুরুষের শুভাগমন হইলে মহামায়া তাঁহার শ্রীচরণ ধৌত করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিল এবং এক গণ্ডূষ পাদোদক পান করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল। মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ করিলেন—"এই দুর্দ্দিনে সাধুর ও মাতাপিতার সেবাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হউক।" এই আশীর্ব্বাদ ও আদেশবাণী মহামায়ার হৃদয়োপরি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইল।

রায়পুর হইতে আসিবার সময় মথুরাসিংহ যে স্বর্ণরত্নাদি আনিয়াছিলেন,

তাহাতে এতদিন তাঁহাদের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াছিল। উদ্বৃত্ত যাহা কিছু ছিল তদ্দ্বারা তিনি আহার্য্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া নৌকাযোগে প্রয়াগ গমনের ব্যবস্থা করিলেন। যতই তাঁহারা অগ্রসর হইতেছিলেন ততই ভবানীপ্রসাদ ও কল্যাণীর মন ধর্ম্ম ও প্রেমরূপা গঙ্গা-যমুনার সম্মিলন দেখিবার জন্ম উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। অবশেষে দূর হইতে সরল-প্রবাহিত নীলজলস্রোত দেখিয়া এবং নৌকা পার্শ্বে নীলশারদাকাশ-মধ্যগত শুভ্রমেঘখণ্ডের ন্যায় নীলাভ জলমধ্যে ঈষৎ লোহিতাভ জলকুণ্ডল দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা সঙ্গমস্থলের নিকটেই আসিয়াছেন। অল্প পরেই স্বচ্ছ জলতলে প্রতিভাত কৃষ্ণমেঘের ছায়ার ন্যায় নীলজল তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। পরে নৌকা প্রকৃত সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলে তাঁহারা অস্তকালীন নির্ম্মল আকাশগাত্রস্থ নীললোহিত কিরণ-লেখার ন্যায় নীললোহিত জলপ্রবাহ দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। গঙ্গা-যমুনার মিলন-সৌন্দর্য্য কিয়ৎকাল দেখিয়া সকলে সঙ্গমস্থলে অবতরণ করিয়া স্নান করিলেন এবং নৌকাযোগে গমন করিয়া সঙ্গমসন্নিহিত যমুনাতীরস্থিত মন্দিরপ্রাঙ্গণে আবাস গ্রহণ করিলেন।

ভবানীপ্রসাদের ইচ্ছা হইল যে, এই প্রয়াগতীর্থে তিনি সংসারাশ্রমের সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। সুতরাং এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া মথুরাসিংহকে তাহার আয়োজন করিতে বলিলে সকলেই সেই পথ অবলম্বন করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। কোন্ পতিপ্রাণা সতী স্বামীকে সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত দেখিয়া নিজে অলঙ্কার ধারণ করিতে পারেন? কল্যাণীও স্বামীর সহিত সন্ন্যাসিনী হইবেন বলিলেন। মথুরা ত পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসী ছিলেন; সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহাকে কিছুই করিতে হইবে না। কিন্তু গোলযোগ করিল মহামায়া। সে বলিল—"আমিও সন্ন্যাসিনী হইব। মা যেমন থাকিবেন, আমিও সেইরূপ থাকিব।"

যখন ভবানীপ্রসাদ এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন মহামায়া-সম্বন্ধে তিনি কোন চিন্তাই করেন নাই। এখন মহামায়ার কথা শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। পিতৃহৃদয় করুণায় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে, জীবনের প্রথম হইতেই মহামায়াকে সুখ ও সম্ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি; আবার এখন হইতেই তাহাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইতে হইবে। দুঃখে ভবানীপ্রসাদ অশ্রুবর্ষণ করিলেন। কিন্তু মহামায়া কাশীর সেই জীবন্মুক্ত-পুরুষের শেষ আশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া অটল রহিল।

মাতাপিতা অনেক প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু মহামায়ার চিত্ত অবিচলিত রহিল। পরে যখন মহামায়া দেখিল যে, মাতাপিতা অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন, তখন সে বলিল—"আমি অলঙ্কার ত্যাগ করিব না ও মস্তক মুণ্ডিত করিব না; কিন্তু আপনাদিগের মতই গৈরিকবসন ধারণ করিব এবং আপনারা যেরূপ আহার করিবেন সেইরূপ আহারেই অভ্যস্ত হইবার চেষ্টা করিব।" অগত্যা মহামায়ার এই প্রস্তাবে সকলকে সম্মত হইতে হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল এই প্রয়াগতীর্থ অতি পবিত্র। ভক্তি, প্রেম ও জ্ঞানরূপা ত্রিধারা একত্র মিলিত হওয়ায় মর্ত্ত্যে এরূপ দেবদুর্লভ স্থান সৃষ্ট হইয়াছে যে, ভক্তিভাবে তথায় স্নান করিলে মনুষ্যের সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকারী হইতে পারে।

পরদিন অতি প্রত্যূষে ভবানীপ্রসাদ স্ত্রী, কন্যা ও মথুরাসিংহের সহিত এই পবিত্র সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ভবানীপ্রসাদ এবং পরে

মথুরাসিংহ মস্তক মুণ্ডিত করিলেন। অবশেষে কল্যাণী এক পার্শ্বে গিয়া তাঁহার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকদাম স্বহস্তে ছেদন করিলেন এবং মহামায়ার সাহায্যে সেই ছেদন কার্য্য সম্পূর্ণ করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া সেই পাপহারিণী ত্রিস্রোতার জলে অবগাহন করিয়া পবিত্রাত্মা হইবার জন্য জলস্পর্শ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পুণ্যস্রোতা গঙ্গা-যমুনা! তোমরা পূর্ব্বের মত এখনও এই ভারতভূমিতে প্রবাহিত হইতেছ। এখনও তোমরা মাতৃস্তন্যের ন্যায় সলিলদানে ভারতবাসীর জীবন রক্ষা করিতেছ। এখনও তোমরা আপন উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপনার ভাবে বিভোর হইয়া অনন্তের দিকে প্রবাহিত হইতেছ। তোমাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্য্য এখনও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে কিন্তু তোমাদের দানে পরিপুষ্ট নরনারীর এত পরিবর্ত্তন কেন হইল?

স্নানান্তে সকলে জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিক সমাধা করিয়া তীরে উঠিলেন। তখন আর্দ্রবসনে কল্যাণী স্বামীর চরণবন্দনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইলেন এবং তাঁহারই অনুমতি লইয়া সধবা চিহ্নসূচক শঙ্খবলয় মাত্র রাখিয়া দেহ হইতে অপর আভরণ উন্মোচন করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিলেন। যখন এই নবীন সন্ন্যাসীগণ পবিত্র গৈরিকবসন ধারণ করিয়া প্রয়াগের মহিমা চিন্তা করিতে করিতে সঙ্গমাভিমুখ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন স্নানার্থ আগত নরনারী বহুকাল-অন্তর্হিত এক পবিত্র-দৃশ্য স্মরণ করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ-চিত্তে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাহাদের মনে হইতেছিল যে, পিতৃসত্যপালনার্থ শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া সেবক লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতাদেবীকে লইয়া পুনর্ব্বার প্রয়াগধামে উপনীত হইয়াছেন এবং ব্যথিত-চিত্তা অযোধ্যার রাজ্যলক্ষ্মীও রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন। যে চিন্তা এখনও ভারতবাসীর হৃদয়ে বিরাজিত থাকিয়া

পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছে, সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা স্ব স্ব উদ্দেশ্য ভুলিয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

এই সেই বটবৃক্ষ যাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সীতাদেবী একদিন বর চাহিয়াছিলেন যে, স্বামীর বনবাস-ব্রত যেন নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয় এবং যেন তাঁহারা সকলে মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রার নিকট উপস্থিত হইতে পারেন। আজ সেই বটবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া কল্যাণী প্রণতা হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন যে, স্বামীর নিভৃতবাস যেন সফল হয় এবং তিনি নিজে যেন স্বামীর সুখদুঃখের অংশভাগিনী হইয়া তাঁহারই সেবা করিতে করিতে ইহলোক ত্যাগ করিতে পাবেন।

অনন্তর তাঁহারা সকলে যমুনাতীরস্থিত মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহাই তাঁহাদের আশ্রম হইল।

প্রয়াগধামে এই নবীন সন্ন্যাসীদিগের আগমনবার্ত্তা অচিরে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল এবং সেই পবিত্র পুরুষদিগকে দর্শন করিবার জন্য ভক্ত-হিন্দুগণ দলে দলে তথায় আসিতে লাগিল। তাঁহাদিগের তেজোদীপ্ত সুন্দর-মূর্ত্তি, পবিত্র আচার-ব্যবহার ও বিনীত নম্রভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। প্রথম দর্শন হইতেই তাহাদের চিত্ত এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, অনেক গৃহস্থ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া মধ্যে মধ্যে এই আশ্রমে আসিত এবং তাঁহাদিগের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া পবিত্র মনে গৃহে ফিরিয়া যাইত। ফলতঃ, এই আশ্রমে জনসমাগম এত অধিক হইতে লাগিল যে, প্রতিদিনই তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী পাইতে লাগিলেন। এই অযাচিত দান গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

ভবানীপ্রসাদের জপ, তপ, শাস্ত্রালোচনা সকলই অব্যাহত রহিল। সময়ে সময়ে যমুনাপুলিনে বসিয়া তিনি ভাবিতেন, এই প্রয়াগ-তীর্থই পতিত হিন্দুজাতির প্রকৃত তীর্থ। এই অধঃপতিত জাতি আজ প্রেম, ভক্তি ও

জ্ঞান হারাইয়াছে,—সেইজন্যই বোধ হয় বিশ্বনিয়ন্তা ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য প্রেমরূপা যমুনা, ভক্তিরূপা গঙ্গা ও জ্ঞানরূপা সরস্বতীকে একত্র করিয়া প্রয়াগধামে সম্মিলিত করিয়াছেন। এই ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়া জীবের মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছে। জানি না, এই ত্রিধারা কখনও এই অভাগার হৃদয়ে সম্মিলিত হইবে কিনা।

কখনও বা ভবানীপ্রসাদ কালিন্দীর তটে বসিয়া প্রেমের উৎস-স্বরূপা যমুনাকে দেখিতে দেখিতে রাধাপ্রেমে আত্মহারা হইতেন। যখন পূর্ব্ব-বায়ুতাড়িত হওয়ায় যমুনাবক্ষে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইত এবং উর্ম্মিমালা উৎক্ষিপ্ত হইয়া যখন পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইত, তখন ভবানীপ্রসাদের মনে হইত—বোধ হয়, সহসা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া যমুনা অতি ব্যগ্রতার সহিত রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনের দিকে আপন জলরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কখনও বা গোপীদিগের চরণরেণু বহন করিয়া আনিতেছে মনে করিয়া যমুনার জল অঞ্জলি করিয়া নিজ মস্তকে দিতেন এবং নিকটে কেহ থাকিলে তাহারও মাথায় ছিটাইতেন।

একদিন অপরাহ্নে কল্যাণীর সহিত যমুনাকূলে বসিয়া লহরীমালা দেখিতে দেখিতে ভাবে বিভোর হইয়া ভবানীপ্রসাদ তাঁহাকে কৃষ্ণলীলা শুনাইতেছিলেন। ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আত্মপ্রাণ অর্পণ, পতি-পুত্র-ত্যাগকারিণী, লোকলজ্জাবিরহিতা, ইহকাল পরকাল সম্বন্ধে বিচাররহিতা গোপীদিগের নিষ্কামপূর্ণ পবিত্র-প্রেম, গোপীশ্রেষ্ঠা কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধা, শ্রীরাধিকার প্রেমোন্মত্ততা ও আত্মদান সম্বন্ধে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছিলেন। সেই পবিত্র কাহিনী বর্ণন ও স্মরণ করিতে করিতে তিনি এরূপ তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার পরিব্যাপ্ত হইল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্র ও নক্ষত্রের আলোকে তাহাও বিদূরিত হইল, ইহার কিছুই তিনি জানিতে পারিলেন না। যখন

চন্দ্রালোক অতি উজ্জ্বল হইয়া স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল, যখন সেই কিরণ যমুনাবক্ষে ও বৃক্ষপত্রে প্রতিঘাত হইয়া এক অনন্ত-সৌন্দর্য্য ধারণ করিল, যখন নিশাপ্রভাবে সমগ্র ধরিত্রী আবেগময়ী, ভাবময়ী হইয়া উঠিল, যখন বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত নিবাত-নিস্পন্দ হইয়া ধ্যানস্থ ঋষির ন্যায় নৈশ-নিস্তব্ধতাকে গাম্ভীর্য্য পূর্ণ করিল, তখন সহসা ভবানীপ্রসাদ সহধর্ম্মিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ, কদম্বতলে শাখাবিলম্বিত পুষ্পময় দোলনার উপর বসিয়া কৃষ্ণ কেমন বংশীবাদন করিতেছেন। সেই সুর পবনান্দোলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সমভাবে বিস্তৃত হইতেছে। সেই সুরের যত অধিক স্রোত যে গ্রহণ করিতে পারিতেছে, তত অধিক বলে সে উৎপত্তিস্থানের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, রাধিকা আসিয়া প্রথমে দোলনার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দোল দিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেছেন এবং শ্রীরাধিকা সেই ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে দোল দিতেছেন। ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তিনি এরূপ আত্মহারা হইলেন যে, দোলনা তাঁহার নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া গেলেও তাঁহার চেতনা হইল না। দোলনা থামিয়া গেল; বংশীহস্তে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে গেলে যেমনি বংশীধ্বনি স্তব্ধ হইল অমনি শ্রীরাধিকা চৈতন্য লাভ করিয়া একটু অপ্রতিভ ভাবে ছুটিয়া গিয়া দোলনা ঠেলিয়া দিলেন। দেখ কল্যাণি! অল্পক্ষণ দোল দিয়া কৃষ্ণ-প্রিয়া আবার ভাবাবিষ্টা হইলেন। এ ভাবাবেশ মূর্চ্ছা নহে; ইহা জ্ঞানাবস্থায় অন্তঃসৌন্দর্য্যের অনুভূতি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের আকৃতি ও মুরলীধ্বনিরূপ বহিঃ-সৌন্দর্য্য এবং তাঁহার পরদুঃখকাতরতা, পরার্থপরতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতা রূপ অন্তঃ-সৌন্দর্য্য মিলিত হইয়া শ্রীরাধিকার হৃদয়ে যে পরমানন্দের সঞ্চার করিয়াছে তাহা উপভোগ করিবার নিমিত্তই তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া অন্তর্ণিবিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এইবার রাধাকে শ্রান্ত মনে করিয়া দোলনা হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করতঃ বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। বংশীধ্বনি স্তব্ধ হইয়া থাকিলে শ্রীরাধিকার চৈতন্যোদয় হইল এবং ঐ দেখ, অতি কাতরভাবে "হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায়—"বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তিনি দোলনাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সহসা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে ব্যথিত হইয়া যেমন তিনি প্রাণের আবেগে দোলনার উপর বক্ষস্থল রাখিয়াছেন, অমনি বংশীধারী আসিয়া তাঁহাকে দোলাইয়া দিলেন। ঐ দেখ, যখন দোলনা প্রবলবেগে দুলিতে লাগিল, তখন লজ্জায় ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণা হইয়া রাধিকা বলিলেন, "আমি দোলনা ছাড়িয়া দিলাম, পরক্ষণেই রাধিকাকে ভূপতিতা দেখিতে পাইবে।" এই কথা বলিয়া যেমন তিনি দোলনা ছাড়িয়া দিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ পতনোন্মুখী রাধিকাকে বক্ষমধ্যে ধারণ করিলেন। রাধিকাও তাঁহার কোমল বাহুলতিকা দুখানি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠাবলম্বিত বনফুল-হারের পার্শ্বে পরাইয়া দিলেন।

ঐ দেখ কল্যাণি, বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপীগণ একে একে যমুনা-তীরে সমবেত হইতেছেন। যাঁহারা কিছু পূর্ব্বে আসিয়াছেন তাঁহারা লুকাইয়া থাকিয়া রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমলীলা দেখিতেছিলেন। দেখ, এই প্রেমিক-যুগল পরস্পরকে বক্ষে ধারণ করিয়া এরূপ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়াছেন যে, গোপিকাগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়াছেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। ঐ দেখ, গোপাঙ্গনাগণ প্রেমের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যুগল-মূর্ত্তিকে পাশাপাশি স্থাপিত করিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছেন। ঐ শুন, তাঁহারা রাধা-কৃষ্ণের অনন্ত-প্রেম দেখিবার জন্য সকলকে ডাকিতেছেন। ঐ দেখ, যমুনা তাঁহাদের আহ্বান শুনিয়া অনন্ত ঊর্ম্মী উত্থিত করিয়া এই দৃশ্য দেখিবার জন্য উজান বহিয়া যাইতেছে। কল্যাণি, বায়ুভরে আন্দোলিত হইতে হইতে সে ধ্বনি এতদূর আসিয়া আমার

হৃদয়ে বাজিতেছে। গোপিকাদিগের আহ্বান আমার চিত্ত আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ যুগল-মূর্ত্তির দিকে লইয়া যাইতেছে। কল্যাণি, আমি এ দৃশ্য দেখিব; ভগবানের সহিত প্রেমময়ী শ্রীরাধার সম্মিলন বৃন্দাবনে গিয়া একবার প্রত্যক্ষ করিব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতঃকালে ভবানীপ্রসাদ স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া মথুরাসিংহের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনধাম দেখিবার জন্য ভবানীপ্রসাদের এত ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল যে, তিনি আর এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারিলেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া কাহাকেও কোন কথা না জানাইয়া সকলে প্রয়াগ ত্যাগ করিলেন। এস্থানে বৎসরাধিক বাস করার জন্য অনেক সাধুসন্ন্যাসী ও গৃহস্থ পরিবারের সহিত তাঁহাদিগের আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। মথুরাসিংহ এখানে কয়েকটী শিষ্যও পাইয়াছিলেন। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক মথুরার কার্য্যে ও ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। সে ব্যক্তি সপরিবারে মধ্যে মধ্যে এই নবীন সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে আসিত এবং তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া পবিত্রমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। একদিন এই গৃহস্থ পরিবারের সহিত কল্যাণী ও মহামায়া তাহাদিগের গৃহে গিয়াছিলেন। এইরূপে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় কল্যাণী ও মহামায়া সেই পুরমহিলাদিগের ভক্তি ও স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। মথুরাসিংহ ও মহামায়ার ইচ্ছা হইতেছিল যে, এই গৃহস্থ-পরিবারের সহিত একবার দেখা করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন; কিন্তু

ভবানীপ্রসাদের ব্যস্তভাব ও আকুল-ক্রন্দন দেখিয়া তাঁহারা ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিতে সাহস করিলেন না। সুতরাং পরদিন অতি প্রত্যূষে সঙ্গমতটস্থ মন্দির ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন।

রাজপথ ত্যাগ করিয়া যমুনাতীরস্থিত সঙ্কীর্ণ পথাবলম্বন করিয়া তাঁহারা পদব্রজে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। পাঁচবৎসর অশন-বসনের কষ্ট সহ্য করায় তাঁহারা সকলেই এখন কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং এই রাজপরিবার অধুনা প্রকৃত পরিব্রাজকের মতই হইয়াছিল। অধিকন্তু ধর্ম্মানুশীলনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়ায় এই সুশিক্ষিত, সদাচার-সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবার এক পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছিলেন। সংসারীর কোমলতার সহিত সংসার-ত্যাগীর কঠোরতার সংমিশ্রণে তাঁহাদিগের চরিত্র এরূপ অপূর্ব্ব হইয়াছিল যে, তাঁহারা যে গ্রামেই অবস্থান করিতেন তথায় অযাচিতভাবে আহার্য্য ও পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইতেন। যমুনা-তীরস্থিত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রাত্রি যাপন করিতে করিতে তাঁহারা বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিতেছিলেন।

একদা রাত্রি-যাপনের জন্য তাঁহারা যমুনা-তীরবর্ত্তী একটি গ্রামস্থিত বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময় যমুনার কুলু কুলু ধ্বনি তাঁহাদিগের কর্ণে ক্রন্দনের সুরের ন্যায় বাজিল। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে ক্রন্দন ধ্বনির ন্যায় সেই অস্ফুট শব্দ শুনিয়া ভবানীপ্রসাদ চমকিয়া উঠিলেন এবং তাঁহারই সঙ্গে সকলেই উঠিয়া বসিলেন। সেই স্তব্ধ নিশীথে স্রোতস্বিনীর অবিরাম প্রবাহধ্বনি সকলের নিকট করুণ রোদনের ন্যায় অনুমিত হইল। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণেরলীলা দর্শন মানসে সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, যমুনারই মত বৃন্দাবনের কূলে কূলে ঘুরিয়া রাধাকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহারা উৎসুক হইয়াছিলেন; নির্ম্মল-সলিলা-যমুনার মত নির্ম্মলচিত্তে

রাধাকৃষ্ণের প্রতিকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। আজ সহসা এই করুণ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ব্যথিত হইলেন। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া সকলকেই নিরুৎসাহ করিয়া দিল। ভবানীপ্রসাদের মনে হইল যমুনা যেরূপ সেই প্রেম-সম্মিলনের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতেছে, হয়ত আমাদিগকেও রাধাকৃষ্ণের অদর্শনে এইরূপই কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে।

প্রত্যূষে তাঁহারা পুনরায় যাত্রা করিয়া কিছুদূর গমন করিয়াছেন এমন সময় মথুরাসিংহ দেখিলেন যে, চারিজন পাঠান যষ্টি হস্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তাঁহার একটু ভয় হইল কিন্তু সন্দেহের কোন কারণ না দেখিয়া তিনি এ সন্দেহ কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। প্রায় মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত পথবাহন করিয়া বিশ্রামের জন্য সকলে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলে মথুরাসিংহ দেখিলেন, সেই পাঠানেরাও অনতিদূরে বৃক্ষান্তরালে বসিয়া রহিল। এইবার তাঁহার মনে সন্দেহ দৃঢ় হইল। সংশয় দূর করিবার জন্য মথুরাসিংহ অধিকতর আতপ-শূন্য স্থানে বসিবার ছলে সকলকে লইয়া সে বৃক্ষতল ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিলেন যে, দস্যুরাও তাহা দেখিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তখন এই সংবাদ ভবানীপ্রসাদকে বলিয়া সতর্কতার সহিত তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন। আর বিশ্রাম করিবার সাহস তাঁহাদের হইল না। শীঘ্র কোন গ্রাম বা পান্থশালার নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্ন অতীত হইল। পথ চলিতে চলিতে অপরাহ্নও অতীত-প্রায়—কিন্তু মনুষ্য-বসতির কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তাঁহারা সকলেই সত্বর গমন করিতেছেন এমন সময় মথুরাসিংহ দেখিলেন যে, দস্যুরা দৌড়িতে আরম্ভ করিল। সেই নির্জ্জন সূর্য্য-রশ্মি-শূন্য অন্ধান্ধকারময় কাননতলে

দস্যুর হুঙ্কার শুনিয়া ভবানীপ্রসাদ বিচলিত হইলেন। অকস্মাৎ এরূপ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা ভীত হইলেন। তখন স্থির-বুদ্ধি মথুরাসিংহ একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে কল্যাণী ও মহামায়াকে বসাইয়া আক্রমণকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভবানীপ্রসাদকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি নিজের গাত্রাবরণ ভূমিতে ফেলিয়া রায়পুর রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ-পদ-লব্ধ তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া দ্বিতীয় কৃতান্ত-স্বরূপ দণ্ডায়মান হইলেন।

দস্যুগণ নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি দেখিলেন যে, একজন অন্য সকলের অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া মথুরা, তীরবেগে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং সে ব্যক্তি লাঠি বাগাইয়া ধরিবার পূর্ব্বেই মথুরাসিংহের এক আঘাতে ভূতলশায়ী হইল। ক্ষিপ্রহস্তে মৃতের হস্তস্থিত লাঠি উঠাইয়া ছুটিয়া আসিয়া তিনি ভবানীপ্রসাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং যষ্টিটী ভবানীপ্রসাদকে দিয়া দুই জনেই দস্যুদিগকে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অপর দস্যুরা আসিল এবং একে-একে মথুরাসিংহের অব্যর্থ আঘাতে চির-নিদ্রাভিভূত হইল। কৌশলী-বীর মথুরাসিংহ একাই দস্যুদিগকে নিপাতিত করিলেন, ভবানীপ্রসাদকে চেষ্টা করিবারও অবসর দিলেন না। যখন সকলে বিপন্মুক্ত হইল তখন মথুরাসিংহ বিশ্বনাথের কৃপাভিক্ষা করিয়া রক্তরঞ্জিত করদ্বয় যুক্ত করতঃ উন্মুক্ত-প্রাণে প্রার্থনা করিলেন—"ভগবান্, কল্যাণী ও মহামায়াকে অক্ষত দেহে রাখিয়া, ইহাদের সেবা করিতে করিতে যেন জীবন শেষ করিতে পারি। সেই সুখই আমার স্বর্গ-সুখ; ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ-কামনা আর আমার নাই।"

সকলেই দ্রুতবেগে চলিয়া গিয়া শীঘ্র একটি গ্রামের নিকট পৌঁছিলেন। গ্রাম নিকটবর্ত্তী জানিয়াই দস্যুরা তাঁহাদিগকে সেই কাননতলে আক্রমণ

করিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা সমাগত। স্নানান্তে একটি সৎগৃহস্থের প্রাঙ্গণে আহার করিয়া তাঁহারা সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করিলেন।

রাত্রি শেষে ঈশ্বর-বন্দনাদি সমাপন করিয়া মথুরা ও ভবানীপ্রসাদ এইরূপ দস্যু-হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় স্থির করিতে বসিলেন। সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, মহামায়ার রূপ ও অলঙ্কার দস্যুদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে পর্য্যটন করিতে পারেন ইহাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইল। কোনও সদুপায় স্থির করিতে না পারিয়া ভবানীপ্রসাদ কোন সৎপাত্রের সহিত মহামায়ার বিবাহ দিয়া তাহাকে তথায় রাখিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন এবং সহধর্ম্মিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া মহামায়াকে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন।

পিতার অভিপ্রায় শুনিয়া মহামায়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল এবং চিত্ত স্থির করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"আমি বিবাহ করিব না। পিতামাতার নিকট থাকিয়া চিরজীবন তাঁহাদেরই সেবা করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এ প্রতিজ্ঞা হইতে কেহই আমাকে বিচলিত করিতে পারিবেন না।"

যে দৃঢ়তার সহিত মহামায়া এই কথাকয়টি উচ্চারণ করিল, তাহাতে কাহারও আর কোন কথা কহিবার সাহস হইল না। সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মহামায়ার উত্তরে মথুরাসিংহ একটু শান্তি অনুভব করিলেন। হৃদয়ে বল পাইয়া তিনি এইবার বলিলেন—"উপস্থিত আর বৃন্দাবনে গিয়া কাজ নাই। মোগল-সাম্রাজ্যে এখন যেরূপ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে প্রতি পদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা। ভারতের শান্তি এখন কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত হইল। সুতরাং মনুষ্য-বসতির নিকটে থাকাও আমার অভিমত নহে। 'চল' আমরা সকলে বনময় পার্ব্বত্য-প্রদেশের কোন নিভৃত স্থলে গিয়া গঙ্গাতীরে প্রকৃতির কোলে

ইহ-জীবন যাপন করি। যেখানে মনুষ্য নাই, সমাজ নাই, ধন নাই, অপহরণ নাই, প্রলোভন নাই, হত্যা নাই ; যেখানে বৃক্ষলতা ও বনপশু প্রেমের পাত্র হইয়া হৃদয়ে মহত্ত্বের সঞ্চার করে এবং যেখানে ঈশ্বরের কার্য্য ও অনুগ্রহ প্রতিক্ষণে উপলব্ধি করিতে পারা যায়—এরূপ কোন মনুষ্য-সমাগম-শূন্য স্থানে বাস করিতে যাই চল।"

মথুরাসিংহের প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইলে তিনি মহামায়ার নিকট হইতে একখানি অলঙ্কার লইয়া বিক্রয়ের জন্য বহির্গত হইলেন। কোন বণিকের নিকট ইহা বিক্রয় করিয়া যে প্রচুর অর্থ পাইলেন তাহা হইতে কিছু আহার্য্য সামগ্রী ক্রয় করা হইল এবং একখানি নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া প্রয়াগ পর্য্যন্ত নৌকাযোগে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

মথুরাসিংহ মহামায়ার গাত্র হইতে সকল অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া স্বীয় গাত্রাবরণের মধ্যে রক্ষা করিলেন এবং মহামায়াকে এইবার প্রকৃত সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া সকলে যমুনাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অতুলরূপ-রাশি লইয়া মহামায়া কুমারীব্রত অবলম্বন করিয়া পিতামাতার চিরসঙ্গিনী হইয়া রহিল। যমুনাতীরে নৌকা প্রস্তুত ছিল। তৎসাহায্যে তাঁহারা প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রয়াগ হইতে কাশী এবং কাশী হইতে গঙ্গাবক্ষে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া তাঁহারা নিবিড় বনময় পর্ব্বত-বহুল স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরল-হৃদয়-পার্ব্বত্য জাতির বসতি হইতে অনতিদূরে একটি নিভৃত স্থান অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা তথায় আবাস স্থাপন করিলেন। গঙ্গাতীরে সামান্য অর্থ-সাহায্যে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া সন্ন্যাসীগণ তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দিবস-যামিনীব্যাপী গভীর নিস্তব্ধতা ও অবিচ্ছিন্ন কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে এই সন্ন্যাসীগণ আশ্রম স্থাপিত করিয়া বসতি করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিরাট-বপু বৃক্ষের দ্বারা আতপ নিবারিত হওয়ায় সে স্থান দিবসেও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষান্তর-মধ্যগত কিরণ-রেখা ঘনকৃষ্ণ ছায়ার সান্নিধ্য হেতু অতি রমণীয় দেখাইত। মনুষ্যসমাগম এখানে প্রায়ই হইত না। অথচ এই আশ্রমবাসীগণ কোনরূপেই নির্জ্জনতা অনুভব করিতেন না। যখন প্রবল বাত্যাতাড়িত হইয়া সশব্দে এক বৃক্ষ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষকে আক্রমণ করিত, যখন এক শাখা অপর শাখাকে আঘাত করিয়া তাহা ভগ্ন করিত, যখন ভূ-সংলগ্ন পত্ররাশি বায়ু-প্রবাহে বাহিত হইয়া বায়ু-রোধকারী কোন প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিত, তখন তাঁহারা শত্রুভাবাপন্ন, ঈর্ষাদ্বেষসমন্বিত, বিবাদ-বিচ্ছেদ-রত মনুষ্য-সমাজের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইতেন। আবার তাহারই মধ্যে কদাচিৎ প্রবল প্রতাপান্বিতের সহৃদয়তা ও বাৎসল্যভাব দেখিয়া তাঁহারা সুখানুভব করিতেন। আবার যখন মন্দবায়ুসঞ্চালিত হইয়া বৃক্ষগণ স্বস্থানে অবস্থান করিত ও ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া তাহাদের জীবনীশক্তির পরিচয় দিত, তখন তাঁহারা প্রীতিপূর্ণ, শান্তিসুখাভিলাষী সামাজিকের অনুরূপ ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইতেন। যখন আবার নিবাত-নিষ্কম্প নিস্পন্দ বৃক্ষ ঊর্দ্ধদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া ঋজুভাবে দণ্ডায়মান থাকিত, তখন তাঁহারা প্রত্যেক বৃক্ষকে এক একটি ধ্যানস্থ ঋষি মনে করিতেন। সেই গম্ভীর দৃশ্য তাঁহাদের চিত্তে এরূপ পবিত্রতা ও শান্তি সম্পাদন করিত যে, সন্ন্যাসীগণ তাহা দেখিয়া স্তিমিতনেত্রে ঈশ্বরের ধ্যানমগ্ন হইতেন। প্রকৃতির মোহন-দৃশ্য

অবলোকন করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্ত ক্রমে মনোরম হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনুষ্য-সমাজে বসতি করিলে আবশ্যকীয় সাধারণ দ্রব্যাদি মানুষের নিকট হইতেই পাওয়া যায় এবং সাধারণ সকল অভাব মানুষই মোচন করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ বনস্থলীতে সকল অভাব মোচনের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভগবানের উপর নির্ভর না করিলে তাঁহার প্রীতি অনুভব করিতে পারা যায় না। .তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং এই নির্জ্জন-প্রদেশে বাস করায় ঈশ্বরের অবস্থিতি, তাঁহার প্রীতি ও অনুগ্রহ তাঁহারা সকল সময় উপলব্ধি করিতে পারিতেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্ত এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল যে, সকল সময়েই তাঁহারা অতি সতর্ক হইয়া পবিত্র ভাবে কাজ করিতেন। পাছে ভগবান অসন্তুষ্ট হয়েন এই ভয়ে সাবধান থাকার জন্য মহামায়া পর্য্যন্ত অল্পভাষিণী, সৎচিন্তা-পরায়ণা ও সংযমশালিনী হইয়া উঠিলেন।

মনুষ্য-প্রকৃতি স্নেহশালী। স্নেহের বিস্তার না করিয়া মানুষের মন স্থির থাকিতে পারে না। সমাজে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলে মনুষ্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে। যে আত্মতৃপ্তি-সম্পাদনের জন্য অন্যকে স্নেহ করে, যে স্নেহের পাত্রকে অবিরল প্রবাহিত স্নেহরসে সিক্ত রাখিয়া তাহার ফলভোগ করিবার বাসনা রাখে না, যে নিজ স্নেহের প্রতিদানের অপেক্ষা করে না, তাহারই স্নেহ সমাজে অপ্রতিহতভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে। সেই অকাতরে, প্রফুল্ল মনে সকলকে ভালবাসিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহার প্রকৃতি এরূপ উদার নহে, সমাজমধ্যে তাহার চিত্ত সম্যক উন্নতিলাভ করিতে পারে না। স্নেহের পাত্রের নিকট বঞ্চিত হইলে, বাৎসল্য দান করিয়া কঠোর

নির্ম্মম ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে, শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা অর্জ্জন করিলে, কাহার স্নেহের গতি রুদ্ধ না হয়? সেইজন্যই অনেক স্নেহশালী-মনুষ্য সমাজের দোষে নিষ্ঠুর স্বার্থপর হইয়া উঠে।

স্নেহের গতি রোধ করিতে অসমর্থ কোন পদার্থকে যদি স্নেহের পাত্র করা যায়, তাহা হইলে অপ্রতিহত বেগে স্নেহ-স্রোত প্রথমে প্রবাহিত হইতে পারে এবং উত্তরকালে এই প্রবাহজনিত শক্তির দ্বারা সে খরস্রোত সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিশ্বসংসার প্লাবিত করিতে পারে। এই জন্যই পবিত্র আর্য্য-ভূমির তপোবন-নিস্থত স্নেহ ও প্রীতিধারা সচেতন ও অচেতনকে মুগ্ধ করিয়াছিল; এই জন্যই সংসারানভিজ্ঞ বহুকালগত তপোবনবাসীদিগের মহৎ নিষ্কাম প্রেম আজিও ভারতের আদর্শ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

পুরুষ-প্রকৃতি অপেক্ষা স্ত্রী-প্রকৃতি অধিক কোমল, অধিক স্নেহ-প্রবণ; পুরুষ অন্যের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়া বরং থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে এভাবে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। লতিকা যেরূপ আকর্ষ বাহির করিয়া অন্য বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরে, স্ত্রীজাতি সেইরূপ সন্নিহিত কোন পাত্রকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। অবলম্বিত বৃক্ষ বিনষ্ট হইলেও লতিকা যেরূপ তাহাকে জড়াইয়া থাকে, স্ত্রীজাতিও সেইরূপ স্নেহের পাত্র বিলুপ্ত হইলে তাহারই স্মৃতি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করে। লতিকা যেরূপ উৎপত্তিস্থানে অবলম্বন না পাইলে আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া তাহাতে সংলগ্ন হয়, স্ত্রীজাতিও সেইরূপ সন্নিহিত স্থানে স্নেহপাত্র না পাইলে পাত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই স্নেহ সঞ্চারিত করে। স্ত্রীলোকের এ প্রবৃত্তি না থাকিলে এই কঠোর পৃথিবী কঠোরতর হইয়া উঠিত।

এই আশ্রমে মহামায়া কতকগুলি স্নেহের পাত্র সৃষ্টি করিল। কতকগুলি পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া মহামায়া সেই স্থানটি

অতি মনোরম করিয়া তুলিল। প্রাতে পূজা ও আরাধনাদি সমাপন করিয়া মহামায়া তরুমূলে জল-সেচন করিত এবং দিবসের অন্য সময়েও তাহাদের সংবর্দ্ধনের সহায়তা করিত। পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত হওয়ায় তরুগুলি দিনে দিনে পল্লবিত হইয়া অচিরে পুষ্প-ফলোৎপাদন করিল। তখন সেই ফল ভক্ষণ ও আলবালে জলপান করিবার আশায় পক্ষিগণ আশ্রমে সমবেত হইত। মহামায়ার পবিত্র প্রীতিপূর্ণমূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা নির্ভয়ে সেই আশ্রম-তরুতলে ও শাখায় বিচরণ করিত।

মহামায়া ও তাহার স্নেহপাত্রগুলি ক্রমশঃ আশ্রমবাসী অপর সকলের চিত্তাকর্ষণ করিল। প্রথমে কল্যাণী এবং পরে মথুরাসিংহ ও ভবানী-প্রসাদ তাহাদের প্রতি স্নেহসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা যতই এই স্নেহাস্পদগুলির যত্ন করিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। মহামায়ার মত তাঁহাদের চক্ষেও তরুগণ সচেতন বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের মনে হইল, যেন এই আশ্রম-তরুগণও পূর্ণচেতন; যেন তাহারা মানুষের মতই এই সেবা-যত্ন অনুভব করিতে পারে এবং কোনদিন স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলে যেন তাহারা ক্ষুব্ধ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। আশ্রমবাসীদিগের অভাব অনুভব করিয়া এই তরুগণ অকাতরে পুষ্প ও ফল উৎপন্ন করিত এবং দেবসেবা ও প্রতিপালকের সেবায় নিযুক্ত হইলে তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিত। এইরূপে আশ্রমবাসী ও তরুগণের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত-তরই হইতে লাগিল।

যেখানে প্রেমের প্রতিবন্ধক নাই সেখানে তাহার স্রোত চেতন অচেতন উভয়-কূল প্লাবিত করিয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হয়। তখন সকলই প্রেমের পাত্র হইয়া উঠে। তখন কাহারও উপর বিরাগ থাকে না। পাপীর পাপ প্রকৃত প্রেমিকের চক্ষে প্রতিভাত হয় না। চরিত্রের

পুণ্যাংশটুকুই তাহার চিত্ত-আকর্ষণ করায় সে সমভাবে সকলকে প্রেমমুগ্ধ করিতে পারে। তাহারই ফলে অনেক পাপীতাপী প্রেমিক-পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

নির্জ্জন বনভূমির মধ্যে স্থাপিত আশ্রমটি এরূপ সুন্দর, এরূপ পবিত্র, এরূপ ধর্ম্ম-প্রভাব-সম্পন্ন হইল যে, যে কেহ ইহার সংস্পর্শে আসিত, সেই পবিত্র হইয়া গৃহে ফিরিত। প্রেমময় সন্ন্যাসীদিগের ক্ষণিক সাহচর্য্যলাভে অনেকেই চিরকালের জন্য হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া যাইত। কখনও কখনও অরণ্যবাসী অর্দ্ধ-সভ্যজাতির স্ত্রী-পুরুষ এই আশ্রমে আসিত। অভ্যাগত-পরিচর্য্যার জন্য মহামায়াকে মধ্যে মধ্যে তাহাদের দৃষ্টি পথবর্ত্তিনী হইতে হইত। দেবী মনে করিয়া অনেকেই তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইত।

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহারই চরণ-প্রান্তে উপবেশন করিয়া, তাঁহারই লীলাভূমিতে অবস্থান করিয়া সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনিগণ পরমসুখে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। সে কি নির্ম্মল আনন্দ! শত অভাব ও শারীরিক শত কষ্টের মধ্যে রায়পুরাধিপতি ভবানীপ্রসাদ ও মহিষী কল্যাণী যে সুখশান্তি উপভোগ করিতেছিলেন, তাহার কণামাত্রও তাঁহারা কখনও রায়পুরে প্রাপ্ত হয়েন নাই। শত সুখোপকরণের মধ্যে তাঁহারা যে সুখশান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই, আজ বনভূমিতে চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ-শূন্য জীবনে তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করিলেন। প্রেম, ভক্তি ও ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের সম্মিলনে তাঁহারা অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানে নির্ভর করিয়া এই সন্ন্যাসীগণ আশ্রমে বাস করিতেছিলেন, যখন এই পৃথিবী ভগবানের সেবা ও তাঁহার অনুভূতির একমাত্র স্থান বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইতেছিল, যখন এই পৃথিবীতে বসতি স্বর্গবাস অপেক্ষাও সুখকর মনে হইতেছিল, যখন মনুষ্যমাত্রেই ভগবানের অবস্থিতি অনুভব করিয়া তাঁহারা সকলকেই প্রেমের পাত্র মনে করিতেছিলেন, তখন এই আশ্রমবাসীদিগের অদৃষ্টাকাশ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইল।

একদা মধ্যাহ্নে মথুরাসিংহ আশ্রম-তরুতলে বসিয়াছিলেন, এমন সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিল। তিনি অভ্যাগতকে আহ্বান করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং আসিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আগন্তুক বলিল—"এই প্রদেশের সাঁওতালরাজ মৃগয়ায় বাহির হইয়া একদিন এই বনমধ্যে আসিয়াছিলেন। একটি হরিণের পিছু পিছু যাইতে যাইতে বৃক্ষতলে এক পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিতে পান। সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়া যান যে, মৃগ তাঁহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেল, হাতের তীর তাঁহার হাতেই রহিল, অপর হাত হইতে অশ্ববল্গা খসিয়া পড়ায় ঘোড়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তিনি তখনও সেই স্ত্রীলোকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। এত রূপ তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। সেই অবধি রাজা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন, রাজকার্য্যে কিছুমাত্র মন নাই। তিনি আমার দ্বারা এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, শীঘ্র বিবাহের দিন স্থির করিয়া তাঁহার সহিত সেই কন্যার বিবাহ দেওয়া হউক।"

আগন্তুক চুপ করিল। মথুরাসিংহ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন; আগন্তুকের সকল কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছিল কি না তাহাও সন্দেহ। যখন সে বিবাহের প্রস্তাব করিল, তখন মথুরাসিংহ শিহরিয়া উঠিলেন, সহসা রোমাঞ্চিত হইয়া তিনি অধর দংশন করিলেন কিন্তু আবার পরক্ষণেই চিত্ত সংযত করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন—"আমরা সন্ন্যাসী। সে কন্যা আমারই আত্মীয়া এবং সন্ন্যাসিনী। জপ, তপ, আরাধনাই আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য এবং দেবসেবাই আমাদের জীবনের ব্রত। সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হয় না। সে কন্যার বিবাহ দেওয়া আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সুতরাং আপনি আপন রাজাকে এই কামিনীলাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে বলিবেন। তাঁহাকে বলিবেন, সেই কন্যা তাঁহারই আশ্রিতা তাপসী। ধর্ম্মচর্য্যা ও তপস্যার বিঘ্ন নিবারণই রাজধর্ম্ম; সুতরাং এই উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিবার জন্য আমি তাঁহাকে একান্ত অনুরোধ করিতেছি। তপস্বীর এ প্রার্থনা তাঁহাকে রক্ষা করিতে বলিবেন।

আগন্তুক চলিয়া গেল; কিন্তু মথুরাসিংহের চিত্তে ঘোর সংশয় জাগিয়া রহিল। কোন একটা অজানিত বিপদের ছায়া তাঁহার নির্ম্মল-চিত্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিল। ভবিষ্যতের আবরণ যেন তাঁহার সম্মুখ হইতে অকস্মাৎ অপসারিত হইল। তিনি স্থির-দৃষ্টিতে আশ্রমবাসী সকলের ভবিষ্যৎ-জীবন লক্ষ্য করিতেছিলেন। যে মথুরাসিংহের চক্ষে পূর্ব্বে কখনও অশ্রু দেখা যায় নাই, আজ সেই ব্যক্তি বৃক্ষতলে বসিয়া অবিরতধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যোগাসনে বসিয়া বিশ্বনাথের আরাধনা করিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন।

আশ্রমে প্রবেশ করিয়া মথুরাসিংহ দেখিলেন যে, ভবানীপ্রসাদ গীতা পাঠ করিতেছেন এবং কল্যাণী ও মহামায়া তাহা শুনিতেছেন ও আলোচনা করিতেছেন। তিনিও সেইখানে বসিয়া পাঠ শুনিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু পাঠে তাঁহার চিত্ত একেবারেই নিবিষ্ট হইল না। সেই স্থানে বসিয়া তিনি কল্যাণী ও মহামায়ার ভাগ্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, রাজমহিষী এবং রাজকন্যা হইয়াও প্রকৃত সুখের অন্বেষণে তাহারা এত কষ্ট সহ্য করিয়াছে এবং সেই বাঞ্ছিত সুখের আস্বাদও পাইয়াছে, অথচ সে সুখভোগ বুঝি বা তাহাদের অদৃষ্টে নাই। কিংবা এত পবিত্র-চেতা ও শুদ্ধাত্মার বাস এ জগতে অল্পকালমাত্র থাকে বলিয়াই তাঁহাদের জীবন-বন্ধের পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ এই বিপদ ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভগবানের আদেশ পাইবার আশায় তিনি স্থিরভাবে আসনে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভবানীপ্রসাদ পড়িলেন—

'শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।' *

মথুরাসিংহের কর্ত্তব্য স্থির হইল। এতক্ষণ পরে তিনি আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে পাঠ শ্রবণে অভিনিবিষ্ট হইলেন। অপরাহ্নে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ভবানীপ্রসাদ কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন, এবং কল্যাণী ও মহামায়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। মথুরাসিংহ একাকী কুটীর মধ্যে রহিলেন।

অজিনশয্যার পার্শ্ব হইতে মথুরাসিংহ তাঁহার বহুপরীক্ষিত প্রিয় তরবারি বাহির করিলেন। কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেখিলেন,

---

* পরাক্রম, বীর্য্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে নিশ্চিত মরণ জানিয়াও পলায়ন না করা, দান, ঈশ্বরভাব, এই সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিদ্ধ।

স্বকর্ম্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সংসিদ্ধি লাভ করেন।

অব্যবহারহেতু তাহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় নাই। সেই তীক্ষ্ণধার তরবারি চুম্বন করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বলিলেন, "বিশ্বনাথ! আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই তরবারি আমারই হস্তে থাকিয়া যেন কল্যাণী ও মহামায়াকে রক্ষা করিতে পারে। তাহাদের ধর্ম্ম ও পবিত্রতা তুমিই রক্ষা করিও প্রভু!" ঈষৎ মার্জ্জিত করিয়া তিনি তরবারি কোষমধ্যে রক্ষা করিলেন।

আগন্তুকের প্রস্থানের পর একরাত্রি ও একদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মথুরাসিংহ যখন আশ্রমপার্শ্বে বনানিমধ্যে বসিয়াছিলেন তখন সন্ধ্যাতিমির ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া বনভূমি আচ্ছন্ন করিতেছিল; সমগ্র প্রকৃতি যেন মোহজালে আবদ্ধ হইয়া জড়ভাব ধারণ করিতেছিল; তখন বনস্থলী পক্ষীকূজনহীন হইয়া আসিল, সমস্ত জগৎ যেন মহানিশার আগমন অনুভব করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া আসিতেছিল। মথুরাসিংহ দেখিলেন, সম্মুখে একটি পক্ষী প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া নৃত্যাভিনয় করিতে করিতে মধুর সঙ্গীত করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, সুখবিনাশিনী নিশার আগমন বুঝিয়াও এই পক্ষী যেরূপ অচঞ্চলচিত্তে ভগবানের গুণগান করিতেছে, সেইরূপ আমাদের বিপদ আগতপ্রায় জানিয়াও আমাকে স্থিরভাবে কালের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় রাত্রে যখন সকলেই কুটীর মধ্যে নিদ্রিত, তখন মথুরাসিংহ তরবারি হস্তে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন। রাত্রি গভীর ও অন্ধকারময়; নক্ষত্রের ক্ষীণ-আলোক বৃক্ষাবরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠ আলোকিত করিতে অসমর্থ। বন্য পশু পক্ষীর শব্দমাত্রও ছিল না। এমন সময় মথুরাসিংহ অতিদূরে একটি আলোক প্রজ্জলিত হইতে দেখিল। সে আলোক যেমন অকস্মাৎ জ্বলিল, তেমনই অকস্মাৎ নিবিয়া গেল;

বনভূমির চতুর্দ্দিক আবার অন্ধকারে আবৃত হইল। অল্প পরে পুনরায় সে আগুন জ্বলিল; নিশাকালীন মেঘের মধ্যে যেরূপ অকস্মাৎ বিদ্যুদ্বিকাশ হয়, তেমনই অকস্মাৎ জ্বলিয়া নিবিয়া গেল। এ অদ্ভুত আলোক ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ উত্থিত হইল। মথুরাসিংহ সেই শব্দ বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু তিনি অনুমান করিলেন যে, বহুলোক অতি সাবধানতার সহিত তথায় আগমন করিতেছে। যখন তাহারা অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইল তখন মথুরাসিংহ তাহাদের অস্পষ্টভাষা শুনিতে পাইলেন। তিনি যে বিপদপতনের আশঙ্কা করিতেছিলেন, আজ তাহাই তাঁহার সম্মুখে। তিনি ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন।

অবশিষ্ট রাত্রিটুকু সেই ভাবেই কাটিল। রাত্রিশেষে ভবানীপ্রসাদ গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানের নাম লইতে লইতে বাহিরে আসিলেন। অস্পষ্টালোকে তিনি দেখিলেন যে, মথুরাসিংহ উন্মুক্ত তরবারি লইয়া আশ্রমপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। স্তম্ভিত হইয়া তিনি তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সকল ঘটনা বিবৃত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা দেখিলেন, মশাল প্রজ্জ্বলিত হইল। "ঐ সে আশ্রম, যুবতীকে বন্দী কর"—দৃঢ় কণ্ঠোচ্চারিত এই শব্দ তাঁহারা শুনিতে পাইলেন।

অকস্মাৎ মথুরাসিংহ একটি প্রস্তরাঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ তরবারি দ্বারা একজন দস্যুকে নিহত করিলেন, এবং অদম্য উৎসাহে অস্ত্রচালনা করিতে লাগিলেন। প্রাঙ্গণদ্বার রোধ করিয়া তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে বধ না করিয়া কেহই আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিবে না দেখিয়া সেই অসভ্য রাজা আদেশ দিল—যুদ্ধ কর। তখন তাহার সহচরগণ তরবারি ও বর্শা লইয়া মথুরাসিংহকে আক্রমণ করিল।

এদিকে ভবানীপ্রসাদ কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কল্যাণী ও মহামায়াকে জাগরিত করিলেন। বিপদত্রাতা বিশ্বনাথ-স্মরণ করিয়া তাঁহারা সকলে বাহিরে আসিয়া উষার অস্পষ্ট আলোকে দেখিলেন—রুধিরাক্তদেহে মথুরাসিংহ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; হস্তে শত্রুহস্ত-নিক্ষিপ্ত শরজাল প্রোথিত হইয়াছে কিন্তু ধৈর্য্যশীল বীরবর তখনও অকাতরে অস্ত্রচালনা করিতেছেন। অকস্মাৎ মহামায়া শুনিল—"ঐ সেই রূপসী, উহাকে বন্দী কর, বন্দী কর।" মহামায়ার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার যে কি বিপদ আসিতেছিল সে তাহা চিন্তা করিল না। তাহার পবিত্র রূপরাশি যে এই স্বার্থান্ধ নরপিশাচকে মত্ত করিয়াছে তাহাও সে ভাবিল না। সে কেবল তাহার পরম আত্মীয় মথুরাসিংহের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল; তারপর চক্ষু মুদিয়া বিশ্বনাথকে স্মরণ করিতে করিতে কুটীরপার্শ্বে হইতেই অতিনিকটবর্ত্তী গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিল। তাহা দেখিয়া কল্যাণীও তৎক্ষণাৎ কন্যার অনুসরণপূর্ব্বক পবিত্রসলিলা জাহ্নবী-তরঙ্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ভবানীপ্রসাদ গঙ্গাবক্ষে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন—কোথাও জল-কুণ্ডল নাই; শুধু নির্ম্মল জলরাশি তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। তিনি সেই স্থানে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া অতি কাতর, অতি প্রিয়, অতি করুণভাবে একবার মাত্র ডাকিলেন—"মায়া!" "কল্যাণী!" পর মুহূর্ত্তেই ভবানীপ্রসাদ মথুরাসিংহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একটি মৃত সৈনিকের হস্তস্থিত বর্শা তুলিয়া লইয়া তিনি শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। শত্রুর সহিত সঙ্ঘর্ষে ইতিপূর্ব্বেই মথুরাসিংহের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল; অকস্মাৎ তিনি শত্রুশরে বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়া ভূপতিত হইলেন—তাঁহার প্রাণ-বায়ু অনন্ত বায়ুসাগরে মিশাইয়া গেল। একা ভবানীপ্রসাদ বহুতর শত্রু-পক্ষীয়ের বিরুদ্ধে আর অধিকক্ষণ যুঝিতে সমর্থ হইলেন না। অচিরেই

তিনি মথুরাসিংহের পার্শ্বে আহত শরীরে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইহার অল্প পরেই সূর্য্যোদয় হইল। মথুরাসিংহ ও ভবানীপ্রসাদের পবিত্র-রক্ত-রঞ্জিত আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রথম রশ্মি পাতিত করিয়া সেই **মহাপ্রস্থান** ভূমি তিনি যেন রোদন-রক্তিম-নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন।

তারপর তাঁহার সুবর্ণোজ্জ্বল কিরণজাল দ্বারা গঙ্গাজলে সদ্য বিসর্জ্জিত সুবর্ণ প্রতিমাদ্বয়কেও অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থতার ক্ষোভে যেন সারা জগৎকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিলেন।

সমাপ্ত

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, প্রণীত

অন্য দুইখানি গ্রন্থ।

মানব-প্রকৃতি

(বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ অবলম্বনে লিখিত)

সুন্দর কাগজ, নির্ভুল ছাপা, দাম ১॥০ টাকা।

পুরুষ ও স্ত্রী-চরিত্রের অংশ বিশেষের প্রভাব, আলোচনা, পরীক্ষা ও উৎকর্ষতা বিধানের উপায় যদি উপন্যাসের গল্পের ভিতর দিয়া দেখিতে চান, আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা যদি আপন আপন চরিত্র অনুধাবন করিতে চান, তাহা হইলে মানব-প্রকৃতি পড়িয়া দেখুন, ইহাতে ভাবিবার ও বিচার করিবার অনেক উপাদান আছে। মানব-প্রকৃতি পড়িলে প্রকৃতই মানব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। বাঙ্গলা ভাষায় এ শ্রেণীর পুস্তক নাই বলিলেই হয়।

বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার উচ্চ-বিদ্যালয় সমূহের পুস্তকাগার ও পারিতোষিকের জন্য এই পুস্তক অনুমোদিত হইয়াছে।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিজ্ঞান-পরিচয়

রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি সহজ পরীক্ষার দ্বারা সরল ভাষায় এই পুস্তকে বিবৃত করা হইয়াছে। পরীক্ষাগুলিতে যে সকল সামগ্রী ব্যবহার করা হইয়াছে, সে গুলি প্রায়ই সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের সচরাচর ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য। পল্লী ছাত্রগণও ইচ্ছা করিলে সেই সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ কুটীরেও পুস্তকে লিখিত তত্ত্বগুলি পরীক্ষা করিতে পারে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রকৃত কর্ম্মঠ ও কার্য্য-কুশল বালক-বালিকা পাইতে হইলে এরূপ পুস্তকের প্রচার অতীব প্রয়োজনীয়। প্রতি সংসারের গৃহ-কর্ম্মে যেটুকু বিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা এই পুস্তকে যথাসম্ভব দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক পড়িতে ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি পরীক্ষা করিতে বালকেরা ভার-বোধ করিবে না—পুতুল-খেলার মত খেলা করিতে করিতেই বিজ্ঞান-শিক্ষা করিবে।

সুন্দর কাগজ, পাইকা টাইপে ছাপা, দাম ।৹ আট আনা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—মুখার্জ্জি, বসু এণ্ড কোং, কলিকাতা।

সকল দোকানেই পাওয়া যায়।